শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের
পুণ্যস্মৃতিতে

Ah! let not censure term our fate our choice,
The stage but echœs back the public voice.
The drama's laws the drama's patrons give,
For we, who live to please, must please to live.

Samuel Johnson.

॥ বিষয়সূচী ॥

॥ চিত্রসূচী ॥

॥ আচার্যের আশীর্বাদ ॥

বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম নির্মাতা, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইয়াছিল। সেদিক দিয়া শিশিরকুমার সৌভাগ্যবান, কেননা তাঁহার লোকান্তর গমনের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত লিখিবার আয়োজন হইয়াছে। একজন যোগ্য এবং প্রকৃত নাট্যানুরাগী সাহিত্যিক এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি ও পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, লেখক শ্রীমণি বাগচি শিশির-কুমার সম্পর্কে গতানুগতিক কিছু লিখিতেছেন না; তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম, চিন্তা ও যত্নসহকারেই ইতিহাসের পটভূমিতে এই যুগপ্রবর্তক নট এবং নাট্যাচার্যের প্রতিভার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হউক, শ্রীভগবানের নিকট আমি ইহাই প্রার্থনা করি।

গিরিশচন্দ্রের যুগে নাটক ও নাট্যশালার প্রচুর উন্নতি হয়; কিন্তু একটি বিষয়ে উহাতে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিতাম। উহা হইল অভিনেয় নাটকের প্রয়োজনা। তখন এই বিষয়টি লইয়া কেহ চিন্তা করিতেন না। তখন দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয়ের মধ্যে নৃত্য গীত বাদ্য এবং অভিনয় আর বর্ণাঢ্য দৃশ্যপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ—দর্শকসাধারণ এই সবই উপভোগ করিত এবং তাহাতেই তাহাদের টিকিটের দাম উঠিয়া যাইত মনে করিত। অভিনয়ের যে একটি সামগ্রিক রূপ ও আবেদন আছে, ইহা তখনকার দর্শকরা বুঝিত না। তারপর যুগ পাল্টাইল, রুচির পরিবর্তন হইল, কিন্তু থিয়েটারের ধারা বদলাইল না। প্রয়োগশিল্পীর অভাবে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় একযুগের মধ্যেই থিয়েটারের দ্রুত ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিলাম। শিক্ষিত ও রুচিবান দর্শক থিয়েটারের নামে আর পূর্বের ন্যায় উৎসাহ বোধ করিতেন না, সাংস্কৃতিক জীবনেও উহার আর তেমন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হইত না। ঠিক এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন এমন একটি প্রতিভা যাঁহার মধ্যে আমি একাধারে একজন প্রথম শ্রেণীর নট ও প্রযোজককে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তিনিই শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

বাংলা থিয়েটারের ধারা-পরিবর্তনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়ের প্রভাব বিশেষভাবেই স্মরণীয়। আমিই ছিলাম তখন ইনষ্টিট্যুটের নাট্যশিক্ষক। শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার বীজ এইখানেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এইখানেই তাঁহার অভিনয় ও প্রযোজনা-নৈপুণ্য দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম বাংলা থিয়েটারে নবযুগ প্রবর্তন করিবার মত বিধিদত্ত শক্তি তাঁহার আছে। শিশিরকুমারের গৌরবোজ্জ্বল নটজীবন প্রমাণ করিয়াছে যে, আমার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বাংলা দেশের বহু সৌভাগ্য যে, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় এক যুগের মধ্যেই শিশিরকুমারের ন্যায় আর একটি মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বাংলা থিয়েটারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি তো শিশিরকুমারের জন্যই। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যকে স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার বলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উন্নীত করিয়াছেন, শিশিরকুমারও তেমনি রঙ্গমঞ্চকে শুধু যে বিদগ্ধজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, বাঙালির নাট্যপ্রতিভাকে তিনি বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বহু বাধাবিঘ্ন এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া শিশিরকুমার কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেসব কথা তাঁহার জীবনচরিতকারগণ লিখিবেন। আমি শুধু ইহাই বলিব, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাঙালির যে গর্ব, অভিনয়শিল্পের ক্ষেত্রে শিশিরকুমারকে লইয়া বাঙালির ঠিক সেই গর্ব। আর আমার গর্ব—শিশির আমার ছাত্র। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বাংলা থিয়েটারের শতবার্ষিকী উৎসবের একটি পরিকল্পনা লইয়া আমার নিকটে একবার আসিয়াছিলেন। আমি উৎসাহিত হইয়া উহাতে সম্মতি দিয়াছিলাম। শিশির আজ নাই, কে তাঁহার সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিবে? He lived and died for the stage—শিশিরকুমার সম্পর্কে এই কথাই যেন আমরা বিশেষভাবে মনে রাখি।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

৮।১০।১৯৫৯

॥ ভূমিকা ॥

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মহাপ্রয়াণের ঠিক এক বৎসর পরেই তাঁর নাট্যসাধনা ও অভিনয়-প্রতিভা-নিরূপক একখানি তথ্যসমৃদ্ধ, বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের পূর্ণবিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হল—এটা নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের পক্ষে একটি বিশেষ তৃপ্তিবিধায়ক ঘটনা। লেখক নাট্যসমালোচনা ক্ষেত্রে সুপরিচিত, বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীমণি বাগচি; এবং বইখানির নাম 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার'। এই সুলিখিত, বাংলা রঙ্গালয়ের ক্রমপরিণতির প্রামাণ্য বিবরণী গ্রন্থখানি শুধু শিশিরকুমারের অভিনয় ও প্রয়োজনা-কুশলতার একটি চমৎকার স্বরূপ নির্দেশমাত্র নয়; বাঙলা দেশে নাট্যসাধনা ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস। শিশিরকুমারের অলোকসামান্য প্রতিভা কিরূপ প্রতিবেশে আত্মবিকাশের ক্ষেত্র পেয়েছিল, নাট্যকলার পূর্ব ইতি-হাসের সঙ্গে তাঁর কোথায় সংযোগ, তিনি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে যা ঐতিহ্য-সূত্রে পেয়েছিলেন তাকে তিনি কেমন করে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, নাট্য-জগতে তাঁর অবদানের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা কোথায়—এই সমস্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত বাগচির এই চমৎকার গ্রন্থখানিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও ইতিহাস-ধারার সার্থক অনুসরণে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানির সাহায্যে আমরা যে শুধু শিশির-প্রতিভার একটা যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব তা নয়, মঞ্চাভি-নয়ের দিক থেকে নাটকরচনা ও প্রয়োজনার সমগ্র পূর্ব ইতিহাসটিও আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবেশের পূর্ণ পরিচয়, কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে সমগ্র বৃত্তবন্ধনীর সম্বন্ধ-রহস্যটি আমাদের বোধশক্তির নিকট এই গ্রন্থখানি এমন মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করেছে, যার জন্য লেখক আমাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের অধিকারী হয়েছেন।

অভিনয়শিল্পের সঙ্গে অন্যান্য চারুশিল্পের একদিকে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। অভিনয়শিল্প সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর ও বাহ্য অবলম্বনহীন। এর

আবেদন কেবল মানসপটে ধরে রাখার জিনিস, এর কোন বহিরঙ্গমূলক রূপ নাই। অন্যান্য শিল্পে প্রতিভার অলৌকিক রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থায়ী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান মিশে আছে। কাব্যসাহিত্যে উর্ধ্বমুখী ব্যঞ্জনার, কল্পলোক বিহারের পায়ে মর্ত্যলোকের মুদ্রিত অক্ষরাবলীর শৃঙ্খল বাঁধা আছে। আমরা সেই শৃঙ্খল টেনে কবির নভোচারী কল্পনাকে আমাদের বোধ ও উপভোগশক্তির সীমায় আকর্ষণ করতে পারি। যখনই বই পড়ব তখনই কাব্যের বস্তু-অতীত রস-আবেদনটি আমাদের পানপাত্রের নিকট ধরা দেয়। এমন কি সকলের চেয়ে বস্তুস্পর্শহীন ও সুরনির্ভর যে সঙ্গীত তাও কতকগুলি বাঁধা নিয়ম-কানুনে, রাগ-রাগিনীর নির্দিষ্ট পর্যায়বদ্ধ, স্থির রূপ-রেখায় বন্দী—ইচ্ছা করলেই এক গান পঞ্চাশবার শুনতে পারি, তাকে নীরবতার অস্তিত্বহীনতা থেকে ইন্দ্রিয়গম্যতার নবজীবনস্পন্দনে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু অভিনয় এই সর্বকলা সাধারণ আবেদন-স্থায়িত্বের একটা ব্যতিক্রম। অবশ্য আজকাল সবাক্ ছায়াচিত্রে অভিনয়কে ধরে রাখা যায়। কিন্তু অতীতের সমস্ত অভিনেতা আমাদের নিকট চির নীরবতার কোন্ অন্ধতম গহ্বরে তলিয়ে গেছেন। আজ গিরিশচন্দ্র, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, দানিবাবু, অমর দত্ত, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি প্রভৃতি পূর্বযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ আমাদের কাছে নামসর্বস্ব হয়ে বেঁচে আছেন। বিশ্লেষণ-বর্ণনা-প্রশস্তিবাক্যের মাধ্যমে কি কণ্ঠস্বরের অপূর্ব ভাবপ্রকাশিকা শক্তি, বিচিত্রধ্বনি-অনুরণন, অঙ্গভঙ্গীর আশ্চর্য ব্যঞ্জনা, চরিত্রাভিব্যক্তির বিদ্যুৎ-ভাস্বরতার কোন সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব? বড় জোর এই উপায়ে পূর্ব স্মৃতির খানিকটা আলোড়ন ঘটে, বিস্মৃতির যবনিকা খানিকটা অপসারিত হয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতির একটা ক্ষীণ প্রতিরূপ মুহূর্তের জন্য মনে জাগে। কিন্তু নট-নটীর ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল, অভিনয়ের সমস্ত প্রাণমন মোহকারী আবেদনকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে এই পরোক্ষ বর্ণনা সম্পূর্ণ অপ্রচুর।

ভাবতে বড়ই কষ্ট হয় যে আর কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই শিশির-কুমারের অনুপম অভিনয়-প্রতিভা, তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ভবিষ্যৎবংশীয়দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হতে অপসারিত হয়ে জনপ্রবাদের ধূসর অনামিকতায় বিলীন হয়ে যাবে। যাঁর ক্ষীণতম ইঙ্গিতে, চক্ষুর ঈষৎ কটাক্ষে, অঙ্গভঙ্গীর

অর্থবহ সাবলীলতায়, স্বরের আরোহণ-অবরোহণমূলক কম্পনে, সমগ্র দেহ-ভঙ্গিমার প্রাণরহস্যের সমুদ্রোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তিনি আগামী যুগের বাঙালির মনের এক কোনে অস্পষ্ট খ্যাতি-কুহেলিকার মত লগ্ন হয়ে থাকবেন ; তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যের কোন স্পন্দন তাদের অন্তরে জাগবে না। এত বড় প্রতিভা, সৃষ্টিশক্তির এমন অপরূপ বিচিত্র বিকাশ, শত ব্যক্তিত্বের অন্তর-রহস্যে প্রবেশ ও তাকে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করার এই আশ্চর্য ক্ষমতা পৃথিবীতে কোন চিহ্ন রেখে যাবে না। এর চেয়ে শোচনীয় অপচয়ের আর কি দৃষ্টান্ত হতে পারে ? অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বাগচি নাট্যাচার্য সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে, তাঁর দৃঢ়চিত্ততা, আদর্শনিষ্ঠা, কলাবিদ্যায় উৎসর্গীকৃত জীবনমহিমার পরিচয় দিয়ে ও তাঁর অভিনয়দক্ষতার সুষ্ঠু বিশ্লেষণ-সাহায্যে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার যতটুকু ধরে রাখা যায় সে বিষয়ে যথা সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তথাপি মনে হয় নটের জীবন দর্পণের প্রতি-বিম্বের ন্যায় ; দর্পণ কালের হাতে খণ্ড হলে এর প্রতিফলিত ছায়াও অন্তর্ধান করে। তাই আমাদের প্রাচীন কবিরা জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব প্রকাশ করতে অভিনয়ের স্বল্পস্থায়ী ছদ্মবেশধারণের উপমা দিয়েছেন। জীবন স্বভাবতই পদ্ম পত্রে জলের ন্যায় অস্থির ; তার উপর নটের জীবন আকস্মিকতার বায়ু-তাড়িত হয়ে এই অস্থায়িত্বকে আরও তীব্র, আরও মর্মান্তিকভাবে প্রকটিত করেছে।

শিশিরকুমারের নট-প্রতিভা ও নাট্যপ্রয়োগদক্ষতার যে বিশ্লেষণ ও উদাহরণ বাগচি মহাশয়ের গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তারপর আর এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শিশিরের অভিনয় ছিল চরিত্রের শুধু যথাযথ রূপায়ণ নয় ; তাদের প্রাণশিখার নিগূঢ় দীপ্তি, অন্তর-রহস্যের গূঢ়তম স্পন্দন, স্রষ্টার অসংজ্ঞান অভিপ্রায় তাঁর অভিনয়ে এমন নির্ধারিতভাবে ফুটে উঠত যে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হয়ে যেতাম। সৃষ্টি-যবনিকার অন্তরালে স্রষ্টার যে গোপন রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যেন হঠাৎ সেই প্রাণনিকেতনের অন্তঃপুরে নীত হয়ে এই রহস্যের অংশীদার হয়ে যেতাম। সৃষ্টিলীলার তত্ত্ব যেন আমাদের সামনে রূপ নিয়ে অপরূপ ছন্দে

প্রকাশিত হয়ে উঠত। শিশিরকুমার যখন যে চরিত্র অভিনয় করতেন তখন তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন, তাঁর সমস্ত চিন্তা, কর্ম, অবচেতন মনের ভাবপ্রবাহ যেন তাঁর সহজ সংস্কারের নিকট ধরা পড়ে যেত। এ যেন অন্তর-প্রকটনের জন্য দিব্য অনুভূতির X-ray-র অপরূপ প্রয়োগ।

সময় সময় কৌতূহল জাগে যে এই অসংখ্য চরিত্রাবলীর মধ্যে কার কার মধ্যে অভিনেতার নিজ জীবনরহস্যের স্বচ্ছতম প্রতিফলন ঘটেছে—কাদের মধ্যে অভিনেতা নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? আমার মনে হয় মাইকেল ও জীবানন্দ—এই দুটি চরিত্রই শিশির-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, নিজ ব্যক্তিত্ব প্রক্ষেপের সার্থকতম পটভূমিকা। প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ জীবনের অসামঞ্জস্য, রুদ্ধ বেগবান আবেগের প্রকাশ-ব্যাকুলতা, মানস অভীপ্সা ও বস্তুগত বাধার মধ্য দিয়ে তার ক্ষুব্ধ, খণ্ডিত রূপায়ণ—শিশির-চরিত্রের অসাধারণত্ব ও তাঁর জীবনে ট্রাজেডির মূল উৎস। মাইকেলের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখির এই অশান্ত পক্ষ-বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত রূপ পেয়েছিল। মেঘনাদ রচনাকালে কবির অস্থির পাদচারণা, উচ্ছল কল্পনার বহিঃপ্রকাশে শব্দ ভাণ্ডার ও ভাষা প্রয়োগের অপ্রাচুর্যজনিত বাধার ক্ষুব্ধ অনুভূতি শিশিরের অন্তরবেদনার, কৃপণ প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচিত চিত্ত-প্রশস্তির দৃপ্ত প্রতিবাদেরই অনিবার্য সংকেত। জীবানন্দের বেপরোয়া অসংযম; অকুণ্ঠ আত্মপ্রসার ও শেষজীবনের মর্মদাহী অনুশোচনা—মনে হয় যেন এর ভেতর দিয়ে শিশিরের ব্যক্তি জীবনের দৃপ্ত সাহসিকতা ও করুণ আত্মগ্লানির কিছুটা সুরমূর্ছনা মিশেছিল। তাঁর চাণক্য, রাসবিহারী, আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, এমন কি রামও—সব তাঁর নটকল্পনার অপূর্ব আত্মপ্রসারণের নিদর্শন। কিন্তু মাইকেল ও জীবানন্দে তাঁর নটজীবন ও ব্যক্তিজীবন এক অপরূপ সমন্বয়ে, পরস্পরের পরিপূরকরূপে, আলিঙ্গন বদ্ধ হয়েছে।

শিশিরের জীবন যে শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির একাধারে গৌরবোজ্জ্বল ও বিষাদ-গম্ভীর সুরের সংমিশ্রণ তা অস্বীকার করার উপায় নাই। মহৎকীর্তি, বিরাট সফলতা, কর্মসাধনার অদ্ভুত চরিতার্থতার সঙ্গে এক বেদনাপ্লুত, সুমহান

ব্যর্থতা, বিপুল ব্যক্তিত্বের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির নিকট বীরোচিত পরাজয় স্বীকার, নভোচারী অভীপ্সার শোচনীয় পরিসমাপ্তি—এই বিরোধী ভাবগুলিই তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি অনেক করেছেন, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যুগান্তর নিয়ে এসেছেন, অভিনয়কলার আশ্চর্য রূপান্তর সাধন করেছেন, কিন্তু তবুও অ-চরিতার্থ সংকল্পের বেদনা তাঁকে ঘিরে আছে। রঙ্গমঞ্চের যাদুকর শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সহজ বিচরণভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে অখ্যাত গৃহকোণে মাথা গুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটেনি, তথাপি ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের মত তাঁকে এলবা দ্বীপে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। দ্বাদশ সূর্যের তেজে মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করে, অস্তগমনকালে তাঁর চারিদিকে দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মেঘ-ম্লানিমা সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়, তাঁর বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ববোধ ও প্রখর স্বাধীনতাস্পৃহা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর শক্তি অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু কোন দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়েনি। কলালক্ষ্মীর প্রতি তাঁর অনাবিল নিষ্ঠায় এতটুকু ব্যবসায়িত্বের খাদ মেশেনি। অন্তিম সময়ে তুচ্ছ সরকারী খেতাবের প্রত্যাখানে তাঁর এই অনির্বাপিত তেজোবহ্নি শেষ বারের মত জ্বলে উঠেছে। মাইকেলের সঙ্গে যেমন তাঁর চরিত্রগত মিল, তেমনি তাঁদের মৃত্যু দিবসের অভিন্নত্বও তাঁদের উভয়ের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ককে উদ্ভাসিত করেছে। এক শতাব্দী পূর্বে নব বাংলার মহাকবি যে ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন, অধুনাতনকালে নবরঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান নির্মাতাও সেই একই ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয়েছেন।

মহৎ প্রচেষ্টার ট্র্যাজিক পরিণতি—বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের বিধি-নির্দিষ্ট অদৃষ্টলিপি ; এতে শোকের অবসর নাই বা দায়িত্ববণ্টনের প্রয়াসও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। রঙ্গমঞ্চের যে পূর্ব-ইতিহাস শ্রীযুক্ত বাগচির এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়ের অগ্রগতি নানা বাধাবিঘ্নে, বাইরের প্রতিকূলতা এবং অন্তরের সঙ্কল্প শিথিলতায় বারবার বিড়ম্বিত হয়েছে। নটজীবনের মর্মমূলে এমন এক অস্থির ঘূর্ণীবায়ু বাসা বেঁধেছে যে নাট্যকলা সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বারে বারে এক প্রমাদচক্রে আবর্তিত হয়েছে। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা রঙ্গা-

লয়ের ইতিহাসে যেমন মর্মান্তিকভাবে প্রকটিত হয়েছে শিল্পের অন্য বিভাগে এতটা নয়। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, ক্লাসিক, এমারেল্ড, নাট্যমন্দির, নাট্যনিকেতন, নবনাট্যমন্দির, আর্ট থিয়েটার—সব নূতন পতাকা উড়িয়ে, বিজ্ঞাপনের রঙীন আবরণে মণ্ডিত হয়ে, সাজসজ্জার জৌলুষ দেখিয়ে, আলোকসমারোহে চোখ ঝলসিয়ে মুহূর্তের জন্য এসেছে, আবার পর মুহূর্তেই কালস্রোতবাহিত বুদ্‌বুদের মত কোন অতল পারাবারে বিলীন হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দ বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় কখন যে কোন থিয়েটারের দ্বারপ্রান্তে লগ্ন হয়েছেন, কখন যে এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয় অবলম্বন করেছেন তার হিসাব-নিকাশ রাখতে গেলে এক রীতিমত চিত্র-গুপ্তের খাতা খোলা প্রয়োজন। যেখানে এই দ্রুত পরিবর্তনশীলতাই প্রচলিত রীতি সেখানে শিশিরকে ব্যতিক্রমধর্মী বলা যায় না। তবে শিশিরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কখনও কেবল ব্যবসায়ী-বুদ্ধি প্রভাবিত হয়ে এই পরিবর্তন স্রোতে গা ঢালেন নি, তাঁর পরিবর্তন ছিল হয় নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে, না হয় নিজ শিল্পিসুলভ স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার জন্য। মনে হয় যেন অভিনেতার দৃশ্যে দৃশ্যে ও পাত্র থেকে পাত্রান্তরে পরিবর্তনশীল রূপসজ্জার মধ্যেই একটা অস্থিরতার নীতিগত সংস্কার প্রচ্ছন্ন থাকে—ব্যক্তিসত্তার উপর আরোপিত কৃত্রিম ছদ্মবেশধারণ ব্যক্তিসত্তারই মূলকে শিথিল করে, তাকে পরিবর্তনোন্মুখ করে তোলে।

শিশির সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগতভাবে দুটো প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। প্রথমত তাঁর রঙ্গমঞ্চ সংস্কার ও প্রযোজনাকলা অভাবনীয় উন্নতিলাভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক যুগোপযোগী নাটক লেখার প্রেরণা তিনি দিতে পারেন নাই। তাঁর প্রযোজিত যে সমস্ত নাটক পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নয়, আধুনিক সমাজবিষয়ক ও তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখা, সেগুলিও নাট্যসাহিত্যের দিক থেকে খুব উন্নত পর্যায়ের নয়। তাঁর অভিনয়কলার যে অভ্রান্ত মান তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কোন নাটকই লেখা হয়নি। তাঁর অনুপম অভিনয়প্রতিভা যে দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর ও অবান্তর প্রসঙ্গে ভারাক্রান্ত নাটকের উপর প্রযুক্ত হয়েছে, এতে যেন মনে হয় যে নাটকের প্রাণরহস্য ঠিক রঙ্গমঞ্চ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল নয় ও

একের উন্নতিতে যে অপরের উন্নতি ঘটবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নাই। শ্রেষ্ঠ নাটক প্রতিভাবান নট ও কৌশলী মঞ্চপ্রযোজকের উপর নির্ভর করে না, তার উৎস জাতীয় জীবনের এক দুর্নিরীক্ষ্য রসোচ্ছলতায় নিহিত, এই বাস্তব প্রমাণ সমর্থিত সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত শিশিরকুমার শুধু যে অসাধারণ অভিনেতা ও মঞ্চ ব্যবস্থাপক ছিলেন তা নয়; তিনি ছিলেন জগতের নাট্যসাহিত্যের এক বিরল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রসবোদ্ধা ও সমালোচক, নাট্যতত্ত্বে এক অদ্বিতীয় বিদগ্ধমানসের অধিকারী। অভিনয়ের মানদণ্ডে নাটকের বিচার ও মূল্যায়ন এক তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিছুদিন থেকে একটা পরিকল্পনা আমার মনে আবর্তিত হচ্ছিল—সেটা হচ্ছে বাংলা নাট্যসাহিত্য থেকে কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় শ্রেষ্ঠ নাটক সংকলন, ও শিশিরকুমারকে দিয়ে তাদের অভিনয়গত উপযোগিতার আলোচনা। এটা কেবল পাণ্ডিত্যের আলোচনা হবে না, এটা হবে অভিনয়কলাবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, মঞ্চোপযোগিতার দিক থেকে নাটকের মূল্যায়ন। এই পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হত। শিশির এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এমন এক মার্জিতরুচি, সাহিত্যবোধসম্পন্ন সহযোগী যে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ের মৌখিক আলোচনা করে তাঁর বিচারবুদ্ধিপ্রসূত মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করে তাঁর দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত করে নেবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটে উঠল না ও বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা মহামূল্যবান আলোচনা বন্ধ থেকে গেল। জানি না ভবিষ্যতে কোনদিন এ ক্ষতির পূরণ হবে কি না।

আর ভূমিকা দীর্ঘতর করে লাভ নাই। সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট আমাদের মধ্যে যে প্রতিভাকে পাঠিয়েছিলেন আমরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না। প্রায় সব দেশেই প্রতিভার এইরূপ অপচয়ই ঘটে থাকে। শিশিরের জীবনব্যাপী সাধনা ছিল জাতীয় প্রেক্ষাগৃহ ও নাট্যকলা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তাতে সমস্ত জগতের নাটক ও নাট্যালোচনার গ্রন্থ সংগৃহীত

হবে ও নাটক পঠন-পাঠন ও তার কলাতত্ত্ব ও অভিনয় প্রয়োগের শিল্প-রহস্য শিক্ষা দেওয়া হবে। এর ভেতর দিয়া জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন, জাতীয় মানসবিকাশের আয়োজন ও রুচি ও সৌন্দর্যবোধের উন্নয়নও শিক্ষার বিষয় হবে। একেই তিনি তাঁর জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন ; এর জন্যই তিনি জীবনপাত করে গেছেন। রঙ্গমঞ্চে তাঁর উন্নত আদর্শ ও প্রয়োগ-কৌশল তাঁর পরবর্তীরা নিশ্চয়ই গ্রহণ ও নিজশক্তি মত তার রূপায়ন করবেন। কিন্তু জাতীয় জীবনে নাট্যসাহিত্যের যে মহত্তর সম্ভাবনা শিশির-কুমার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই মহত্তর সম্ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দিতে পারলেই তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ হবে এবং তিনি দেশবাসীর কাছে যে ভার ন্যস্ত করে গেছেন তা যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে। শ্রীযুক্ত মণি বাগচির এই জীবনীগ্রন্থ ভবিষ্যৎ নাট্যরসিকবৃন্দকে যদি সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তবেই তাঁর গ্রন্থরচনার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

। নমঃ নটনাথায় ॥

জীবনসায়াহ্নে জীবনের তিক্ততা আর ব্যর্থতা নিয়ে শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি : "বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের উপযুক্ত সন্তান হওয়ার গৌরব এবং অভিশাপ দুই-ই আমার জীবনে দেখা দিয়েছে।" তবু তিনি নটের ধর্মাচরণে ভ্রষ্ট হন নি, কারো কাছে মাথা নত করেন নি, শিশির-প্রতিভার আভিজাত্য এইখানেই। দেশকে তাঁর যা দেবার ছিল, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধরে অকৃপণ হস্তেই তিনি তা দিয়ে গেছেন। যে বিশ্বাস, স্বপ্ন ও আদর্শবাদ নিয়ে শিশিরকুমার একদা মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, সেই বিশ্বাস, স্বপ্ন ও আদর্শবাদ নিয়েই তিনি জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। এই বইতে আছে তারই কিছু ইতিহাস। এই বই যে শিশিরকুমারের সম্পূর্ণ জীবনচরিত বা তাঁর প্রতিভার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ, এমন দাবী আমি করি না। ভবিষ্যতে আমার চেয়ে যোগ্যতর কেউ নাট্যাচার্য সম্পর্কে যখন বিস্তৃততর আলোচনা করবেন, তখন তিনি যেন শুধু এই কথাটি মনে রাখেন : "He is a national monument"—যুগপ্রবর্তক নটের জীবন অনাদর-অবহেলার সামগ্রী নয়, তা সর্বতোভাবেই জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ।

এই গ্রন্থরচনায় অনেকের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে সাহায্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি ; এঁদের মধ্যে শ্রীঅমল হোম, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমুরারি ভাদুড়ী, শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী, শ্রীসত্যেন রায়, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস ও শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সান্যালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

জুন ৩০, ১৯৬০

৪।২বি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মণি বাগচি

আলমগীরের রূপসজ্জায় শিশিরকুমার

(ফটো—পরিমল গোস্বামী

॥ ১ ॥ যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে

নাট্যশালার প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের মুখে একটি কথা প্রায়ই শুনতাম: **A nation is known by its stage**, অর্থাৎ একটি জাতির পরিচয় মিলবে তার নাটকে, তার রঙ্গমঞ্চে। মাইকেলের একটি উক্তিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলতেন: জাতীয় নাট্যশালার পুনরুদ্ধার, জাতীয় সাহিত্য এবং সেইসঙ্গে জাতীয় জীবন উন্নয়নের একটি মহৎ অনুষ্ঠান। এ-দেশে জাতীয় নাট্যশালার প্রথম স্বপ্ন তো মাইকেলই দেখেছিলেন, কিন্তু এর স্রষ্টার গৌরব দীনবন্ধু মিত্রের। সাহিত্য জাতির মানসিক সম্পদের মাপকাঠি, কিন্তু তাই বলে মঞ্চের গৌরব বড়ো কম নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এবং চিত্রকলা—এদের যুগপৎ সমাবেশ একমাত্র ষ্টেজেই সম্ভব, কারণ সেইখানেই সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয় একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবন। রঙ্গমঞ্চ নিছক চিত্ত-বিনোদনের স্থান নয়। বার্ণার্ড শ তাই বলতেন: "A theatre is a place of importance. It is, in fact, a literary university." বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারও রঙ্গমঞ্চকে ঠিক এই চক্ষেই দেখতেন। এই আদর্শ নিয়েই তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। শিশিরকুমারের কথা বলবার আগে তাই বাংলা থিয়েটারের ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করতে হয়।

[illegible]জাতীয় নাট্যশালার ইতিহাস অর্থাৎ সখের থিয়েটার থেকে সাধারণ নাট্য-[illegible] (public theatre, বা commercial stage) গড়ে ওঠার ইতিহাস [illegible]মোটামুটি অনে[illegible] জানা আছে। তাই এই আলোচনা আপাততঃ [illegible]বিস্তৃতভাবে না করলেও চলবে; শুধু এর ক্রমবিকাশের ধারাটা উনিশ [illegible]শতকের নবজাগরণের পটভূমিতে সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারে শিশির-প্রতিভার সম্যক গুরুত্ব বুঝতে হলে, এর সূচনাকাল থেকেই শুরু করা উচিত। কিন্তু তার আগে বাঙালির নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য 'যাত্রা'র কথা একটু বলি।

শিশিরকুমার বলতেন, 'আমাদের দেশের যাত্রাই ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস এবং যুগের পরিবর্তনে আজকের দিনে এই যাত্রা কী রূপ নিতে পারত, সে বিষয়ে experiment করার ইচ্ছেও তাঁর ছিল, কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নি। গিরিশচন্দ্রও যাত্রা সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে জানা যায় এবং মঞ্চে পেশাদার নটের বৃত্তি গ্রহণের পরেও তিনি বহুবার যাত্রার উন্মুক্ত আসরে অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের বহু পৌরাণিক নাটকে গীতাভিনয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

'যাত্রা'-অভিনয় প্রসঙ্গে দুটি শতাব্দীর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—ষোড়শ আর উনবিংশ। যাত্রার বীজপত্তন হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে। অঙ্কুর দেখা গেল উনবিংশ শতকে। বাঙালি 'যাত্রা' পেয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছ থেকে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে চন্দ্রশেখরের বাড়ির আঙিনায় তিনি 'দানলীলা' অভিনয় করেন। মহাপ্রভু রাধার ভূমিকা গ্রহণ করেন, আর অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস যথাক্রমে কৃষ্ণ, যোগমায়া ও নারদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। হরিদাস ছিলেন সূত্রধার, বাসুদেব নেপথ্যরচয়িতা। চন্দ্রশেখরের আঙিনায় বাঁধা রঙ্গমঞ্চ ছিল না, দৃশ্যপট ছিল না। এই 'দানলীলা' অভিনয়ই আদিভূত কৃষ্ণযাত্রা, যদিচ অভিনয়ের 'যাত্রা' নাম তখন ছিল অজ্ঞাত। চৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের রুক্মিণীবেশে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের উল্লেখ আছে। তাঁরই প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে বহুতর রূপান্তর সংসাধিত হয়েছিল। *The Indian Stage* গ্রন্থের লেখক বলেন যে, মহাপ্রভুর আগে বাংলাদেশে 'যাত্রা' ছিল এবং তা ছিল শাক্তযাত্রা—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি পালা গান হোত। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছড়ায় গানে পাঁচালি জাতীয় কিছু থাকা তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তার নাম যে 'যাত্রা' ছিল এমন প্রমাণ কোথায়? উনবিংশ শতাব্দীর আগে নাট্যাভিনয় অর্থে 'যাত্রা' কথাটা প্রচলন হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে 'উৎসব' অর্থে 'যাত্রা' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রাচীন। অধিক কথায় অধিক

গানে অভিনয়—এই হোল সত্যকার যাত্রা। তার আগে যাত্রার রূপ ছিল স্বল্প কথায় প্রায় গান-সর্বস্ব অভিনয় এবং এই ধারাটি পদাবলী কীর্তন থেকেই উদ্ভূত হয়। এই ধারার প্রথম আবির্ভাবের সময় নাট্যাভিনয়ের 'যাত্রা' নাম বাংলা দেশে প্রথম প্রচলিত হয়। এর আগে এ নাম ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে প্রচলিত ছিল কি না, জানা যায় না। এই যাত্রার জনপ্রিয় প্রচারক রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, বিন্দুবাসিনী, কমলাকান্ত ইত্যাদি।

বাংলা দেশে উন্নতশ্রেণীর যাত্রা (যাকে আমি বলেছি সত্যকার যাত্রা) প্রবর্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় 'কালীয় দমন' বা 'কৃষ্ণযাত্রার' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এবং এরই স্রষ্টা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী। এই 'কালীয় দমন' যাত্রার জনপ্রিয়তা উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে শুরু হয়ে দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। লীলাকীর্তনের সঙ্গে নাট্যাভিনয় যুক্ত করে পালা গানে তিনি এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। চল্লিশ বছরের ওপর চলেছিল তাঁর দল। ১২০১ বঙ্গাব্দে এঁর জন্ম হয়। গোবিন্দ অধিকারীর এই 'কৃষ্ণযাত্রা'কেই আমরা আধুনিক কালের যাত্রার আদিপর্ব বলে ধরে নিতে পারি। এরপর সখের যাত্রায় যখন দেশ ছেয়ে যায় তখনো কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি, বাঙালির কোনোদিনই এতে অরুচি হয় নি। এই গোবিন্দ অধিকারীর প্রকৃত উত্তরসাধক ছিলেন মতিলাল রায়—তাঁরও যাত্রা সত্যকার যাত্রা ছিল। কলকাতায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এই মতিলাল তাঁর দল প্রতিষ্ঠা করেন। মনোমোহন বসুর অনুকরণে যাত্রাকে গীতাভিনয়ের স্তরে তিনিই উন্নীত করেন। এঁর কথা পরে বলছি। 'কালীয় দমনের' পর যাত্রার আসরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। বাংলার জমিদারেরা দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রাগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁরাই ক্রিয়া-কর্মে, পূজাপার্বণে তাঁদের বাড়ির ঠাকুর দালানে বা নাটমঞ্চে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করতেন। লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দুই-ই এর মাধ্যমে হোত।

আগেকার যাত্রায় অধ্যক্ষ ও পালা রচয়িতারা আধুনিক নাট্যকারদের মতন বিদ্বান না হলেও তাঁরা ভক্ত ছিলেন এবং তাঁদের রচিত পালা ও তার

গানগুলো অতি সহজেই শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষণ করতো। গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রসিক চক্রবর্তী, নীলকমল গোস্বামী প্রভৃতির গানে একসময়ে সমগ্র বাংলা দেশ ধ্বনিত হোত। তখন পোষাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক বা চাকচিক্য ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের সেই সরল ভাষায় রচিত সরল প্রাণের সরল কথাগুলি এবং সেই সোজা কথায় রচিত অনুপ্রাসবহুল গানগুলি শুনে দর্শকগণ আত্মহারা হতেন। সে-অভিনয়ের ও সে-গানের সুর অনেক দিন পর্যন্ত দর্শকদের প্রাণে বাজতে থাকতো। ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন: "উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রাপদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আসিতেছিল। কৃষ্ণলীলা-চৈতন্যলীলা-দেবলীলার স্থানে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত্র, কমলে-কামিনী, নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মত অপৌরাণিক আদিরসসিক্ত আখ্যায়িকা অধিক আদরণীয় হইতেছিল। সেই সঙ্গে নাচগানের বাহুল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামির প্রাচুর্যও দেখা দিল।" ক্রমে যাত্রার রূপ বিকৃত হয়ে যায় এবং উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নব-উদ্ভূত রঙ্গমঞ্চ ও তার নাটকের প্রভাব এসে পড়লো যাত্রার ওপর। কিন্তু তার আগে পুরাতন যাত্রার প্রসঙ্গ আরো একটু আলোচনা করতে হয়।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাগানের প্রসিদ্ধি এক সময়ে বড়ো কম ছিল না। নীলকণ্ঠ স্বয়ং বৃন্দার ভূমিকা অভিনয় করতেন। পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার খ্যাতি। পূর্ববঙ্গকে যেমন মাতিয়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, সমগ্র রাঢ় দেশকে তেমনি মাতিয়ে তুলেছিলেন নীলকণ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালি রচয়িতা প্রতিভাবান কবি দাশরথির মৃত্যুর চার বছর পরে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে) নীলকণ্ঠের জন্ম হয়। গোবিন্দ অধিকারীর পর তাঁর প্রবর্তিত 'কালীয় দমন' পদ্ধতিতে কীর্তনাঙ্গ যাত্রার পূর্ণাঙ্গ মৌলিক 'পালা' প্রথম রচনা করেন নীলকণ্ঠ। যাত্রার আসরে ক্ষেত্রোপযোগী নূতন গান রচনা করে গাইতেন তিনি—রচনা ও গাওয়া একই সঙ্গে চলতো। কথিত আছে, নীলকণ্ঠের সুকণ্ঠে ভক্তিরসাত্মক গভীর ভাব-পূর্ণ মধুর গান শুনে হাজার হাজার শিক্ষিত লোকও আত্মহারা হয়েছেন, অশ্রু বিসর্জন করেছেন। এই যে দর্শকচিত্তে ভাবের তরঙ্গ বইয়ে দেওয়া, এটা

কেমন করে সম্ভব হোত? অধিকারীদের ধর্মনিষ্ঠা ছিল। যাত্রা গাইবার বা মহলা দেবার সময়ে ভক্তিভাবে ভগবতী সরস্বতী দেবীর রীতিমতো বন্দনাদি করে তাঁরা কার্যারম্ভ করতেন এবং যথারীতি মনোযোগ সহকারে পালা গাওয়া হোত। যাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল নাট্যকলা-কুশলতায় নয়, রচনার মধ্যে। প্রাচীন যাত্রার 'পালা' যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ তথ্য অজানা নয় যে, অনুপ্রাসবহুল হলেও তার রচনার উৎকর্ষতা লক্ষণীয়। তারপর সরস সরল অথচ গভীর ভাবপূর্ণ, এমন কি নিরক্ষর লোকের সুবোধ্য ভাষায় অভিনয় করা হোত। তখন যাত্রার পালা যেমনভাবেই অভিনীত হোক না কেন, অতি সহজেই তার ভাব ও ভাষা শ্রোতাদের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যেত। যাত্রায় সুরতাললয়যুক্ত গান ছিল মুখ্য, অভিনয় গৌণ। এইসব কারণেই বাংলার প্রাচীন যাত্রা লোকশিক্ষার একটা বড়ো মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাত্রার রূপ পাল্টালো উনিশ শতকের মধ্যভাগে। সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর সাধিত হয়ে থাকে। এই যুগে যাত্রার পরিবর্তিত রূপের নাম 'গীতাভিনয়'—এটা যাত্রার পালা গান ও নাটকের মাঝামাঝি এক রকমের অভিনয়। গীতাভিনয় পুরোদস্তুর নাটকই—দৃশ্যপট-বিবর্জিত অভিনয়। প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি দেশের লোকের বিতৃষ্ণাও এইসব গীতাভিনয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল। সমসাময়িক একটি পত্রিকা এই বিষয়ে লিখছেন: "ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশের শিক্ষিত ভদ্র-লোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালা স্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেছেন।" এই সময়কার অভিনীত গীতাভিনয়-গুলির মধ্যে রত্নাবলী গীতাভিনয়, শকুন্তলা গীতাভিনয়, সাবিত্রী-সত্যবান গীতাভিনয়, জানকী-বিলাপ গীতাভিনয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। গীতাভিনয়ের ওপর সদ্য উদ্ভূত নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন রত্নাবলী গীতাভিনয়; রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনেই এটি রচিত হয় এবং এর রচয়িতা ছিলেন হরিমোহন কর্মকার। তখনকার দিনে ইনি একজন প্রসিদ্ধ গীতাভিনয় রচয়িতা ছিলেন। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত একাধিক সখের যাত্রা-

দলেই এইসব গীতাভিনয়ের অভিনয় হোত। এসব দল ভদ্রসন্তানদেরই উদ্যম ছিল। তবে এ-কথা ঠিক যে, পূর্বযুগের ধরণ-ধারণ সখের যাত্রাদলে অনেক পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। তারপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকে এসে এই গীতাভিনয় একটা পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ করে এবং এই শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষভাগে গীতাভিনয় অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই যুগের গীতাভিনয় রচয়িতাদের মধ্যে দুজন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়। এঁদের দুজনেরই ওপর মনোমোহন বসুর বিশেষ প্রভাব ছিল।

ডাঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গীতাভিনয়-যাত্রাকে যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে দেশের জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের ও লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায় করিয়া তুলিলেন তাঁহারা প্রথমে ছিলেন পাঁচালি-রচয়িতা ও পাঁচালি-গায়ক। ইঁহারা প্রচুর পরিমাণে কথকতার বক্তৃতা ও পাঁচালির পৌরাণিক প্রসঙ্গ ঢুকাইয়া এবং পল্লীগীতির সরল সুর গানে যোগ করিয়া, গীতাভিনয়কে একদা সুপরিচিত পরিবর্ধিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।" ব্রজমোহন ও মতিলাল উভয়েই যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে মতিলাল রায়ই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেন। এঁর দলের নাম ছিল 'নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়'। ইনি বর্ধমানের লোক ছিলেন; কিন্তু নবদ্বীপে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বলেই তাঁর দলের ঐরূপ নামকরণ হয়েছিল। এই দল প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। শিশির-কুমার মতিরায়ের যাত্রার প্রশংসা করলেও দুঃখ করে বলতেন, মতি রায় আর মথুর সাহার হাতেই যাত্রা বিকৃত হয়েছে—বহুল পরিমাণে থিয়েট্রিকাল হয়ে উঠেছে। মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁর দল চালিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মদাস এবং তারপর ধর্মদাসের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ। আমি ধর্মদাস ও ভূপেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখেছি। তখনকার কালে বাংলা দেশে ভূপেন্দ্রনাথের মতন প্রিয়-দর্শন ও সুকণ্ঠ যাত্রাভিনেতা খুব কমই ছিল। ইনি মঞ্চাভিনেতা রূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার ইনি একজন অনুরাগী ছিলেন। মতিলাল রায় তাঁর দলের পালা নিজেই রচনা করতেন এবং ধর্মদাস পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল।

মতিলাল রায় একজন ভক্ত ও জ্ঞানী সুলেখক ছিলেন। বাংলার পণ্ডিত-সমাজে তাঁর গীতাভিনয়গুলির খুব সমাদর ছিল এবং বহু স্থানের একাধিক পণ্ডিতসমাজ মতিলালকে উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই প্রতিভাবান মনীষী একাধারে পালা-রচয়িতা, অভিনেতা, সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক ছিলেন। যাত্রার নূতন পদ্ধতি—গীতাভিনয়কে তিনিই পরিচ্ছন্ন রূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি স্বরচিত প্রত্যেক নাটকেই এক-একটি ধর্মভাবের ভূমিকা (যেমন 'বিদুর') গ্রহণ করতেন। মহাভারতের বিদুর-চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো। কথিত আছে, এইসব ভূমিকা অভিনয়কালে লিখিত নাটকের কথা এবং সেই সঙ্গে অনেক কথা তিনি আসরে মুখে মুখে রচনা করে বলতেন। তাঁর সেইসব কথা গভীর ভাবপূর্ণ, নীতিপূর্ণ ও হৃদয়-গ্রাহী ছিল। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে দুই যুগ ধরে মতিলাল রায়ের গীতাভিনয় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও তাঁর গীতাভিনয়গুলিকে উচ্চশ্রেণীর নাট্যরচনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না, তথাপি "ইঁহার সুকণ্ঠের গান ও বাগ্মিতা এবং পালায় পাঁচালির ও কথকতার মিশ্রণ সহজেই লোকের মন কাড়িয়া লইয়াছিল।" অবশ্য পারিপাট্য ও কৌশলের দিক দিয়ে ব্রজমোহনের পালাগুলিই সমধিক উৎকৃষ্ট ছিল। মতিলাল-রচিত গীতাভিনয়ের সংখ্যা ত্রিশখানিরও বেশি এবং প্রায় সবগুলির আখ্যানভাগ পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত থেকে গৃহীত। 'তরণীসেন বধ' তাঁর একখানি বিখ্যাত পালা। গীতাভিনয়ের পরিণত রূপ হলো গীতিনাট্য, যা রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে মঞ্চে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। যাত্রার প্রসঙ্গ এতখানি বলা হলো এই কারণে যে, যাত্রাই হোল বাংলার নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য এবং গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার—এঁরা সকলেই বাঙালির এই নিজস্ব নাট্যসম্পদের প্রবল অনুরাগী ছিলেন।

এইবার নাট্যশালার কথা। এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বিদেশী রঙ্গালয়ের অনুকরণেই আজকের বাংলা নাট্যশালা গড়ে উঠেছে। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন যাত্রাভিনয় ও তার ক্রমবিকাশের চেহারা নিঃসন্দেহে এ নয়। কলকাতায় ইংরেজি রঙ্গালয়ই এর প্রতিষ্ঠা ও প্রেরণার উৎস। যাত্রার আসর

ছেড়ে বাঙালি দর্শক কেমন করে বসল এসে বিদেশী ধরণের প্রেক্ষাগৃহে, এইবার সেই কথাই বলব। বাংলা থিয়েটারকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) সখের থিয়েটার; এবং (২) সাধারণ রঙ্গালয় বা পেশাদার থিয়েটার। এই দুই পর্বের ইতিহাস আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে প্রসঙ্গতঃ দুই-একটা কথা বলা দরকার। বাংলা থিয়েটার ও বাংলা নাটক, দুই-ই ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফল,—এই অভিমতটি বিচার করে দেখা যেতে পারে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরে দেখা যাবে যে, এদেশের সমাজ-জীবনে সংস্কৃতির প্রাধান্য ইংরেজ আসবার বহু আগে থেকেই ছিল। অবশ্য সে সংস্কৃতির রূপ ছিল স্বতন্ত্র এবং তা উদ্ভূত হয়েছিল আর্য-অনার্য সংস্কৃতি ও লোকাচারের মিশ্রণের ফলেই। মিশ্রণই হোক আর যাই হোক, বঙ্গ-সংস্কৃতির স্বকীয় ধারা দীর্ঘকাল যাবৎ এই ভূখণ্ডের জনগণের মনকে নানা-ভাবেই সঞ্জীবিত করে রেখেছিল। সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং নিগূঢ়। পৃথিবীর সকল দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই এটা একটা চিরন্তন সত্য। ইংরেজ যখন বাংলাদেশে এসেছিল, তখন বাংলার অর্থ-নৈতিক জীবনের প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায়। সেই নিরুদ্বেগ অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে বাঙালি যে তার সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেই তার নিদর্শন আছে। সেই সংস্কৃতি ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক এবং তার প্যাটার্ণ ছিল স্বতন্ত্র। জমিদারের বিশাল নাটমণ্ডপে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, রামায়ণ গান, কথকতা, ধর্মতত্ত্ব প্রচার, কীর্তন, গ্রামের বারোয়ারিতলায় নানাবিধ উৎসব ও পূজাপার্বন উপলক্ষে কথকতা, যাত্রা, গানের জলসা; অন্তঃপুরে নানাবিধ ব্রতাচার; শারোদৎসবের সময় সারি গান, জারি গান—এই ছিল ইংরেজ-পূর্ব গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক রূপকল্প। মুর্শিদাবাদ শহরের ঐশ্বর্যই শুধু ক্লাইভের চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় নি, সেখানকার সাংস্কৃতিক বর্ণচ্ছটা দেখেও তিনি কম বিস্মিত হন নি। মোট কথা, ইংরেজ-পূর্ব যুগের বাংলায় "জনসাধারণের একটা নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ছিল এবং সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রূপকল্পও

ছিল।" এবং "তৎকালীন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশের একটা মোটামুটি সমন্বয় ঘটেছিল।" বলা বাহুল্য, এ সবই সম্ভব হয়েছিল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলেই। সেদিন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন যেমন ছিল গ্রামাশ্রয়ী, এর সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাও তেমনি গ্রামীন জীবনকেই কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজের বৃহৎ অংশকে সেদিন সঞ্জীবিত করে রেখেছিল।

ইংরেজ আসার পর এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ধীরে ধীরে একটা রূপান্তর সাধিত হতে থাকে। ক্রমে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়ে এলো কলকাতার দিকে। দুইটি বিভিন্ন ধারার অভিঘাতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে উনিশ শতকের গোড়াতেই ঘটলো একটা বিরাট পরিবর্তন—পরিবর্তন বললে ঠিক হবে না, যা ঘটলো তাকে আমরা বলতে পারি বর্ণসাংকর্য। সকল দেশেই যুগসন্ধিক্ষণে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন বর্ণসাংকর্য ঘটে এসেছে। সমাজে দেখা দিল নূতন শ্রেণীবিন্যাস—বাঙালি দালাল গোমস্তা দেওয়ান বেনিয়ান ও মুন্সী। শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ ঘটলো—সমাজের উপর তলা ও নীচের তলার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল। সংস্কৃতি তখন আশ্রয় নিল শহরের বৈঠকখানায়। আর এই নব অভ্যুদিত শ্রেণীর কবলে পড়ে সংস্কৃতির রূপ-কল্পের মধ্যে যেসব বিকৃত জিনিস দেখা দিল তাই সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, তরজা গান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে। কলকাতার এই 'বাবু-কালচারের' ধারা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। হিন্দু কলেজের শিক্ষা যখন কয়েকজন বাঙালির মনের আকাশকে রাঙিয়ে দিল, তখন শোভাবাজার-সংস্কৃতির যুগ শেষ হয়ে বাংলায় সত্যই এক বিস্ময়কর নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হোল। সেই সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। কিন্তু এই সংস্কৃতি একান্তভাবেই ছিল নব অভ্যুদিত শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি—উজ্জ্বল হলেও তা সর্বসাধারণের সংস্কৃতি ছিল না। বাংলায় নাটক ও নাট্যশালা ঠিক এই যুগ-সন্ধিক্ষণে শিক্ষিতদের প্রয়াস হিসাবেই প্রথম দেখা দিয়েছিল।

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লেখক বলেছেন, প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীয় কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না, তাই তা স্থায়ী হতে পারে নি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি-জীবনের ওপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখনো পর্যন্ত বাঙালিরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান প্রভৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল ; নূতন য়ুরোপীয় ধরণের কোনো আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে নি। এই অভাব তারা অনুভব করলো এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন হোল ; গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির কাছে রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও স্থূল মনে হতে লাগলো। নানা কারণেই যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাল ; কলকাতার এখানে-ওখানে এবং গ্রামাঞ্চলে যাত্রার আসর বসতো বটে, কিন্তু আগের মত সকল শ্রেণীর দর্শককে তা আর আকৃষ্ট করতে পারল না। একদিন ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র একত্র বসে রাত কাটিয়াছে সেই আসরে। মুগ্ধ হয়েছে পালার বর্ণিত উপাখ্যান শুনে, আর তার গানে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, বিদেশী সাহিত্য ও নাটকের সঙ্গে পরিচয় এবং শহর কলকাতায় ইংরেজি রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিরাট এক দর্শকগোষ্ঠীর রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিল বদলিয়ে। একদিকে এই মানসিক পরিবর্তন, অপর দিকে যাত্রার অভিনয়, সাজসজ্জা সব কিছুরই ক্রমবর্ধমান অধোগতি, অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করলো। মোট কথা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন তখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের চিত্তবিনোদনের জন্য তখন শহরে যেসব ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে রঙ্গালয় ছিল অন্যতম। ইংরেজ যেখানেই গিয়েছে, সেখানে সে সঙ্গে করে থিয়েটার নিয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত আকৃষ্ট হলো সেই দিকে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা নিজেদের বাড়িতে শহরে ইংরেজদের নাট্যশালার অনুকরণে ইংরেজি নাটকের অভিনয় আরম্ভ করে বাঙালিদের মনে নাট্যানুরাগ জাগিয়ে তোলেন। এ প্রয়াস সীমাবদ্ধ হোলেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। বলা বাহুল্য, এর মূলে ছিল হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা ; এইখানেই শেকৃসপিয়রের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয়। তাই দেখতে পাই যে,

বাঙালি-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হোল শেক্‌সপিয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে। বাঙালি যদি একটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতি না হোত, তার সংস্কৃতিবোধ যদি আদৌ না থাকতো, তা হলে ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তার চিত্তের উদ্ভাসন অত তাড়াতাড়ি হোত কি না সন্দেহ। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটক দুইয়েরি উৎপত্তি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের দ্বারা বিদেশী এলিজাবেথীয় আদর্শে, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলবো যে, বাঙালির চিত্তে সংস্কৃতির যে পলিমাটি সঞ্চিত ছিল, তাই এ-যুগে তার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রকে উর্বর করে রেখেছিল। সেই উর্বর ক্ষেত্রেই ইংরেজি শিক্ষার বীজ বপনের ফলে সৃষ্ট হোল তার নাট্যশালা, রচিত হলো বাংলা নাটক। দেশের সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে মাইকেলের নাড়ির যোগ ছিল, তাই না কলকাতায় বিলিতি ধরণের থিয়েটার যখন স্থাপিত হোল, তখন থেকেই একমাত্র তিনিই জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখে এসেছেন। কি মহাকাব্য রচনায়, কি নাটক রচনায় মাইকেলের প্রেরণার উৎস ছিল খাঁটি জাতীয়তাবোধ। নবজাগ্রত বাঙালির মনে এই জাতীয়তাবোধকে সেদিন তিনি যদি উদ্দীপ্ত না করে তুলতেন, তাহলে বিদেশীর অনুকরণে স্থাপিত থিয়েটার অত শীঘ্র জাতীয় নাট্যশালায় রূপান্তরিত হোত কি না সন্দেহ, কিংবা অত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালির নাট্যসৃষ্টি সুপ্রচুর হয়ে উঠতো কি না সন্দেহ।

সকল সভ্য-দেশের প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যালোচনার ও নাট্যশালার এক-একটা ইতিহাস আছে। এইসব ইতিহাস থেকে ঐসব দেশের নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশিল্পের ক্রমোন্নতির একটা চিত্রের সঙ্গে সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থারও একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। নাট্যশালার ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। ভারতবর্ষের নাট্যশালার প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা আজো পাই নি। প্রাচীন কাব্য ও নাটকে ভারতের প্রাচীন নাট্যশালার অস্তিত্বের কথা এবং তার উৎকর্ষতার কথা থাকলেও তা থেকে এমন কোনো উপকরণ সংগ্রহ করা যায় না, যা দিয়ে আমরা একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করতে পারি? এই ক্ষেত্রে গবেষণার অবকাশ আজো রয়েছে। তবে বর্তমান ভারতে অন্যান্য প্রদেশের

মধ্যে বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাই সমধিক; স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বলতে একমাত্র কলকাতা শহরেই আছে, অন্য কোথাও নেই। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের বয়স প্রায় একশত বৎসর হোতে চললো। কিন্তু এখানকার নাট্যশালার ইতিহাস আরো প্রাচীন—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা এর ধারাবাহিক ইতিহাস পাই। এই যে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা থিয়েটারের এত প্রসার ও প্রতিপত্তি ঘটেছে, এর একটি প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির মতন নাট্যানুরাগী জাতি আর কেউ নয়। বাংলা থিয়েটারের প্রসারলাভের আরো একটি কারণ উনিশ শতকীয় নবজাগৃতি বা রেনেসাঁর ফলে বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, ও চিত্রকলার বিকাশ। রঙ্গমঞ্চ তো এই তিনটি প্রধান কলাবিদ্যারই সমন্বয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

বাংলা থিয়েটারের উৎপত্তির কথা লিখতে গিয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে* লিখেছেন: "বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তির স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে কতক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন আমাদের প্রাচীন যাত্রা পাচালি প্রভৃতি হইতেই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া ও কিছু কিছু নূতন সংযোজিত হইয়া এই সকল নাটক ও নাট্যাভিনয় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। অবশ্য তাঁহারা এ-কথা স্বীকার করেন যে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকাবলী ও তাহাদের অভিনয় ইহাদের মূলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে বর্তমান। কালবশে রূপান্তরিত মাত্র। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় একমাত্র ইংরেজি নাটকাভিনয়েরই অনুকরণ।"

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহর কলকাতায় ইংরেজদের চিত্তবিনোদনের জন্য দুটি রঙ্গালয় ছিল; একটি লালবাজারের মোড়ের দক্ষিণ দিকে (এর নাম ছিল 'The Play House'), আর অপরটি ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পেছনে (এর নাম ছিল 'The Calcutra Theatre')। কথিত আছে যে, ইংলণ্ডের তৎকালীন খ্যাতনামা নট ডেভিড গ্যারিক ক্যালকাটা থিয়েটারের জন্য

* বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসরচনায় ক্ষেত্রে ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রয়াসই সর্বপ্রথম; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর পরবর্তী।

বিলাত থেকে দৃশ্যপটাদি পাঠাতেন—(*Hicky's Bengal Gazette*)। কিন্তু উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারগুলির মধ্যে চৌরঙ্গীর সাঁ-সুচি ('sans souci') থিয়েটারটিই ছিল প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "দেশীয় সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অভিনয়-ক্রিয়ার মাধুর্য এবং উপকারিতা মুদ্রিত করিতে সাঁ-সুচি নাট্যশালা যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, সে সময়কার অপর কোনো নাট্যশালাই সেইরূপ করিতে পারে নাই।" লেবেডেফের প্রয়াস (Bengaly Theatre) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। লেবেডেফের প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের নাম সংযুক্ত আছে। এই ক্ষণস্থায়ী প্রয়াসের ঠিক ছত্রিশ বছর পরে আমরা পেলাম 'হিন্দু থিয়েটার'। এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃব্য ছিলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রকৃত ইতিহাস এইখান থেকেই আরম্ভ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয়। শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজর' নাটকের অংশ বিশেষ ও উইলসন (Horace Hayman Wilson—ইনি সাঁ-সুচি থিয়েটারের একজন অভিনেতাও ছিলেন এবং ইনিই এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন) কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।" প্রসঙ্গত দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামও উল্লেখ করতে হয়। প্রভূত অর্থশালী, নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক দ্বারকানাথ একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পানুরাগী ছিলেন। প্রতিভাবান্ এই মানুষটি কলকাতার ইংরেজি রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন শুধু একজন দর্শক হিসেবে নয়, মালিক হিসেবেও। চৌরঙ্গী থিয়েটারের মালিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

এক হিসাবে আমরা কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং শেক্সপিয়রকে বাংলা থিয়েটারের জন্মদাতা বলতে পারি, বিশেষ করে শেক্সপিয়রকে। হিন্দু কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের সময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালি শেক্সপিয়রের নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করে। তাঁর মুখে শেক্সপিয়রের নাটকের সুন্দর আবৃত্তি শুনে ছাত্ররা

মুগ্ধ হোত, অনুপ্রাণিত হোত। কী সে-যুগে, কী এ-যুগে, শেক্সপীয়র শিক্ষিত বাঙালির চিরকালের প্রিয় নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এই দুই দিক্‌পাল অভিনেতা, শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের শেক্সপিয়র-প্রীতি তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদের মধ্যেই পাই। প্রসন্নকুমারের ওই রঙ্গালয়ে অনেক বাঙালি দর্শকের সমাগম হয়েছিল। অবশ্য, রাজা রাধাকান্ত প্রভৃতির মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালি দর্শকের। বিদেশী দর্শকও কিছু কিছু ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত। জনসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নি। প্রসন্নকুমারের মত এক অর্থশালী বাঙালির পক্ষেই রঙ্গালয় নির্মাণ সেদিন সম্ভব ছিল। কিন্তু বিত্তহীন সাধারণ বাঙালিও ওই ধরণের কাজে অগ্রসর হতে না পারলেও, তারাও যে তাই চায়, সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে আমরা সে কথা জানতে পারি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাতে বলা হয়েছে: "এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই।" দেখা যাচ্ছে, এই উক্তি প্রসন্নকুমারের উদ্যমের পাঁচ বছর আগের কথা। যাই হোক, ইংরেজি নাটক নিয়ে বাংলা নাট্যশালা জনপ্রিয় হয়ে উঠল না। বাঙালির রসিক চিত্ত ইংরেজের হুবহু অনুকরণে পরিতৃপ্ত হোল না। এর পরেই কলকাতায় যে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় তাতে ইংরেজি নাটকের পরিবর্তে বাংলা নাটক অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির উদ্যোগে, বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবীনচন্দ্র বসু।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই নাট্যশালাটি নবীন বসুর স্থাপিত হয়। রঙ্গমঞ্চ বা চিত্রিত নাট্যশালা বলতে যা বোঝায়, থিয়েটার প্রথমে সেরকম কিছু ছিল না। তিনি বিপুল অর্থব্যয় করে (প্রায় দুই লক্ষ টাকা) 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন এবং যে তিন

বছর এই থিয়েটারটি সচল ছিল, সেই তিন বছরে এই একটিমাত্র নাটকেরই অভিনয় হয়েছিল। প্রতি বৎসর চার-পাঁচটির বেশি অভিনয় হোত না। নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী নবীন বসুর সুবিশাল অট্টালিকার নানা স্থানে প্রকৃত সাজসজ্জাদির দ্বারা সাজান হয়েছিল, দর্শকদের ঘুরে ঘুরে দেখতে হোত। সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যার ভবনে প্রবেশের দৃশ্যটি realistic-এর চূড়ান্ত করে দেখান হয়েছিল ; সত্যই এক ঘর থেকে অন্য ঘরের মধ্যে মাটি খুঁড়ে আসল সুড়ঙ্গ করা হয়েছিল। এই অভিনয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, স্ত্রী চরিত্র-গুলি স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হোত রাত সাড়ে বারোটায়, আর শেষ হোত পরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টায়। শেষের দিকে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন 'হিন্দু পাইওনিয়ার' ও 'হিন্দু রিফর্মার' এই উভয় পত্রিকাতেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার ও নবীন বসুর রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নবীন বসুর এই নাট্যশালা দু'কারণে কলকাতাবাসীদের চমৎকৃত করেছিল। প্রথম, ইংরেজের অনুকরণে গঠিত এই রঙ্গালয়ে এই প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হোল। দ্বিতীয়ত, সেদিনের নানা সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে বাস করেও নির্ভীক নবীনচন্দ্র রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের আহ্বান করেছিলেন। বিদেশী লেবেডেফের পক্ষে এ সহজ হলেও নবীনচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল না। যথেষ্ট দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। এর চল্লিশ বছর পরে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী লওয়া হয়। দর্শক-মনে তখন বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। আরো একটা কথা। শুধু যাত্রাভিনয়েই অভ্যস্ত বহু দর্শকেরই নাট্যশালার সঙ্গে পরিচয় ঘটল এই নবীন বসুর থিয়েটারেই। এক হাজারের ওপর দর্শক সমাগম হয়েছিল। জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ ও অন্যান্য নানা জাতেরও দর্শক উপস্থিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শ্রেণীবিভেদও ছিল বলে মনে হয় না। থিয়েটারে পতিতাদের অর্থোপার্জনের পথ খুলিয়ে দিয়ে, নবীনচন্দ্র বাংলার সমাজ-জীবনে একটা বড়ো রকমের নৈতিক বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন এবং এই কারণেই তাঁর প্রচেষ্টা নাট্যশালার ইতিহাসে বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

নবীন বসুর থিয়েটারের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে কলকাতায় একটিও স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যাই হোক, হিন্দু থিয়েটার শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যে নাট্যস্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছিল, তা এই সময়ে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। চৌরঙ্গীর সাহেবদের থিয়েটারের দর্শক তখন বেশির ভাগ বাঙালি; বাঙালি অভিনেতাও এখানে অভিনয় করেছেন। শেক্সপিয়রের নাটকই তখন কি সাহেবপাড়ার থিয়েটারে, কি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের থিয়েটারে মঞ্চস্থ হোত। ছাত্রদের উত্তম অবশ্য ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের অংশ বিশেষের অভিনয়ের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেত। হিন্দু কলেজ, ডেভিড হেয়ার একাডেমি আর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি—প্রধানত এই তিনটি শিক্ষায়তনের ছাত্ররাই বেশি উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৫৩-তে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্ররা 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' নামে একটি নাট্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন; এই নাট্যসম্প্রদায় দু' বছরে শেক্সপিয়রের চারখানি নাটক অভিনয় করেন। এঁদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন প্রথমে ক্লিঙ্গার সাহেব, পরে এলিস নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা। ফলে, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে অভিনীত 'ওথেলো'র খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। দেশীয় লোক তখনো পর্যন্ত থিয়েটারকে বলতো বিলিতি যাত্রা। এই থিয়েটারে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে পোর্শিয়ার ভূমিকায় এক ইংরেজ মহিলা নেমেছিলেন বলে জানা যায়। এই সম্প্রদায়েরই দুজন অভিনেতা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিলেন: কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি মাইকেলের নাট্যপ্রতিভার একজন অনুরাগী ছিলেন আর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে নট, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বাংলা থিয়েটারে নূতন যুগ দেখা দিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার ধারায় একটি নূতনত্ব দেখা দিল এবং এরই পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি বেলগাছিয়া থিয়েটারে। সমসাময়িক কালে কলকাতার বিভিন্ন স্থানেও (যথা: (১) পাথুরিয়াঘাটার নয়িকটে চড়কডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়ি; (২) জোড়াসাঁকোয় নামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি; (৩) সিমুলিয়ায় আশুতোষ দেবের বাড়ি প্রভৃতি)

অনুষ্ঠিত নাট্যপ্রয়াসের বিবরণ পাওয়া যায়। এইসময় থেকেই বাংলা দেশে থিয়েটার সমানভাবে চলে আসছে, কখনো বন্ধ হয়নি। আর এইসময় থেকেই বাঙালির থিয়েটারে আর কোনো ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয় নি, তবে ভাষান্তরিত হয়ে শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় হয়েছে। তখন কলকাতায় বহু স্থানেই বিদ্বদ্‌সভা স্থাপিত হয়েছে। এইসব বিদ্বদ্‌সভায় নাটকের কথা আলোচিত হোত, অভিনয়ের কথাও আলোচিত হোত। বাঙালির মনে সেই প্রথম নিজস্ব নাটকের কথা দেখা দিতে শুরু হয়েছে। এর ফলে, "১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এইসময় হইতেই বলা চলে।" এইটাকেই আমরা বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, এই চার মাসের মধ্যে আশুতোষ দেবের বাড়িতে 'শকুন্তলা', শোভারাম বসাকের বাড়িতে 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটক আর কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় দেশীয় সমাজে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার করলো। এই তিনখানি নাটকের রচয়িতা হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম যুগের প্রথম এবং প্রধান নাট্যকার। 'শকুন্তলা' অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে যিনি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপন করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রত্যেক স্থানেই বিপুল অর্থব্যয় হোত, আর বিপুল উৎসাহ (এবং দলাদলিও) দেখা যেত। এসব উদ্যম ছিল একান্তভাবেই ধনীদের উদ্যম—দর্শকও ছিল সমাজের উপরতলার লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জনসাধারণের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল বললেই হয়। "এই সকল নাটকাভিনয়ে কলিকাতার বাসী [illegible]মার বয়পুত্রগণ সকলেই দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন।" আর মাঝে মাঝে শহরের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতেন। মোট কথা, বড়লোকদের প্রচেষ্টা হলেও, এইসময় থেকেই বাঙালির মনে ধীরে ধীরে যথার্থ থিয়েটার-প্রীতি জেগে উঠতে থাকে আর

স্থূল-রুচির আমোদ-প্রমোদের দিন ক্রমেই বিরল হয়ে পড়তে থাকে। বলা বাহুল্য, নবজাগরণের প্রভাবেই এইটা সম্ভব হয়েছিল। 'শকুন্তলা' ও 'বেণীসংহার' ছিল সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ, আর 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' ছিল সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক। এর কিছু আগেই বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সমাজ-জীবনে তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল এবং সেদিন এই একটিমাত্র আন্দোলন পরোক্ষে বহু সামাজিক নাটকের জন্ম দিয়েছিল বলা চলে। কলকাতার বাইরেও চুঁচুড়া প্রভৃতি বহু স্থানে তখন 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। নাট্য-শালার প্রথম যুগের ইতিহাসে ইহা একখানি বহু অভিনীত নাটক। সমাজ-চেতনাকে নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপিত করে, সেদিন রামনারায়ণ একটা বড়ো রকমের কাজ করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বেণীসংহার'-এর পর আরো দুখানা নাটকের অভিনয় হয়েছিল—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' ও 'সাবিত্রী-সত্যবান', প্রথমখানি অনুবাদ এবং দ্বিতীয়খানি তাঁর নিজস্ব রচনা।

এইবার 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'-এর কথা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত 'বেলগাছিয়া ভিলা' পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ধনী, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কিনেছিলেন। আগেই বলেছি, আশুতোষ দেব এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ির অভিনয় দেখেই বাঙালির মনে থিয়েটার-প্রীতি তীব্রভাবে জেগে উঠতে থাকে। 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন পাইকপাড়ার রাজারা আর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এঁরা তিনজনেই নাট্যানুরাগী ছিলেন; যতীন্দ্রমোহন তো তখনকার কলকাতার সমাজে একজন রীতিমতো গুণী লোক বলে খ্যাত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনই তখন একটি স্থায়ী নাট্যশালার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করলেন। এই বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে "সে-যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালি তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" আয়োজন, উদ্যম এবং অর্থ রাজাদের ছিল সত্য, কিন্তু

সেই সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ পাল, প্রিয়নাথ দত্ত, গৌর বসাক, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত এবং গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ যদি না ঘটতো, তাহলে বেলগাছিয়া থিয়েটার এতখানি স্মরণীয় হয়ে থাকত না। বেলগাছিয়া থিয়েটারের এত নাম কেন? এর প্রধান কারণ ছিল তিনটি; যথা—(১) সুসজ্জিত, সুন্দর নাট্যশালা; (২) উচ্চাঙ্গের অভিনয় এবং (৩) বহু কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ। আর এই থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাট্যশালার দ্বিতীয় যুগের প্রথম নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি। সত্যকার একটা উন্নত নাট্যপরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এই সুরম্য রঙ্গালয়কে কেন্দ্র করেই সেদিন গড়ে উঠেছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া থিযেটারের উদ্বোধন হোল 'রত্নাবলী' নাটক দিয়ে। শ্রীহর্ষ-রচিত এই বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকখানির বাংলা অনুবাদ করেন রামনারায়ণ। ইংরেজ দর্শকদের বুঝবার সুবিধে হবে বলে নাটকের ইংরেজি অনুবাদও করান হয়েছিল মাইকেলকে দিয়ে। গান লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা গুরুদয়াল রায়, গানে সুর দিয়েছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ঐকতান বা অর্কেষ্ট্রার ভার ছিল যদুনাথ পালের ওপর (বাংলা থিয়েটারে ঐকতান বাদনের স্রষ্টিকর্তা ইনিই); আর অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন কেশব গাঙ্গুলির মত সুদক্ষ নট। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: প্রিয়নাথ দত্ত, কেশব গাঙ্গুলি, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, গৌরদাস বসাক, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনাথ সেন, যদুনাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দ্বারকানাথ মল্লিক, রনানাথ লাহা, কালিদাস সান্ন্যাল ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর দর্শক হিসাবে উদ্বোধন রজনীতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন: বাংলার ছোটলাট ফ্রেডরিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ নব্য বাংলার খ্যাতনামা সুধীজন। বাংলা

দেশে আর কখনো এমন সমারোহের সঙ্গে কোনো নাটকের অভিনয় হয় নি, এমন বিদ্বদ্‌জনের সমাবেশও এই প্রথম। বেলগাছিয়া থিয়েটারের এই অভিনয়-সাফল্যের মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় 'রত্নাবলী'র অভিনয়-সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন: "He was the life and soul of the performance"; আর গৌরদাস বসাক লিখেছিলেন: "Among the actors, Babu Keshub Chandra Ganguly stood pre-eminent.।" নাটকে কেশববাবু বিদূষক বসন্তকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই কেশব গাঙ্গুলীর অভিনয়-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েই মাইকেল তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বাজনা; ভারতীয় হিন্দু-সঙ্গীতকে বিশুদ্ধভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল। 'রত্নাবলী' নাটকের ছয়-সাতটি অভিনয় হয়। বেলগাছিয়া থিয়েটার বাঙালিকে নাটক দিয়েছে, নাট্যকার দিয়েছে—এই তার সবচেয়ে বড়ো গৌরব। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই লিখেছেন: "এই নাট্যালয় বঙ্গ-সাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল···রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদ মধুসূদনের প্রতিভাবিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্বক নূতন প্রণালীতে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করিলেন।" 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া থিয়েটারের দ্বিতীয় উপহার; ১৮৫৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে এর প্রথম অভিনয় হয়। এবারকার অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে 'রত্নাবলী'র অভিনেতৃগোষ্ঠী প্রায় সকলেই ছিলেন আর ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। যতীন্দ্রমোহন 'শর্মিষ্ঠা'র কয়েকখানি গানও লিখে দিয়েছিলেন। এ অভিনয় দেখার জন্যও বহু স্তুতবিদ্য দর্শকের সমাবেশ হয়। অতঃপর এই থিয়েটারে আর কোনো অভিনয় হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। স্বল্পকালস্থায়ী এই বেলগাছিয়া থিয়েটার বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে যে একটি landmark, তা বলাই বাহুল্য।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা সাতখানা বাংলা নাটক (যা বাঙালির নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল) পেলাম, যথা—শকুন্তলা, কুলীনকুলসর্বস্ব, বেণী-সংহার, বিক্রমোর্বশী, সাবিত্রী-সত্যবান, রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা। সমসাময়িক আর একটি অভিনয়-আয়োজনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেটি হোল সিঁদুরিয়াপটিতে গোপাললাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়। নাটকখানি লিখেছিলেন উমেশ-চন্দ্র মিত্র। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৩শে এপ্রিল, ১৮৫৯। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন: মহেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী সেন, হারাণচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, রাখালচন্দ্র সেন আর নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন। হিন্দু-কলেজে পড়বার সময়ে ইনি 'হ্যামলেট' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতিযোগী হিসাবে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়েও অনেক টাকা খরচ করা হয়েছিল; এক ইংরেজ শিল্পীকে দিয়ে দৃশ্যপটাদি অঙ্কিত করা হয়েছিল। প্রথম রজনীতে প্রায় পাঁচশত দর্শক উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রত্যেকেই মুক্তকণ্ঠে অভিনয়ের সর্বাঙ্গীন প্রশংসা করেছিলেন।

ক্রমেই কলকাতায় উচ্চশ্রেণীর সখের নাট্যশালা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এগুলি 'ব্যাঙের ছাতার মত' গজিয়ে উঠলেও এবং বেশি দিন স্থায়ী না হলেও, এর থেকে বোঝা গেল যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে এবং নাটক সম্বন্ধেও রুচির প্রসার হয়েছে। একে সুলক্ষণ বলে গণ্য করাই উচিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় একটি নতুন নাট্যসম্প্রদায় দেখা দিল,—'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। এই সম্প্রদায়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেবীকৃষ্ণ দেব, চন্দ্রকালী ঘোষ, ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এঁরা প্রথমে অভিনয় করেন মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানি। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম রজনীর অভিনয়ে অন্যতম দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে

মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম অভিনয় করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এঁদের অভিনয়ের যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, "রাজবাটীর এই অভিনয়ে বঙ্গের স্থায়ী নাট্যশালার ভাস্কর, নটকুল ধুরন্ধর, শ্রেষ্ঠ নাটককার, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।" তিনি তখন একুশ বৎসরের যুবক মাত্র। এই সময় থেকেই খাঁটি বাংলা নাটকের সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

সমসাময়িক কালে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান্ পরিবার হিসাবে ঠাকুর-পরিবারের খ্যাতি বড়ো কম ছিল না। এই ঠাকুর-পরিবারের দুইটি শাখাতেই (পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো) সখের থিয়েটারের উদ্যম এই সময়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং পাইকপাড়ার রাজাদের পর বাংলা নাট্যাভিনয়ের এঁরাই ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-গোষ্ঠীর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সঙ্গীতকলাবিদ্ অনুজ ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যপ্রয়াসের কথা বলব। দুই ভাই-ই ছিলেন নাট্যানুরাগী এবং এঁরা দুইজনেই আবার ছিলেন মাইকেলের প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী। এঁরা বাড়িতেই একটা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেছিলেন এবং সেইখানে রামনারায়ণের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ে ছোট রাজা স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ হোল ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর চার-পাঁচ বছর পরে যতীন্দ্রমোহন পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে 'বঙ্গ-নাট্যালয়' নামে একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর এখানে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় হয়। বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নামে একখানা হাস্যরসাত্মক প্রহসনেরও অভিনয় হয়। সোমপ্রকাশ ও সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় এই অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব সমালোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে, দৃশ্যপট ও গীতবাদ্য বেশ মনোরম হয়েছিল এবং দু-একজন ছাড়া সকল অভিনেতাই বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। "ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের

'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটক ১৮৬৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হইয়াছিল। 'মালতীমাধব' নাটক দশ-এগার বার অভিনীত হইয়াছিল।" পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগ পর্যন্ত সগৌরবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার মতে, "এই নাট্যশালাটি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হইলেও এই দুই স্বত্বাধিকারীর বদান্যতায় উহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান" হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর নাম ছিল 'জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ'। "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে তাঁহার মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে তাঁহার পুত্র গণেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ইহা স্থাপিত হয়।" বিদ্যাসাগর, মাইকেল, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণবিহারী সেন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যসমাজের অভিনয় শিক্ষক ছিলেন কেশব সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন। এই থিয়েটারেই প্রবল সচেতন প্রয়াস দেখা যায় নতুন নাটকের জন্য। জোড়াসাঁকো থিয়েটার আরম্ভ হয় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' দিয়ে। সখের থিয়েটার হলেও এঁরা লোকশিক্ষার দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং ভাল বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করেছিলেন। ভাল নাটকের জন্য এঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের পরামর্শে বহুবিবাহ সমস্যা সম্পর্কে রামনারায়ণকে দিয়ে একখানা নতুন নাটক লেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রামনারায়ণ রচনা করলেন 'নব নাটক'। সেই নাটক ছাপা হোল, সকলে পড়লেন; সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' কাগজে তার একটি সমালোচনা বেরুল এবং অবশেষে এক প্রকাশ্য সভায় নাট্যকারকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার (দুইশত টাকা) দেওয়া হোল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেই সময়ে একমাত্র রামনারায়ণই নাটক রচনা করে একাধিক পুরস্কার লাভ করেছিলেন একাধিক বিদ্বদ্‌সমাজ থেকে। এইভাবেই তো তাঁর সাহিত্যিক জীবনের

সূচনা। তারপর ছয় মাস রিহার্সাল দেবার পর নাটকখনি মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি। নাট্যকার স্বয়ং প্রথম অভিনয়, রজনীতে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: "অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল।" এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদেরর মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার মজুমদার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিনেতা অক্ষয়কুমার সেকালের একজন প্রসিদ্ধ নট ছিলেন। নাটকখানির পরপর নয়টি অভিনয় হয়। পরবর্তীকালে কলকাতায় পেশাদার থিয়েটারের সূচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নাট্যপ্রেরণাও লাভ করেছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই এই থিয়েটারের ওপর যবনিকাপাত হয় এবং এর বহুকাল পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির থিয়েটারের পুনরুজ্জীবন আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আমলে। কিন্তু সে-কাহিনী স্বতন্ত্র।

মোট কথা, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ধনী সম্প্রদায় নাট্যানুরাগকে শুধু জীইয়েই রাখেন নি, তাঁদের সচেতন প্রয়াস একে যেন এর স্বাভাবিক পরিণতির পথেই নিয়ে চলেছিল। তখন কলকাতায় ভবানীপুর, বৌবাজার, পটলডাঙা, আহিরীটোলা, গরাণহাটা, বটতলা, শিবপুর, বাগবাজার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সখের দলেও নানা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হয়েছিল। যদি দেশের লোকের চিত্তে পূর্বাপর একটা নাট্য-ঐতিহ্য না থাকতো, তা'হলে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজি ধরণের এই নাট্যকলার (এবং সেই সঙ্গে নাটকেরও) প্রসার লাভ ঘটতো কি না সন্দেহ। পারিবারিক থিয়েটারগুলি ছিল একান্তভাবে

ধনীদেরই প্রয়াস আর অন্যান্য ছোটখাটো অবৈতনিক দলগুলি সমসাময়িক নাট্যপ্রেরণা থেকেই গড়ে উঠেছিল। এই শেষের পর্যায়েই আমরা পাই বাগবাজারের অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু, তার আগে মফঃস্বলের নাট্যপ্রয়াসের কথা কিছু বলতে হয়।

শহর কলকাতা তখন বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের নাট্যানুরাগ মফঃস্বলেও ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন স্থানের ধনীরা এই ব্যাপারে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির নবজাগরণ তখন শতবর্ণচ্ছটায় বাঙালির মনের আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে। নতুন গদ্য, নতুন কাব্য, নতুন উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে, নাটক এসে গিয়েছে, নাট্যকারও এসে গিয়েছেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আমরা চারজন নাট্যকার পেয়েছি—রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসু। নাটক ও নাট্যশালার ক্রমোন্নতি সমান্তরাল ভাবেই চলেছে দেখা যায়। মফঃস্বলের ধনী জমিদারের বাড়ির নাটমণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিরল ছিল না—শহরের নাট্য-আন্দোলনের সমাচার যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মারফৎ সেখানে গিয়ে পৌঁছতে লাগল, তখন সেখানকার জনমানসেও নাট্যানুরাগ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। এই পনেরো বছরের মধ্যে বাঙালির মনে যে নাট্যানুরাগ দেখা দিয়েছিল, এর মূলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার দান বড়ো কম নয়। তখনকার বাঙালি-পরিচালিত প্রত্যেকটি ইংরেজি ও বাংলা কাগজে শহর ও মফংস্বলের নাট্যপ্রয়াসের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হোত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনার মান বেশ উচ্চশ্রেণীর ছিল। যাইহোক, এই পনেরো বৎসর কালের মধ্যে যশোহর, বরিশাল, মৈমনসিংহ, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি মফঃস্বল শহরে কম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয় নি—এমন কি, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও যেমন, জনাই গ্রামে, নাট্যপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অনেক জায়গায় স্কুলের ছাত্ররাও অভিনয়ের আয়োজন করেছিল বলে জানা যায়। তখন বাঙালির মনে সমাজচেতনা দেখা দিয়েছে, মফঃস্বলে বহু স্থানে ছোটখাটো সমাজ-উন্নয়ন সমিতিও গঠিত হয়েছে—এইসব সমিতির মধ্যে

অনেকগুলির নাট্যবিভাগ ছিল। হুগলীতে তো একটা নতুন রঙ্গমঞ্চই স্থাপিত হয়েছিল। সমাজ-সংস্কারের ভেতর দিয়ে এই যে বাঙালির নাট্যানুশীলন, এ কী শুধু ইংরেজি শিক্ষার ফলেই সম্ভব হোত, যদি না তার পূর্বাপর একটা নিজস্ব নাট্য-ঐতিহ্য থাকতো ?

বলেছি, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে বাগবাজার সখের থিয়েটারের গুরুত্ব অসাধারণ। এই থিয়েটার থেকেই বাঙালি পেয়েছে : (১) তার প্রথম নটগুরু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে ; (২) তার প্রথম দৃশ্য-পটশিল্পী ধর্মদাস সুরকে ; (৩) অর্ধেন্দু-অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রতিভাবান অভিনেতাদের, আর (৪) তার প্রথম জাতীয় নাট্যশালা-তথা-পেশাদার থিয়েটারকে। গিরিশচন্দ্রের জীবনেতিহাস পাঠকদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, তাঁর জন্ম হয় বাগবাজারের বোস পাড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর বয়স যখন তেইশ বছর, তখন তিনি তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় একটি অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ হোল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় একটা করে থিয়েটার গড়ে উঠেছে। বেলগাছিয়া থিয়েটারেরর নাম তখন লোকের মুখে মুখে ; পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি থিয়েটারে মধ্যবিত্তের প্রবেশ তখন সুলভ ছিল না। গিরিশচন্দ্রের মনে তখন থেকেই সংকল্প জেগেছিল সাধারণ মধ্যবিত্তদের জন্য একটা থিয়েটার তিনি খুলবেন। যাত্রাদল গঠনের পর তিনি তাঁর সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। তিনি যে যাত্রাদল গঠন করেছিলেন সেখানে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হয় ; এই নাটকের অভিনয়ে তিনি কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, তবে তিনি ও তাঁর আর এক বন্ধু, উমেশচন্দ্র চৌধুরী (উত্তরকালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ গীতকার হিসাবে প্রসিদ্ধ হন) যাত্রার উপযোগী কয়েকটি গান এই নাটকের জন্য রচনা করে দিয়েছিলেন। তারপর গিরিশ-চন্দ্র যাত্রা সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুদের নিয়ে বাগবাজার মুখুয্যেপাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে অভিনয়ের আয়োজন-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। বাংলা থিয়েটারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাট্যপ্রয়াস এই প্রথম। এই হোল বাগবাজারের

সখের থিয়েটারের সূচনা। তখন এর নাম ছিল 'দি বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। নাটকের মহলার সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে এই দলে যোগদান করেন। তিনিও বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি তখন একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা হিসাবে খ্যাতিও লাভ করেছেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শারদীয়া পূজার সপ্তমী রাত্রিতে বাগবাজারের হালদার-বাড়িতে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'নিমচাঁদে'র ভূমিকা গ্রহণ করে রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সেদিনের সেই ঘটনাটি স্মরণ করেই গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এক সভায় অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন :

মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নবনটগুরু তার।

গিরিশচন্দ্রের স্বীকৃতিতেই আছে যে, দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটকখানিই প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটারের স্রষ্টা। সে-রাত্রির অভিনয়ের ভূমিকালিপি এই রকম ছিল : নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ; কেনারাম—অর্দ্ধেন্দুশেখর ; অটল—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; জীবনচন্দ্র—ঈশানচন্দ্র নিয়োগী ; রামমানিক্য—রাধামাধব কর ; সৌদামিনী—মহেন্দ্রনাথ দাস ; কাঞ্চন—নন্দলাল ঘোষ ; কুমুদিনী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) ; নটী—নগেন্দ্র নাথ পাল।

এখানে একটা প্রশ্ন আছে—এত নাটক থাকতে 'সধবার একাদশী' নির্বাচিত হোল কেন? অন্য নাটক করতে গেলে দামী পোষাক-পরিচ্ছদ দরকার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সে-টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাই তো গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি নির্বাচিত করেছিলেন। নাটকখানির সাতবার অভিনয় হয়। চতুর্থ অভিনয় হয় শ্যামবাজারে রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি। সে-অভিনয় দেখবার জন্য কলকাতার তখনকার বিশিষ্ট সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা এতকাল শহরের ধনীদের পারিবারিক থিয়েটারের দর্শক ছিলেন, 'সধবার একাদশী'র দর্শকের শ্রেণী তার থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। কথিত আছে, অভিনয়

শেষে দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নাট্যকুশলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনীত হোত না ; নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্ম লেখা হয়েছিল।" আর দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র (বাঙালির চিরকালের প্রিয় এবং নাট্যানুরাগী 'ন্যাশনাল জজ')। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' লিখলেন : "নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম।···সে-রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।" দীনবন্ধু ও অন্যান্য সকলেই অর্ধেন্দুশেখরের 'জীবনচন্দ্রের' ভূমিকার অভিনয় দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'সধবার একাদশী' অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র নটরূপে সর্বত্র সর্ববাদীসম্মত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। সেদিন এই নবাগত প্রতিভাকে আশ্রয় করেই বাংলা থিয়েটারের দিক্-পরিবর্তন যেন আসন্ন ও অনিবার্য হোয়ে উঠেছিল। এই 'সধবার একাদশী'র দলই বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জনক। সেদিন বাগবাজারের জনকয়েক যুবকের মনে নাট্যাভিনয়ের যে ইচ্ছা জেগেছিল, তাই যে পরবর্তীকালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে তুলবে, এ কথা কেউ-ই কল্পনা করতে পারে নি। 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে বাগবাজার সম্প্রদায় দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনখানিও অভিনয় করেন। এই প্রহসনে রাজীব মুখুয্যের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যে অদ্যাবধি এই ভূমিকা অননুকরণীয় হয়ে আছে।

বাগবাজারের এই সখের থিয়েটারের ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরে রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাহায্যে নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা'র অনুষ্ঠান করেন। প্রথম মেলা বসেছিল আশুতোষ দেবের বেল-গাছিয়ার বাগানে। তার পাঁচ বছর আগে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু স্থাপন করেছেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'। তারপর জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ করলেন 'স্বাদেশিকের সভা'। এই দুইটি সভারই লক্ষ্য ছিল ধর্মে, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে স্বাদেশিকতার উৎসাহ দান। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'নীলদর্পণ' নাটক। নীল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত এই নাটক সেদিন দেশে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'নীলদর্পণ' কে

লিখল তা জানা গেল না, কিন্তু তা সমাজকে যেন কাঁপিয়ে তুললো। মাইকেল তার ইংরেজি অনুবাদ করে ইংরেজ সমাজকে আরো ক্ষেপিয়ে দিলেন। ১৮৬১-তে প্রকাশিত হয়েছে মাইকেলের যুগান্তকারী মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। ১৮৬৫-তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর একটি যুগান্তরের বার্তা বহন করে নিয়ে এলো। মোট কথা, উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে নানা ঘটনাস্রোতের তীব্রতা বাঙালির চিত্ততটে এসে প্রবলভাবেই আঘাত করে তার প্রাণে জাগিয়ে তোলে তীব্র জাতীয়তাবোধ। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যেই রেনেসাঁ-সের আলোকবর্তিকাগুলি—ভাষা, ভাব, সাহিত্য—কলকাতা থেকে উদ্ভূত হয়ে বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনে যেন বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব বহুমুখী ঘটনাস্রোতের ভেতর দিয়ে বাঙালির চিত্তে দেখা দিল দেশানুরাগ। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের অরুণরাগে বাঙালির মনের আকাশ তখন রাঙিয়ে উঠেছে। এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই বাগবাজার সখের থিয়েটারের জন্ম। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। 'সধবার একাদশী' নাটকখানি নির্বাচন করেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এই নাট্যসম্প্রদায় গতানুগতিকতার পথ ধরে চলবে না, বাঙালির নাট্য-চেতনায় বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নবীনেরই বার্তাবহ হোতে চায়। এবং শেষ পর্যন্ত তাই হয়েও ছিল। অভিনয়ের প্রচলিত ধারারও এই সময় থেকে একটা বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়। এইবার সেই কথা বলব।

বাগবাজার থিয়েটারের দ্বিতীয় নাট্য-প্রচেষ্টা—দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীর অভিনয়কালই বাংলা নাট্যাভিনয়ের তৃতীয় যুগ এবং তিনিই বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় নাট্যকার। 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয়ে যাবার পর একদিন বাগবাজার নাট্যসম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ হয়ে অর্ধেন্দু, ধর্মদাস, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গেলেন দীনবন্ধুর কাছে। তাঁরা গিয়ে বললেন, 'আমরা আপনার 'লীলাবতী' অভিনয় করব।

—তোমরা পারবে না। এ অতি কঠিন নাটক।

—কেন? 'সধবার একাদশী' করলাম, আপনি খুশি হলেন।

—কিন্তু 'লীলাবতী' তোমরা পারবে না। বঙ্কিম আর অক্ষয় দুজনে মিলে চুঁচুড়ার এক দলকে নিয়ে এর যা অভিনয় করেছে, এই দেখ, অমৃত-বাজারে শিশির কি লিখেছে।*

এলেন তাঁরা গিরিশচন্দ্রের কাছে। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ঘটনা উল্লেখ করে অর্ধেন্দু বললেন, চুঁচড়োর দলের কাছে হেরে যাব, তুমি বসে দেখবে?

অর্ধেন্দু তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনাটি দেখালেন গিরিশ-চন্দ্রকে। তিনি সেটা মন দিয়ে পড়লেন। দেখলেন চুঁচুড়ায় 'লীলাবতীর' যে অভিনয় হয়েছে, তাতে নাটকের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। গিরিশচন্দ্র বললেন, আমরা নাটকের কিছু বাদ দেব না, চুঁচুড়ার দলকে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করব। নাটকের রিহার্সাল শুরু করে দাও। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে রিহার্সাল শুরু হোল। কিন্তু কোথায় অভিনয় হবে? এমন স্থানে হওয়া দরকার যেখানে বহু লোক এসে দেখতে পারে। এবং ঠিক হোল যে, এবার বাঁধা ষ্টেজে অভিনয় হবে। এই লীলাবতী অভিনয়ের সময়ই প্রথম স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হোল। শ্যামবাজারের বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রনাথ পালের বিরাট বাড়ি; বাড়ির সামনে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন। সেইখানেই ষ্টেজ বাঁধা হোল। এই ষ্টেজ তৈরি করলেন ধর্মদাস সুর, দৃশ্যপটাদিও তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হোল। দলের তিনিই ছিলেন ষ্টেজ ম্যানেজার আর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার তিনিই প্রথম মঞ্চশিল্পী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় হোল। অনেক দিন মহলা দেবার পর নাটকখানি মঞ্চস্থ হয় এবং নাট্যশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু ও রাধামাধব কর। তাই অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে দলের সকলেই সুনিশ্চিত ছিলেন। কার্যক্ষেত্রে হোলও তাই। উদ্বোধন রজনীতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং

* বঙ্কিম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; অক্ষয়—'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার; শিশির—শিশিরকুমার ঘোষ।

দীনবন্ধু মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'ললিত'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সহ-অভিনেতারূপে এই নাটকে একত্রে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই গিরিশ-যুগের থিয়েটারে খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকে অর্ধেন্দুশেখর 'হরবিলাস'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'লীলাবতী'র একটি দৃশ্যে নদেরচাঁদ যখন কাপড় গলায় দিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হোত, তা দেখে দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নাট্যশিক্ষার প্রশংসা করেছিলেন। আর গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ও আবৃত্তি শুনে তিনি বলেছিলেন, "আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না।" কথিত আছে, অভিনয় শেষে ব্যস্ততার সঙ্গে ষ্টেজের মধ্যে এসে দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে বলেন—"এবার চিঠি লিখব—দুয়ো বঙ্কিম।" তৎকালীন অন্যতম মনীষী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় রজনীর অন্যতম দর্শক ছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনিই সেদিন নবযুগের নটপ্রধান বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। অভিনয়ের প্রশংসা যেমন হয়েছিল, ধর্মদাসের দৃশ্যপটেরও তেমনি প্রশংসা হয়েছিল। 'এডুকেশন গেজেট' (২৪ শে মে, ১৮৭২) 'লীলাবতী'র নাট্য সমালোচনার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর। আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দৃশ্য ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ, সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয় ও অনাথবন্ধুর মন্দির, এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল।" প্রতি সপ্তাহে শনিবারে অভিনয় হোত। সম্প্রদায় দর্শক-গণের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহ্বান করতেন এবং সাধারণ দর্শকগণকে উপযুক্ত-অনুপযুক্ত বিবেচনা করে ফ্রি পাশ দিতেন। নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গানও লিখে দিয়েছিলেন। নাটকের সঙ্গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং এই ক্ষেত্রে তিনি আজো অপরাজেয়।

'লীলাবতী' অভিনয় করেই বাগবাজার দলের নাম দশগুণ হোল। জনকয়েক মধ্যবিত্ত বাঙালি সন্তানদের এই সাফল্যমণ্ডিত নাট্যপ্রয়াস থেকেই জাতীয় নাট্যশালার প্রকৃত সূচনা। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

"শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটির প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত এবং সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গন, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট-প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এই অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক, প্রস্তাব হইল; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি।" অতঃপর আমরা এই ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

ন্যাশনাল থিয়েটার একান্তভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রয়াস। এই প্রয়াসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন বাংলা থিয়েটারের অদ্বিতীয় মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুর। সাধারণ রঙ্গালয়ের আদিপর্বের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্বে রোগ-শয্যায় শুয়ে তিনি সেই ইতিহাস যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল।

ধর্মদাস সুর লিখেছেন: "১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের পাড়ার (বাগবাজার) ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মিলিত হইয়া 'সধবার একাদশী'র আখড়া বসান। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ও তাহাতে যোগদান করেন, আমিও উৎসাহের সহিত উহাতে মিলিত হই। পরে সম্প্রদায়ের কয়েকটি অভিনয় হইলে পর অমরা যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করি ও অন্য নাটকের আখড়া বসাইবার কল্পনা হয়। কিন্তু ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া নানা পরামর্শের পর 'লীলাবতী'র আখড়া বসিল এবং উহা চালাইবার নানা বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এই সময় গিরিশবাবুর শ্যালক ৺ব্রজনাথ দেব (যিনি Atkinson-এর বুক-কিপার ছিলেন) ব্যাপারিদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটি ষ্টেজ শ্যামপুকুরে তাঁহারই বাড়ির নিকট আরম্ভ করেন। এই নির্মাণকার্যের সমস্তই আমার উপর ভার ছিল, কিন্তু অকালে আমার সুহৃদ ব্রজবাবুর কাল হওয়ায় উক্ত কার্য বন্ধ হইয়া গেল ও ঐ প্লাটফরম ইত্যাদি পড়িয়া মাটি হইতে লাগিল। তখন

গিরিশবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি ঐ কাঠকুটো সব আমি তোমাদের দেওয়াতে পারি, তোমরা stage ভাল করিয়া করিতে পারিবে কি? আমরা সকলে বলিলাম, অবশ্য পারিব। তখন তিনি তাঁহার অপর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে বলিয়া ঐ সমস্ত কাঠ আমাদের দেওইয়াছিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া শ্যামপুকুর হইতে কেহ মাথায়, কেহ কেহ কাঁধে করিয়া ঐ সমস্ত কাঠ আমার বাগবাজার বাটীতে লইয়া আসিলাম। কিন্তু আমার এক ভাবনা হইল—কোথা হইতে খরচ সরবরাহ হয়। তখন দুর্গাদাস মহাশয়ের বাটীতে আমাদের বসিবার একটি আড্ডা ছিল। আমাদের আর কোন কাজ নাই—সকলেরই ঐ চিন্তা। পরামর্শ করা হইল, একটি Prospectus ছাপান হউক। যেমন প্রস্তাব, তেমনি কাজ। প্রসপেক্টাস ছাপান হইল, চাঁদার বহি বাঁধান হইল। প্রথম আমি ২০৲ টাকা, তৎপর নগেন ২০৲ টাকা সই করিল। পরে প্রসপেক্টাস ও বই লইয়া সকলে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত কলিকাতা ঘুরিয়া একমাসকালের মধ্যে কোন বড়লোকের সই করাইতে পারিলাম না। ঐ প্রসপেক্টাসে আমার ও নগেন ও আর একজনের সই ছিল। এই সকল কার্য আমরা কখন কখন গিরিশবাবুকে জানাইতাম মাত্র। কারণ এ সময়ে প্রত্যহ আমরা একত্রিত হইতাম না। যে যে-রকমে পারে অর্থের জোগাড়ে চাঁদা সই করাইতে লাগিল। এইরকমে আমাদের ভিতর আমার ও নগেনের টাকা লইয়া আশী টাকা জোগাড় হইল। তাহাতে কয়েকখানি সিনের উপযোগী কাপড় ও রং কেনা হইল। গোবর্ধন নামে একজন চিত্রকরকে একখানি বাটীর সম্মুখ আঁকিতে দেওয়া গেল। সেই সিনখানি আঁকিতেই আমাদের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কাজেই আঁকার কাজ বন্ধ হইয়া গেল: তখন আমি অন্য উপায় না দেখিয়া নিজেই আঁকিব স্থির করিলাম ও একখানি চেম্বার আঁকিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বেনারস হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে যদি থাকেন, আমাদের সহিত অভিনয় করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তিনি রিহার্সালে যাইতেন ও আমার বাটীতে আসিয়া সিন আঁকা দেখিতেন। যখন আমার চেম্বারখানি আঁকা শেষ হইল,

আমি প্রথম উঁহাকে দেখাইলাম, তাহাতে উনি বলিলেন—আর আমাদের পায় কে? আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত সিন আঁকিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে এক ইংরেজ এই কাজে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল। সে জাহাজে রঙের কাজ করিত। সে আমার সমস্ত রং ফলাইয়া দিত।

"এইরকমে দুই মাসের মধ্যে 'লীলাবতীর' উপযোগী সমস্ত Stage আমি শেষ করিলাম। ষ্টেজ-সংক্রান্ত কার্য বা টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার উপর সকলের ভার ও বিশ্বাস ছিল। আমি খরচপত্র ও টাকার সমস্ত হিসাব রাখিতাম। পরে থিয়েটার খুলিবার জন্য শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রচন্দ্র পালের বাটীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের এত আগ্রহ হইল যে, আমরা বলিলাম ও বিজ্ঞাপন দিলাম—ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট না দেখাইলে আমরা টিকিট দিব না। তাহাতেও আমরা স্থান দিতে পারিতাম না। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া আমরা স্থির করিলাম, টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিব। পরে 'নীলদর্পণের' রিহার্সাল আরম্ভ হইল। আমার স্বজাতি ও প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার গঙ্গার উপরিস্থিত বৈঠকখানা আমাদের রিহার্সাল ও অফিস করিতে দিলেন এবং আমাদের সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের 'নীলদর্পণ' অভিনয় উপযোগী সিনগুলি সব প্রস্তুত হইয়া আসিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর ৩৬৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটী (যে বাটী এখন মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা বাটী বলিয়া খ্যাত) জোগাড় করা হইল। আমি ষ্টেজ প্রস্তুত করিলাম। আমরা সকলেই উৎসাহিত; কেবল গিরিশবাবুর অমত। কিন্তু আমাদের সকলেই একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কেহই গিরিশবাবুর আপত্তি ও অমত গ্রাহ্য করিল না, বরং সকলই একমত হইয়া স্থির করিল,—ওঁর অমত হয়, আমরা উঁহাকে চাহি না। তখন আমরা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্রকে প্রেসিডেন্ট করিলাম।

"১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর (বাংলা ১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ,

শনিবার) তারিখে প্রথম অভিনয় হইল। টিকিটের ঊর্ধ্বতম মূল্য ছিল তিন টাকা। সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে অতি সুন্দর অভিনয় হইল। সকলেই একবাক্যে বলিল যে, এরূপ অভিনয় কখন হয় নাই ও আর কাহারাও যে করিতে পারিবে, তাহা আশা করি না। এইরূপে সুখ্যাতির সহিত আমরা উৎসাহে অভিনয় করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের অভিনয়ের সুখ্যাতি দেখিয়া গিরিশবাবু আমাদের সহিত যোগদান করিলেন ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে 'ভীমসিংহের' অংশ অভিনয় করিলেন। তিনি তখনো অফিসে চাকরি করিতেন, তাই অবৈতনিক ভাবে থিয়েটারে যোগ দিয়াছিলেন। (গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইত: 'ভীমসিংহ—By a distinguished amateur')। এইসময়ে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ মহোদয় আমাদের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও patron ছিলেন, এমন কি তিনি স্বয়ং নিজ পরিচ্ছদে গিরিশবাবুকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে কলিকাতার ধনী, সম্ভ্রান্ত, গৃহস্থ ও গরীব সকলেই যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে থিয়েটার চলিল—আশার অতিরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে লাগিল। তৎপরে তিনজন director নিযুক্ত হইল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ। Director নিযুক্ত হওয়া সত্বেও আর বেশী দিন থিয়েটার রহিল না, ৭ই মার্চ তারিখে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত তিনজন মিলিত হইয়া ও আমাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া, চারিজন Proprietor বলিয়া declaration দিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বলিলাম—সকলে খাটিয়াছি—অন্য সকলকে আমাদের অধীন করিব—তাহা কখনো হইবে না। থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল।

"নগেন, অর্দ্ধেন্দু, ও অমৃত একদিকে আর আমি অপর দিকে। অবশিষ্ট যত লোক সব আমার পক্ষ অবলম্বন করিল। নগেনের বাটীতে পোষাক থাকিত, সে সমস্ত তাহারই অধিকারে রহিল; ষ্টেজ আমার অধীনে ছিল—আমারই কাছে রহিল, অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল। আমাদের

দলের নাম রহিল ন্যাশনাল থিয়েটার। আমি গিরিশবাবুকে কর্তৃত্ব দিয়া টাউন হল ভাড়া লইয়া দেশীয় হাসপাতালের জন্য সাহায্য-রজনী অভিনয় করিলাম। অপর পক্ষ অপরাপর লোক সংগ্রহ করিয়া হিন্দু ন্যাশনাল নাম দিয়া অপেরা হাউসে অভিনয় আরম্ভ করিল। পরে দুই দলই উঠিয়া যায়। তাহার কিছুদিন বাদে ছাতুবাবুর মাঠে এক খোলার ঘর বাঁধিয়া বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হয়। তাহার পর আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাঠের ঘর নির্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় Great National Theatre ; আবার প্রায় সমস্ত লোক একত্রিত হইল। গিরিশবাবু প্রথমে দলভুক্ত ছিলেন না। ১৮৭৫ সালে আমি গ্রেট ন্যাশনাল কোম্পানী লইয়া দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করাইয়া যথেষ্ট টাকা রোজকার করি, সে সময়ে আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। গিরিশবাবু বা নগেনের ছিল না। অর্ধেন্দু তখন Master, আমি Manager। গ্রেট ন্যাশনাল এইরূপে কতক দিন আমার, কতক দিন নগেনের ও কতক দিন গিরিশবাবুর কর্তৃত্বাধীনে চলিল ; কিন্তু গিরিশবাবু তখনো পর্যন্ত তাঁহার নাম কোন রকমে ছাপাইতে দিতেন না।

"পরে ভাল বই অভাবে থিয়েটারের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিল। তখন আমি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু দুইজনে পরামর্শ করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাসকে Directer নিয়োগ করি এবং অমৃতবাবু তাঁহার সহকারী হন। এই উপেন্দ্রবাবুর 'শরৎ-সরোজিনী' দুইশত টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া ও অভিনয় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করি। এসময়েও ভুবনমোহন নিয়োগী Proprietor। এই সময়েই Dramatic Bill পাশ হয়। তারপর ভুবনবাবুর থিয়েটার যখন প্রতাপ জহুরী কিনিয়া লন, তখন সেই থিয়েটারের নাট্যকার হইলেন গিরিশবাবু আর আমিই প্রতাপচাঁদের ম্যানেজার ছিলাম। 'রাবণবধ' গিরিশবাবুর প্রথম নাটক। তাহার পর ষ্টার থিয়েটারের সৃষ্টি। গিরিশবাবু প্রতাপ জহুরীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিয়া ষ্টারের ম্যানেজার হইলেন। 'Manager' নাম থিয়েটারে এই

প্রথম ছাপান হইল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

"তাহার পর ধনকুবের গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, ১৮৮৮ সালে তিনি বিডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটার বাটী ত্রিশ হাজার টাকায় কিনিয়া লন ও অনেক ব্যয় করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার সৃষ্টি করেন। আমি তখন ষ্টার থিয়েটারের জন্য হাতীবাগানে নূতন বাটী তৈয়ার করিতে নিযুক্ত হইলাম ও চারি মাসের মধ্যে উক্ত বাটী নির্মাণ করিয়া তুলি। তাহার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জায়গায় গিরিশবাবুর কর্তৃত্বাধীনে মিনার্ভা থিয়েটারের বাটী নির্মাণ করিলেন ক্লাসিক ও কোহিনুর থিয়েটার ইহার পরের কথা।"

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য এক রকম: " 'নীলদর্পণের' অভিনয়ে আমার না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাশনাল থিয়েটারের সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙালির নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশনাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাশনাল থিয়েটারের নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই-এক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু যখন 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়।"

এই দুটি বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কলকাতার নাট্যামোদী জনসাধারণ তখন শহরে একটি স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য ব্যাকুল

হয়েছে। ১৮৫৩ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বেশির ভাগ প্রয়াসই ধনীদের ছিল এবং হয়-তাঁদের বাসভবনে, না হয় বাগানবাড়িতে অভিনয় হোত। এইসব সখের অভিনয় দেশের নাট্যাভিনয়কে উন্নতি ও প্রসারের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই, "কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালি জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। ইহা ছাড়া আর একটি অসুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলা দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই।" মোট কথা, বাঙালির পক্ষে একটি স্থায়ী সাধারণ নাট্যশালার প্রয়োজন তখন নানা কারণেই আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই প্রয়োজন মেটালেন বাগবজারের কয়েকটি দুঃসাহসী যুবক। বাগবাজারের দলই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়া কলকাতায় প্রথম পেশাদারী থিয়েটারের পত্তন করেন। এই 'ন্যাশনাল' নামটি দিয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র। যে যুগে এই নাট্যশালার উদ্ভব তখন এই নামকরণ ভিন্ন অন্য নামকরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র ও শিশিরকুমার ঘোষ—এঁরা সকলেই যুবকদের এই প্রয়াসকে সেদিন খুব উৎসাহিত করেছিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল *The Calcutta National Theatrical Society*—সুতরাং নামের প্যাটার্নটি ইংরেজি ধরণেরই ছিল বলতে হবে। সমগ্র গিরিশযুগে কলকাতায় যত পাবলিক থিয়েটার হয়েছে, প্রত্যেকটির নামই ছিল বিলাতি ধরণের, যেমন এমারেল্ড, কোহিনূর, ষ্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি। শিশিরকুমারের আগে খাঁটি দেশীয় ভাবে নাট্যশালার নামকরণের কথা কেউ চিন্তা করেন নি—এ-কথাটা যেন আমরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখি। যাই হোক, নবগঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রেসিডেণ্ট, সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হলেন যথাক্রমে বেণীমাধব মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধর্মদাস সুর। গিরিশচন্দ্র বাদে দলের মধ্যে সবাই রইলেন (অর্ধেন্দু, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, হিঙ্গুল খাঁ, যদুনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় অমৃতলাল বসু, ও ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)। চল্লিশ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের বাড়ির বাইরের উঠানটি

ভাড়া নেওয়া হয়। বিনা-আড়ম্বরে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে থাকে, আর ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে চলে নাটকের মহলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতার এই প্রথম পাবলিক থিয়েটারে টিকিটের দাম ছিল এইরকম: প্রথম শ্রেণী—১৲ টাকা, আর দ্বিতীয় শ্রেণী—॥৹ আনা।

১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় তারিখ। উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই বৎসরটি আরো একটি কারণে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এই বৎসরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। বাংলার সমাজজীবনেও এই বৎসরটি স্মরণীয় হয়ে আছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় এই বৎসরের মার্চ মাসে নূতন বিবাহ বিধি (Act III of 1872) পাশ হয়। নূতন বিবাহ আইন, 'বঙ্গদর্শন' এবং সাধারণ নাট্যশালা—বাঙালির জীবনে এক বৎসরের মধ্যে এই তিনটি ঘটনা মনে রাখবার মতন। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে ষ্টেজ নতুন করে বাঁধতে হয়েছিল; 'লীলাবতী'র সময়ে যে ষ্টেজ তৈরি হয় তা বর্ষার জলে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলা দেশে অবৈতনিক থিয়েটার বা সখের থিয়েটারের যুগ শেষ হয়ে বৈতনিক বা কমার্শিয়াল থিয়েটারের যুগ শুরু হোল এইবার। পরবর্তীকালে এই সখের থিয়েটার বিভিন্ন ক্লাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস 'নীলদর্পণ'। এর অভিনয় খুব সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল। এ অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। 'নীলদর্পণ' নাটকে অর্দ্ধেন্দু-শেখর চারটি ভূমিকা গ্রহণ করে (উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলক বসু ও জনৈক রায়ৎ) তাঁর অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই রকম মন্তব্য করা হয়: "নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু এ-কথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের

'নবযৌবন' হইয়াছে।…অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছিল। (মতিলাল সুর তোরাপের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; অমৃতলাল বসুর কথায় "মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না")। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয়-ক্রিয়াও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।" আর নবগোপাল মিত্র মধ্যবিত্ত যুবকদের এই উদ্যমকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন: "The event is of national importance"। অভিনয় বা বিধিব্যবস্থা যে নির্দোষ বা ত্রুটিশূন্য হয়েছিল, এমন কথা কেউ বলেন নি। অভিনয়ের পূর্বে ন্যাশনালের মুখপাত্র-স্বরূপ অর্ধেন্দুশেখর পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের জাতীয় নাট্যশালার উদ্দেশ্য ও মর্ম দর্শকদের কাছে নিবেদন করেন। অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল রাত্রি আটটায় আর শেষ হয়েছিল প্রায় রাত দুটোয়। 'এডুকেশন গেজেট'-এর মতে অধিকাংশ দৃশ্যপট ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত হয় নি, wings-এর অভাবে মূল দৃশ্যের সৌন্দর্যের হ্রাস হয়েছিল আবার কোনো কোনো দৃশ্য-পটের সঙ্গে অভিনয়ের সঙ্গতি ছিল না। সবচেয়ে শ্রুতিকটু হয়েছিল কনসার্ট বা একতান বাদ্য। "ইহা কতকগুলি চুনোগলির ফিরিঙ্গী দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কেহই কিছুমাত্র আনন্দানুভব করে নাই।" আলোর ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ ছিল; যবনিকা বা ড্রপসিনের ছবিটি বিজাতীয় ছিল। "জাতীয় নাট্যশালায় বিজাতীয় কোন বস্তু দেখিলেই মনে দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি উপস্থিত হইতে পারে?" প্রথম অভিনয়-রজনীর টিকিট বিক্রির মোট পরিমাণ ছিল চার শো টাকা; দর্শনীর হারের তুলনায় বিক্রী আশাপ্রদই ছিল বলতে হবে। দ্বিতীয় অভিনয় থেকে বিলিতি কনসার্টের বদলে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দিয়ে দেশী বাজনার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

প্রথম প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটারে সপ্তাহে একদিন মাত্র (শনিবার) অভিনয় হোত; পরে 'লীলাবতী' অভিনয় হবার পর থেকে (১৮৭৩, জানুয়ারি) বুধবারেও অভিনয় করবার আয়োজন হয়। এই সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারে বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাবার রেওয়াজ হয়। শনিবার হোত সিরিয়াস বই আর বুধবার হোত প্রহসন ও প্যাণ্টোমাইম। বিলিতি

থিয়েটারের অনুকরণে বাংলা থিয়েটারে প্যান্টোমাইম এই প্রথম দেখান হোল। মুস্তফী সাহেব একজন দক্ষ প্যান্টোমাইম অভিনেতাও ছিলেন। ন্যাশনালের মঞ্চে মুস্তফী সাহেবের তামাশা এবং তাঁর কণ্ঠে ইংরেজি-বাংলায় মেশানো সেই বিখ্যাত গান, 'হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে, None can be compared হামরা সাট'' ইত্যাদি সেদিনের দর্শকদের কাছে পরম উপভোগ্য ছিল। থিয়েটারকে জনপ্রিয় করবার জন্য ন্যাশনালের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ন্যাশনালে দীনবন্ধুর এই নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনীত হয়, যথা—'নীলদর্পণ', 'জামাইবারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো,' ও 'লীলাবতী'। দীনবন্ধুর নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা, তাই গিরিশচন্দ্র তাঁকে জাতীয় নাট্যশালার জনকের সম্মান দিয়েছিলেন। এঁরা রামনারায়ণের 'নবনাটক'-এর অভিনয়ও করেছিলেন, এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' নক্সাখানিরও অভিনয় করেন। তিনি তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম পরিচালকও বটেন, অপর দুজন পরিচালকের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। থিয়েটারের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের সম্পর্কের সূচনা এইখান থেকেই। এই নক্সায় 'চাণ্ডালের' ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ন্যাশনালে অভিনীত আর একখানি নাটকের উল্লেখ করতে হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারতমাতা'। বাংলা থিয়েটারে দেশভক্তিমূলক নাটক এই প্রথম। অমৃতবাজার পত্রিকা এই নাটকখানির অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন। এইসব নাটক অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির করলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনালে যোগদান করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তিনি ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ধর্মদাস সুরের বিবরণী থেকেই আমরা তা জানতে পারি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি 'কৃষ্ণকুমারী' ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হোল—মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মাইকেল এ সংবাদ পেলেন। গিরিশচন্দ্রের সুদীর্ঘ নটজীবনে ভীমসিংহের ভূমিকা একটি সুপ্রসিদ্ধ অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব অভিনয়রীতির সূচনা এইখান থেকেই এবং বাংলা থিয়েটারেও সমগ্রভাবে অভিনয়রীতির একটা

দিক্‌-পরিবর্তন 'কৃষ্ণকুমারী'র এই অভিনয় থেকেই সূচিত হয়। ৮ই মার্চ, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের ওপর যবনিকা পড়ল।

এইবার আমরা এই যুগের নাটক ও নাট্যকারের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব। বাংলা সাহিত্যের যেমন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, বাংলা নাটকের তেমন কিছু নেই। উনিশ শতকের আগে বাংলা নাটক ছিল না বললেই চলে। বাংলা দেশে নাট্যশালার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আবির্ভাব। পুরাতন যাত্রার সঙ্গে বাংলা নাটকের কোনো নাড়ীর যোগ নেই। যাত্রা থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্যশালার যেমন সূচনা, বাংলা নাটকরচনার সূত্রপাতও এই সময় থেকে। এতদিন কলকাতায় যেসব নাটকের অভিনয় হয়েছিল, সেগুলো প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অথবা ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কার আলোচনা আরম্ভ হওয়াতে তখন থেকে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে রামনারায়ণ তর্করত্নই অবিসম্বাদী নাট্যকার। যতদূর জানা যায়, তাঁর 'কুলীন-কুলসবস্ব' এইরকম সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম। তবে এ-কথা ঠিক যে, বাংলা নাটকের গঠনে সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাটকের প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক ও ইংরেজি নাটকের অভিনয়রীতি, এই দুটি মিলিয়েই বাংলা নাটকরচনার সূত্রপাত। অবশ্য নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা মেটাবার আকাঙ্ক্ষাও বাংলা নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টির অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলার প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। বাংলা নাটক তথা বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগের প্রধান নাট্যকার তিনিই। সংস্কৃত কাব্য এবং অলঙ্কারে সুপণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামনারায়ণ বাংলা ভাষার শুধু প্রথম নাট্যকারই নন, বাংলার সমাজ-জীবনকে সচেতনভাবে নাটকে নিয়ে আসেন তিনিই। বলতে গেলে, তিনিই বাংলা নাটকের—বিশেষ করে প্রহসনে—একটা বিশিষ্ট পথ নির্দেশ করে

দিয়েছিলেন। নাট্যসাহিত্যের বিচারে রামনারায়ণের নাটকগুলো হয়ত ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু পথিকৃৎ-এর গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। সম-সাময়িক সমাজজীবন থেকেই তিনি নাটক রচনা করবার প্রেরণা ও উপাদান দুই-ই পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বাংলা থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক। অনেকের মতে এটি প্রহসন। কিন্তু আসলে কুলীন-কুলসর্বস্ব একটি শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা মাত্র; farce বা প্রহসনের চরিত্র এতে কোথাও ফুটে ওঠে নি। মাইকেলের আগে বাংলা ভাষায় অভিনয়োপযোগী farce কেউ রচনা করতে পারেন নি। ডাঃ সুকুমার সেন এই নাটকখানি সম্পর্কে বলেন: "প্লট বলিতে বিশেষ কিছুই নাই; কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য-পরম্পরা মাত্র। তবে আখ্যানবস্তুর অভিনবতা আর সরস ও লঘু রচনাভঙ্গী দৃশ্যগুলিকে মনোরম করিয়াছে। শিক্ষিত সমাজের নব-জাগরিত সংস্কার স্পৃহা স্পষ্টভাবে ইহাতে প্রতিফলিত বলিয়া 'কুলীন-কুলসর্বস্বে'র সমাদর যথেষ্ট হইয়াছিল।" নাটকখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর গঠনে সংস্কৃতরীতিই অনুসৃত হয়েছে এবং সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব এতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। নাটকে সরস কবিতার বাহুল্য বিরক্তিকর; স্থানে স্থানে সরল ভাষা, আবার কোনো কোনো স্থানে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষাও আছে। তবে এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক, কোনো রকম সংস্কৃতের অনুবাদ নয়; ইংরেজি কোনো বিষয়ের ছায়াও এতে নেই। এমন কি দেশীয় পুরাণ বা ইতিহাস থেকেও এর মূল সংগৃহীত হয় নি। দেশের একটি সামাজিক কুপ্রথা (কৌলীন্য প্রথা) এবং তার ফলে সমাজের কি অবস্থা হয়েছে, তাই-ই এই নাটকে সম্যক প্রতিফলিত। আর একটি কথা। এই মৌলিক নাটকখানি বাংলা সাহিত্যে বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকের সূচনা করে দিয়েছে। তা ছাড়া, নতুন বাংলা ভাষারও প্রথম উদ্যমের একটি নিদর্শন হিসাবে নাটকখানির একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই নাটক রচনা করে রামনারায়ণ একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে সময়কার প্রথম ও প্রধান নাট্যকার বলে তর্করত্নকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলা হোত। হিন্দু-সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ-প্রথার দোষ দেখিয়ে তিনি 'নব-নাটক' নামে

আর একখানি নাটক রচনা করেন এবং এর নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন বিদ্যাসাগর। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' ও 'নব-নাটক'-এর মধ্যে বার বছরের ব্যবধান। তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধু এসে গিয়েছেন। 'নব-নাটক' কিছুটা বিয়োগান্ত এবং এ নাটকখানিরও বেশ সমাদর হয়। রামনারায়ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মোট তের-চৌদ্দখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে চারখানি—'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী,' 'শকুন্তলা' ও মালতী-মাধব'—সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ। মোট কথা, রামনারায়ণের সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, বেদনার্ত জীবনধর্মের সহৃদয় নাট্যকার তিনি এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক বিষয়ের সংস্কার সাধন করতে তিনিই ছিলেন সেদিন বাংলার লেখকদের মধ্যে অগ্রবর্তী।

রামনারায়ণের প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আছে। কলকাতায় বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কুলীন-কুলসর্বস্বের প্রথম অভিনয় হয় তার দু'বছর আগে তর্করত্নের বাসভূমি হরিনাভি গ্রামে। কথিত আছে, বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আর প্রতিবেশিদের কাছথেকে তক্তপোষ চেয়ে নিয়ে ষ্টেজ তিনিই তৈরি করেছিলেন। গ্রামের লোক যাত্রার আসর দেখতে অভ্যস্ত, এ রকম বাঁধা মঞ্চ তারা কখনো দেখে নি, তাই তারা ষ্টেজের চারদিক ঘিরে বসে গিয়েছিল। তর্করত্ন মহাশয় তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, এ যাত্রা নয়, থিয়েটার, এতে শুধু একদিক থেকেই দেখা যাবে। নট-নটীদের সজ্জার ব্যবস্থা নাকি তিনিই দিয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা দেশের থিয়েটারের প্রথম নাট্যকারের মতো প্রথম প্রডিউসারের গৌরবও রামনারায়ণ দাবী করতে পারেন। কলকাতায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় নতুন বাজারে শোভারাম বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর প্রায় ১৭ বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অপ্রতিহতভাবে চলেছিল এর অভিনয়।

বাংলা থিয়েটারের দ্বিতীয় খ্যাতনামা নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রামনারায়ণ ও মাইকেল সমসাময়িক হলেও নাট্যকার হিসেবে আমরা এই দুজনকে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের নাট্যকার বলতে পারি। ভাষায় ও ভাবে, মধুসূদন বাংলা থিয়েটারে নতুন প্রথার প্রবর্তন-প্রয়াসী হয়েছিলেন বলেই তিনি রামনারায়ণী যুগের নন। জাতীয় জাগরণের পক্ষে নাটক ও নাট্যশালার

প্রয়োজনীয়তা মাইকেলই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে অনুভব করেন। ইংরেজি-তন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদনকে আমরা খাঁটি বাংলা নাটকের জনক বলতে পারি। ইংরেজিনবীশ নব্য বাঙালিদের প্রথম নাট্যকার তিনিই। সমসাময়িক যাত্রা-গানের কদর্যতা ও নাটকের তুচ্ছতা দেখে তিনি নাটক লিখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন; "অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে"—এই আক্ষেপই তো তাঁকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সেদিন। সম্ভবত বেলগাছিয়া থিয়েটারে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের যে চমৎকার অভিনয় হয়ে গিয়েছিল, তাও মধুসূদনকে বাংলা নাটকরচনায় প্রবৃত্ত করে থাকবে। 'শর্মিষ্ঠা' তাঁর প্রথম নাটক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকবি ভারতের আর এক মহাকবির রচনা থেকে বাংলা নাটকের আদর্শ গ্রহণ করেছেন—মাইকেলের জাতীয়তাবোধের এটা একটা মস্ত বড়ো লক্ষণ। শুধু আদর্শ নয়, শর্মিষ্ঠা নাটকের ঘটনা-সংস্থানেও কলিদাসের নাটকের প্রভাব লক্ষণীয়। তথাপি 'শর্মিষ্ঠা'-ই প্রকৃতপ্রস্তাবে আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম নাটক। নব্য শিক্ষিত সমাজে এর এতদূর সমাদর হয়েছিল যে, অনেকে 'শর্মিষ্ঠা-কে সে-সময়ে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলতে কুণ্ঠিত হন নি। নাটকের আখ্যানভাগ মধুসূদন নিয়েছিলেন মহাভারতের আদিপর্ব থেকে, তবে তিনি মূল কাহিনী আবশ্যকমত পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলার আদর্শেই তিনি তাঁর শর্মিষ্ঠা-চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন। নাটকখানি গদ্যে লেখা। নবজাগরণ তখন দাবী করছে নতুন নাটকের—যে নাটকে বাঙালির মানস-চেতনা প্রতিফলিত হবে। মাইকেল লিখলেন সেই নাটক। প্রচলিত রীতিকে বর্জন করে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে তিনি রচনা করলেন 'শর্মিষ্ঠা'। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ দেখা দিল 'শর্মিষ্ঠা'-কে কেন্দ্র করে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই নাটকের জন্ত কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' থেকেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে দিক্-পরিবর্তনের সূচনা। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক এবং তার অভিনয়ের সমালোচনায় কলকাতার প্রত্যেকখানা কাগজ সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-মাইকেল যুগে যেসব নাটক রচিত হয়েছে, তুলনা করলে 'শর্মিষ্ঠা-'ই সর্বশ্রেষ্ঠ

নাটক বলে প্রতিপন্ন হয়। নাটকের শেষ দৃশ্যটি অতি নিপুণভাবে পরিকল্পিত।

মাইকেল-প্রতিভা উনিশ-শতকীয় রেনেসাঁসের একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। তিনিই এ-যুগের বাঙালি জীবনধর্মের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাণীকার। মহাভারতের প্রখরস্বভাবা, ঈর্য্যাতুরা, রুক্ষভাষিণী শর্মিষ্ঠা মাইকেলের হাতে অপার সৌন্দর্যময়ীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মর্মবাণীকে মাইকেল শর্মিষ্ঠা-চরিত্রের ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন—সেদিনের বাংলায় নারী-কেন্দ্রিক পরিবারজীবনের প্রেমিক বাঙালির ধ্যানের কল্পমূর্তি এই শর্মিষ্ঠা; দাসী হয়েও সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যে তপস্বিনী। অন্যদিকে, বঞ্চিতা নারীর মর্মদাহ দেবযানীর ভেতর দিয়ে নাট্যকার এমনভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন যে, সে-ও আমাদের অনুকম্পাভাজন হয়ে উঠেছে। 'শর্মিষ্ঠা'-ই আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম জীবন-চিত্রান্বিত ও সু-অবয়বসমৃদ্ধ নাটক। এই নাটকখানিকে আমরা তাই বাংলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগের বার্তাবহ বলতে পারি।

এর পর মাইকেল দু'খানা প্রহসন রচনা করেন—'একেই কি বলে সভ্যতা', ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। নব্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অধঃপতন এবং প্রাচীন হিন্দুসমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি ও কপটাচার, এই হোল মাইকেলের প্রহসন দু'খানির অবলম্বন। একটি প্রহসন নগর-কেন্দ্রিক, অপরটি পল্লী-কেন্দ্রিক। এই দু'খানিই বাংলা ভাষার প্রথম সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন এবং আজো বাংলার প্রহসন বিভাগে অপরাজেয় ও অগ্রগণ্য। নাগরিক সভ্যতার আদি রসাত্মক অমার্জিত রুচির মোড় ফিরিয়ে দিলেন মাইকেল। কি ভাষার ব্যবহারে, কি চরিত্র-চিত্রণে, কি রুচির মানদণ্ডে, সব দিক থেকেই তাঁর এই প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।* প্রহসন রচনায় মধুসূদন ভারতীয় ধারারই অনুসরণ করেছেন এবং পরবর্তী বহু নাট্যকার তাঁর এই প্রহসনের অনুকরণ করেছেন। সেইসময় বাংলার বহু স্থানে এই প্রহসন দু'খানির অভিনয় হয়েছিল; বাংলা

* লেখকের 'মাইকেল' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

থিয়েটারে farce এনে দিয়ে মাইকেল এর অগ্রগতির পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এর পর মাইকেল আর দুখানি নাটক রচনা করেন, 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'; 'পদ্মাবতী' নৃত্যগীতবহুল নাটক এবং সেই হিসাবে বাংলা থিয়েটারের প্রথম অপেরা। দূরদর্শী মাইকেল বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যশালার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং রঙ্গমঞ্চে নাটকের মাধ্যমে নাচ-গানের প্রচলন হবেই। 'পদ্মাবতী'তে তিনি তারই সূচনা করে যান। বাংলা থিয়েটারের গিরিশযুগেই মাইকেলের এই প্রত্যাশা সার্থক হয়েছিল। 'কৃষ্ণকুমারী' মাইকেলের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি। বাংলা থিয়েটারের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি (বিয়োগান্ত নাটক) 'কৃষ্ণকুমারী'ই বোধ হয় সর্বপ্রথম যাত্রাগানের সম্পর্কহীন রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত ঐতিহাসিক নাটক। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক এবং নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মাইকেল তাঁর এই নাটকখানি উৎসর্গ করেন। রোমান্টিক কারুণ্যপূর্ণ জীবন-বেদনার চিত্র হিসাবে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক তাঁর প্রতিভার অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। এই নাটকেই তিনি প্রথম পাশ্চাত্ত্যরীতিকে অনুসরণ করেন। গিরিশচন্দ্রের মতে, 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা থিয়েটারের প্রথম সার্থক বিষাদান্ত নাটক এবং তিনি স্বয়ং এই নাটকে ভীমসিংহের চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন।

সামাজিক নাটকের দিক থেকে দেখতে গেলে দীনবন্ধু মিত্র শক্তিমান নাট্যকার। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগের তৃতীয় নাট্যকার তিনি। 'নীলদর্পণ' তাঁর প্রথম নাটক, এবং একখানি অবিস্মরণীয় নাটক। দীনবন্ধু প্রধানত হাস্যরসের নাট্যকার, লীলাবতী ও নীলদর্পণ ভিন্ন তাঁর অধিকাংশ নাটকই হাস্যরস প্রধান। গুপ্তকবির শিষ্য হয়ে তিনি যে কেমন করে ব্যঙ্গ থেকে হাস্যরসের ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভাকে সার্থক করে তুললেন, তা চিন্তা করবার বিষয়। সম্ভবত তিনি ইংরেজিনবীশ ছিলেন বলে গুরুর প্রভাবকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। 'নীলদর্পণ'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণ-নাটক, কিন্তু সময়ের দিক থেকে খুব বেশি অগ্রবর্তী ছিল বলে, বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় কি গিরিশযুগে, কি গিরিশ-

পরবর্তীকালে খুব বেশি হয় নি। বাংলা থিয়েটারের ট্রাডিসন তখন অন্য খাতে প্রবাহিত হোত, গণ-নাটক অভিনয় করবার মত মেজাজ বা আগ্রহ তৎকালীন নাট্যাধ্যক্ষ বা অভিনেতাদের মধ্যে ছিল না। তবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা থিয়েটারের প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন দীনবন্ধু; তাঁর 'নীলদর্পণ'-কে আশ্রয় করেই ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়াপত্তন হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেই দীনবন্ধুর উদ্দেশে বলেছেন: "মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশানল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" "নীলদর্পণ'-এর স্মৃতি তাই নাট্যানুরাগী বাঙালির মনে আজো অম্লান।

'সধবার একাদশী' কৌতুকরসের একটি আদর্শ সৃষ্টি। দীনবন্ধুর হাতে কৌতুকরস কোথাও ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয় নি। বাংলা থিয়েটারের দ্বিতীয় যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই প্রহসনখানির গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে এবং এই নাটকের নিমচাঁদ-চরিত্রটির ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে একাল ও সেকালের বহু অভিনেতাই তাঁদের অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব তো এই ভূমিকাতেই। সমসাময়িক বাংলার—বিশেষ করে কলকাতার সমাজজীবনের একটি Type চরিত্রকে নিমচাঁদের মাধ্যমে দীনবন্ধু অপূর্ব কৌশলে তুলে ধরেছেন। 'সধবার একাদশী' উদ্দেশ্যমূলক নাটক; সুরাপানের অনিষ্টকারিতা দেখানই এর উদ্দেশ্য। দীনবন্ধু মাইকেলকে অনুসরণ করেও তাঁকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। এই নাটকের আর একটি বড় গৌরব এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিনেতা ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে এ অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। অমৃতলাল বসু তাই তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "সধবার একাদশীতেই ন্যাশনাল থিয়েটারের অঙ্কুর।" দীনবন্ধু তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রিয় নাট্যকার। 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাংলা থিয়েটারের এই যুগের (১৮৫৭-৭২) চতুর্থ নাট্যকার মনোমোহন বসু। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনিও গুপ্তকবির শিষ্য এবং দীনবন্ধু ও মনোমোহনের মধ্যে বয়সের মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান ছিল। এঁর সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন: "মনোমোহন বসু দীনবন্ধুর পর বাংলা নাটকে নূতন রসের যোগান দিলেন। মনোমোহন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন স্বভাবতই যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার রীতি এড়াইয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার নাট্যরচনা পূর্বতন নাট্যগীতির সঙ্গে অধুনাতন নাটকের যোগসাধন করিয়া জনসাধারণের আরো গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিল।" যখন ইংরেজি মঞ্চের রঙীন অভিনবতা বাংলা নাটককে ক্রমে জনপ্রিয় করে তুলতে লাগলো, তখনই নূতন যাত্রার সৃষ্টি হোল, যাকে বলা হোত 'গীতাভিনয়'। নাট্যকার মনোমোহন বসুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই পরিবর্তনটা ধরতে পেরেছিলেন এবং নূতন যাত্রাপদ্ধতির—গীতাভিনয়ের—প্রবর্তন করে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরই নাটকে অভিনেতব্য এবং গীতাভিনেতব্য নাট্যের সমন্বয় হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে মনোমোহনের প্রভাব লক্ষণীয়। সেইসময়ে কলকাতার বহু সখের দলের প্রিয় নাট্যকার ছিলেন মনোমোহন। বৌবাজারের অবৈতনিক নাট্যালয়ের উদ্বোধন তো তাঁরই 'রামাভিষেক' নাটক দিয়ে হয়েছিল এবং এই সম্প্রদায়ে তাঁর প্রথম তিনখানি পৌরাণিক নাটক (রামাভিষেক, সতী ও হরিশ্চন্দ্র)ও প্রথম অভিনীত হয়েছিল। 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে হিন্দুমেলার ভাবধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—জাতীয়তাবোধের সুর এই নাটকের বহু সংলাপের মধ্যে পাওয়া যায়। নবগোপাল মিত্রের এই আন্দোলনের সঙ্গে মনোমোহন বসু ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুমেলার একটি বিখ্যাত গান—"দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন"; এটি মনোমোহনেরই রচিত এবং তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে তিনি এই গানটিকে সন্নিবেশিত করেছেন। এই নাটকখানিকে তিনি গীতাভিনয়েও রূপান্তরিত করেছিলেন।

রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসুর পরেই আমরা এই যুগের আরেকজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি জ্যোতিরিন্দ্র

নাথ ঠাকুর। ইনি একাধারে নট এবং নাট্যকার। স্বীয় পারিবারিক থিয়েটারে অভিনীত নবনাটকে নটীর ভূমিকায় মঞ্চে এঁর আমরা প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তাঁর অশ্রুমতী, পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী, তিনখানিই ঐতিহাসিক নাটক এবং জাতীয়তাবোধই (nationalism) এদের উপজীব্য। পুরুবিক্রমই বাংলার প্রথম জাতীয়তামূলক নাটক। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে এর অভিনয় হয়। 'অলীকবাবু' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি প্রসিদ্ধ প্রহসন এবং বিংশ শতাব্দীর বাংলা থিয়েটারে একাধিক মঞ্চে এই প্রহসনখানির একাধিক অভিনয় হয়। পারিবারিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু 'সরোজিনী'-ই তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। "শহরের রঙ্গমঞ্চে এবং মফঃস্বলে যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়া সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। অপর কোন বাংলা নাটক এমন সমাদর লাভ করে নাই।"

আমরা দেখতে পেলাম যে, "বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত ছিল, তাহা অবশেষে কয়েকটি নিঃসম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী হইল।" বিদেশীর অনুকরণে বাঙালি থিয়েটার খুলেছে, কিন্তু নাটকের জন্য তাকে খুব বেশি দিন বিদেশীর দ্বারস্থ হতে হয় নি। এই সময়ের মধ্যেই বাংলা থিয়েটার পেয়েছে পাঁচজন নাট্যকারকে এবং সেই সঙ্গে বহু নাটক ও প্রহসন। নাট্যশালা, নাটক এবং নাট্যকার—সবই এই সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দর্শকদের রুচির পরিবর্তন আর সেই সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান নাট্যানুরাগের এইটাই কি বড়ো পরিচয় নয়? রঙ্গালয়কে বাঙালি শুধু চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবেই গ্রহণ করে নি; দেখা গেল এই পনেরো বছরের মধ্যে বাঙালি উপলব্ধি করেছে যে, "রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক।" বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী ইতিহাস এই মহৎ কার্যসাধনেরই ইতিহাস।

॥ ২ ॥ গিরিশযুগের থিয়েটার

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১৩১৮, ২৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার) ৬৮ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হোল। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য, বাংলা থিয়েটারের অন্যতম এবং প্রধানতম প্রতিষ্ঠাতা, সর্বজনবিদিত এই নাট্যরথীর মৃত্যুতে থিয়েটারের একটি যুগের অবসান ঘটল। গিরিশচন্দ্রের যুগ বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-প্রতিভার আবির্ভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে হোলে গিরিশ-প্রতিভার কথা সর্বাগ্রে আলোচনা করতে হয়। গিরিশচন্দ্রের নটজীবন আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এবং নাট্যশালার পরবর্তী বিশ বৎসরের ইতিহাস তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। থিয়েটার পরিচালনা এবং থিয়েটারের জন্য নাটক রচনা —এই উভয় ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব বাংলা থিয়েটারকে এক অপূর্ব গতিবেগে স্পন্দিত করে তুলেছিল। তাই নাট্য-জগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব সকল দিক দিয়েই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। শুধু কি নাটক রচনা আর থিয়েটার পরিচালনা? সেই সঙ্গে দর্শকচিত্তেও তিনি এনে দিয়েছিলেন একটা তুমুল আলোড়ন। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের পাশে সেদিন অর্ধেন্দু, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ এক বিরাট শক্তিশালী অভিনেতৃগোষ্ঠি এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই বাংলা থিয়েটার এতখানি পরিণতি লাভ করেছিল। তবে এই কাহিনী অবিমিশ্র সাফল্যের কাহিনী নয়, বা একটানা সুশৃঙ্খল অগ্রগতির ইতিহাসও নয়। এই বিশ বৎসর কাল বাংলা থিয়েটারকে অনেক দলাদলি, অনেক ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক কলহ ও মনোমালিন্যের ভেতর দিয়ে তার পথ করে নিতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভা এর পুরোভাগে যদি না থাকত তা'হোলে এই বিশ বছরের ইতিহাস যে অন্যরকম হোত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গিরিশযুগের কথা বলবার আগে নাট্যশালার ইতিহাসের প্রসঙ্গে একটু ফিরে যেতে হবে, কাহিনীর ধারাকে ঠিকমত অণুসরণ করবার জন্য। তা'ছাড়া গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের প্রস্তুতিপর্ব এই কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে প্রায় গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন চারজন—গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর ও অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশচন্দ্র তখনো পর্যন্ত এ্যামেচার অভিনেতা, তবে তিনি এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন। দলাদলি ও মনোমালিন্যের ভেতর দিয়ে অবশেষে এক থিয়েটার ভেঙে দুটো থিয়েটার হোল, যথা ন্যাশনাল আর হিন্দু ন্যাশনাল। প্রথম দলে রইলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি আর দ্বিতীয় দলে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। ন্যাশনালের মঞ্চ এবং দৃশ্য-পটাদি প্রথম দলই পেয়েছিলেন। সুতরাং হিন্দু ন্যাশনালকে প্রথমে চৌরঙ্গির অপেরা হাউস এবং পরে কালী সিংহের বাড়ির হল ভাড়া নিয়ে অভিনয় করতে হয়। হিন্দু ন্যাশনালের পরবর্তী ইতিহাস ভ্রাম্যমান থিয়েটারের ইতিহাস। ঢাকা, চুঁচুড়া প্রভৃতি মফঃস্বলের বহু স্থানে এঁরা এই সময়ে অভিনয়কলাকে জনসাধারণের সামগ্রী করে তুলবার চেষ্টায় ছিলেন। মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের ভগ্নাংশ দলটিও তখন কলকাতায় গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে সমানে অভিনয় করে চলছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩, ২৯শে মার্চ) মেয়ো হাসপাতালের সাহায্যকল্পে এই দল টাউন হলে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন। থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর বা Benefit night প্রবর্তনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। টিকিট বিক্রী হয় সর্বসমেত ১১০০৲ টাকা। গিরিশচন্দ্র এই রাত্রে উড সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করেন। এঁরা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরেও কয়েকটি অভিনয় করেন এবং পরে দ্বিতীয় দলের দেখাদেখি এঁরাও ঢাকায় গিয়ে অভিনয় করেছিলেন। "হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের মফঃস্বল-ভ্রমণে দেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রসার হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।" বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধারাটি বিশেষভাবেই বজায় ছিল।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই বছরে (১৮৭৩) তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হোল বঙ্গীয় নাট্যশালার দ্বিতীয় নাট্যকার; বাংলা সাহিত্যে খাঁটি প্রহসন এবং বিয়োগান্ত নাটকের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু; দ্বিতীয়টি হোল বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু—মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাসের। আর তৃতীয় ঘটনাটি হোল বেঙ্গল থিয়েটারের অভ্যুদয়। ২৯শে জুন মাইকেলের মৃত্যু হয় আর তার বারো দিন বাদেই "মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে" ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন হোল। কয়েকজন অভিনয়কুশলী ব্যক্তি এবং নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ নিয়েই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এঁরা মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে এই বছরের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ; শরৎচন্দ্র নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং মাতামহের নাট্যপ্রীতি উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেকখানি লাভ করেছিলেন। দুটি কারণে বেঙ্গল থিয়েটার নাট্যশালার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট গৌরবের স্থান পেয়েছে; প্রথম—নিজস্ব মঞ্চ, দ্বিতীয়—পেশাদার অভিনেত্রী দ্বারা স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাগুলির অভিনয়। থিয়েটার খুলবার আগে শরৎচন্দ্র রোগশয্যায় শায়িত মাইকেলের সঙ্গে যখন পরামর্শ করতে আসেন তখন তিনিই অভিনেত্রী গ্রহণের প্রস্তাব করেন ও বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য একখানা নতুন নাটক লিখে দেবেন, সে-কথাও বলেন। এই প্রতিশ্রুত নাটকই 'মায়াকানন',—মাইকেলের শেষ সম্পূর্ণ নাটক। এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রীট ডাকঘর রয়েছে, ঐটাই তখন ছিল আশুতোষ দেবের বাড়ির সম্মুখের খোলা মাঠ। ঐ মাঠেই বেঙ্গলের ষ্টেজ তৈরি হয়। এ পর্যন্ত যতগুলো থিয়েটার হয়েছে, তাদের কারো এমন নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। 'শর্মিষ্ঠা'র পরে এখানে 'মায়াকানন'-এর অভিনয় হয়। কিন্তু নাটক দুখানার একখানাও তেমন জমে নি।

১৮৭৪, ১২ই ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অভিনয় হয়। এই থিয়েটারের আর একটি গৌরব, বর্ধমানের মহারাজা

এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে বাংলার একজন নাট্যকলাকুশল অভিনেতার স্মৃতি বিশেষভাবে বিজড়িত আছে। তিনি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় বিহারীলাল ছিলেন শোভাবাজারের বাসিন্দা। শরৎচন্দ্র এঁরই ভরসায় এই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবন বলতে আমরা যেমন বুঝি সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস, তেমনি বিহারীলালের জীবন বলতে বাংলার একটি বিশিষ্ট নাট্যশালার ইতিহাসকে বোঝায়। কাজেই বাংলা থিয়েটার বিহারীলালের কাছেও ঋণী। বেঙ্গল থিয়েটারের আটাশ বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনে (১৮৭৩—১৯০১) বিহারীলালই ছিলেন একাধারে এই প্রতিষ্ঠানের নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য; তিনিই ছিলেন এর অধ্যক্ষ, নাট্যশিক্ষক, প্রধান অভিনেতা ও প্রধান নাট্যকার। গিরিশযুগে গিরিশচন্দ্রের সাহায্য বা সহযোগিতা ভিন্ন আটাশ বছর ধরে একটি থিয়েটার পরিচালনা করা কম প্রতিভার পরিচয় নয়! প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বিহারীলাল বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পাদরি ডফের স্কুলের মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন সহকারী কেশিয়ারের মধ্যে যে এমন একটি অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা সুপ্ত ছিল, তা সেদিন কেউ জানতে পারে নি—যেমন কেউ বুঝতে পারে নি যে এ্যাটকিনসন অফিসের বুক-কিপার গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যেই ছিল বাংলার ভাবী নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র। বিহারীলাল ও গিরিশচন্দ্র দুজনেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ থাকায় অভিনেয় নাটকাভাবে নাট্যসাহিত্যের জন্য কলম ধরেন এবং নাটক হিসাবে উভয়েরই প্রথম নাটক 'রাবণবধ'। কিন্তু বিহারীলালের মতো এত সুদীর্ঘকাল আর কেউ-ই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বিহারীলালের মৃত্যুতে (১৯০১, এপ্রিল) গিরিশচন্দ্র তাই বলেছিলেন: "বঙ্গের রঙ্গমঞ্চ হইতে আর একটি উজ্জ্বল তারা খসিল। বেঙ্গল থিয়েটার আজ অনাথ।" ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের নটজীবনের আরম্ভ; সেই বছরই তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বেণীসংহার' নাটকের অন্যতম অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যখন

'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়, বিহারীলাল সেই নাটকে নায়িকা সুলোচনার অংশে অভিনয় করে দর্শকদের বিস্মিত করেছিলেন বলে জানা যায়। গিরিশচন্দ্র বলেন: "পাইকপাড়ার থিয়েটারেও বিহারীবাবু ছিলেন এবং নটকুল-তিলক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিহারীবাবুর অভিনয় দর্শনে তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী হন। যে যে ব্যক্তি উপস্থিত প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আছেন, সকলের অগ্রে বিহারীবাবু অভিনয় কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার রচিত অনেক নাটক বেঙ্গল থিয়েটারের বিপুল অর্থাগমের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার নাটক তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁহার প্রসিদ্ধ ভূমিকা মৃণালিনীতে মাধবাচার্য, মেঘনাদবধে মহাদেব ও ভীষ্মের শরশয্যায় ভীষ্ম।" (রঙ্গালয়, ১৩০৮) বেঙ্গলে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিহারীলাল স্বয়ং এবং তিনি অভিরামস্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করেন আর জগৎসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র। বিমলা, তিলোত্তমা ও আয়েষার ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), জগত্তারিণী ও শ্যামাসুন্দরী—এঁরাই বাংলা পেশাদার থিয়েটারের আদি অভিনেত্রী। কথিত আছে, সুকুমারীর বিমলা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইনি সুকণ্ঠী গায়িকা ও নিপুণা অভিনেত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাধীনেই সুকুমারীর প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ করতে হয়। বাংলা নাট্যশালার আদিপর্বের নাট্যকার হিসাবে তাঁকে আমরা পেয়েছি; দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম স্রষ্টা তিনিই। তাঁর অশ্রুমতী, সরোজিনী, পুরুবিক্রম নাটকগুলি বেঙ্গলে খুব সমারোহের সঙ্গেই অভিনয় হয়েছিল। দর্শকচিত্তেও একটা নতুন সাড়া এনে দিয়েছিল। পুরুবিক্রম নাটকে রাণী ঐলবিলার ভূমিকায় সুকুমারী দত্তের অভিনয় স্বয়ং নাট্যকারের প্রশংসা লাভ করেছিল।

থিয়েটারে অভিনেত্রী আমদানী করা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের অভিমত এখানে উদ্ধৃত হোল: "সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়,

স্ত্রীলোকের ভূমিকা (part) স্ত্রীলোক করিতে থাকে। ন্যাশনাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় কার্যে প্রবৃত্ত হইলে ন্যাশনাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। বালক অভিনয় কার্যে যে কেবল সুন্দররূপ অভিনয়কার্য সম্পন্ন হয় না তাহা নয়, বালকেরও সর্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া একরকম মেয়েলি ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন্ দেশে কে পাইয়াছে? অদ্যাপি নটীনামের সহিত উচ্চনীতির সংযোগ কেহই করেন না। কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকিব?"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি যে, ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দেওয়ান রামচাঁদ মুখুয্যের যাত্রার দলেই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী লওয়া হয়, তারপর এই বিষয়ে পথ প্রদর্শক হন বেঙ্গল থিয়েটার।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম হোল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। অতঃপর কলকাতায় ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটার—এই তিনটি রঙ্গমঞ্চ নিয়মিতভাবে অভিনয় করতে থাকে। সাধারণ নাট্যশালার আদিপর্বের অন্যতম নাট্যকার মনোমোহন বসু ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বাৎসরিক উৎসবে (১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর) একটি ভাষণে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। এই উৎসব মধুসূদন সান্যালের চিৎপুর রোডের বাড়িতেই হয়। মনোমোহন প্রাচীনপন্থী নাট্যকার, তাই তাঁর ভাষণে থিয়েটারে অভিনেত্রী আমদানী করার বিপক্ষে বহু উক্তি ছিল। দলাদলির বিরুদ্ধেও তিনি দুই-একটি কথা বলেন এবং উপসংহারে নাট্যশালা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে তিনি এই আবেদন জানান: "কিন্তু যেন তাঁহাদের আদ্যাবস্থায় প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্য-সমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য করিতে ত্রুটি না করেন—যেন স্বদেশের কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ন না হয়েন।”

এই সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারে নতুন নাটকের অভাব বিশেষ করে বোধ হতে থাকে। রামনারায়ণ, মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটক তখন পুরানো হয়ে গিয়েছে। একা মনোমোহন বসু তখন নাট্যকার হিসেবে আসর জমিয়ে আছেন। বেঙ্গলের তো নিজস্ব নাট্যকারই রয়েছেন, কিন্তু আর দুটি থিয়েটার চলে কি করে? গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারই এ-বিষয়ে প্রথম পথ দেখালো। তাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসকে নাটকাকারে মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হোল। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর’ গ্রন্থে লিখেছেন: “এই সময়ে থিয়েটারের সহিত গিরিশবাবুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া ‘মৃণালিনী’ ন্যাশনালে অভিনীত হইয়াছে এবং তাহাতে গিরিশবাবু পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন।” ইতিমধ্যে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে এবং স্বত্বাধিকারিত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নিজস্ব মঞ্চের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, ঐ জমিতে “গড়ের মাঠের লিউইস থিয়েটারের অনুকরণে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা” অচির-কালের মধ্যেই গড়ে ওঠে। ধর্মদাস সুরের ওপর এই কাজের ভার ছিল। ন্যাশনালে ‘মৃণালিনী’ হবার সাতদিন আগে গ্রেট ন্যাশনালে ‘কপালকুণ্ডলা’ মঞ্চস্থ হোল। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’র এই নাট্যরূপ আশাপ্রদ হয় নি। সমসাময়িক একটি পত্রিকায় তখন এই রকম একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়: “কপালকুণ্ডলাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার যে কৃতকার্য হইয়াছেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না।...এজন্য অভিনয় কালে আমাদিগের মনে উদিত হইতেছিল, আমরা যেন বঙ্কিম-বাবুরই কপালকুণ্ডলা সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু সে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণতা আছে, যে সৌন্দর্য আছে নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল।

মতিবিবি এবং কাপালিককে আমরা চিনিতে পারি নাই।" পরে গ্রেট ন্যাশনালে 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষের' অভিনয় হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, এক বছরের মধ্যেই বাংলা থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের চারখানা উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হোল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বেঙ্গলের দৃষ্টান্তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আরো একটি ঘটনার জন্য বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করে এই সময় দুই-একখানি প্রহসন রচিত ও অভিনীত হয় এবং এরই পরিণতি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের Dramatic Performance Control Act ; এদেশে অভিনেয় নাটক সম্বন্ধে আইন এই প্রথম।

অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "১৮৭৩ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় কি সাত বৎসর বাংলা থিয়েটারে একটা ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলার দিন।... এই সময়ে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন হইয়াছে, ক্রমাগত লেসীও বদলাইয়াছে, অধ্যক্ষও বদলাইয়াছে। গিরিশবাবু এ সময়ে ঠিক থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।" তখন অবশ্য অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি হয়েছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্ণধাররূপে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Man of the theatre—তিনি তখনও পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেন নি। শক্তিমান অভিনেতা তখন রয়েছেন একাধিক, তবু এই বিশৃঙ্খলা কেন? এর প্রধান কারণ ছিল তিনটি, যথা—(১) নাটকের অভাব, (২) সুপরিচালনার অভাব আর (৩) অর্থের অভাব। এ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার দুটো স্তর অতিক্রম করে এসেছে; এর প্রথম স্তরে ছিল ধনীদের উদ্যম, তাঁদের সখ মিটে গেলেই থিয়েটারের ওপর চিরকালের মতো যবনিকা পতন হোত। তবে এই সখের থিয়েটারে অর্থের দুশ্চিন্তা ছিল না, অর্থ উপার্জনেরও কোন প্রশ্ন ছিল না। তারপর এলো দ্বিতীয় পর্যায়—সাধারণ নাট্যশালা—মধ্যবিত্ত বাঙালির উদ্যম। টিকিট বিক্রীর টাকা দিয়ে থিয়েটারকে ঠিক চালু রাখা যায় না, যদি না এর পেছনে কিছু মূলধন নিয়োগ করা হয়,—এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পাঁচ-ছয় বছর লাগল। অথচ সুপরিচালিত হোলে

থিয়েটার যে লাভের ব্যবসায় হোতে পারে, এ ধারণাও ইতিমধ্যে অনেকের মনে জেগেছে। সেই সুযোগ নিতে এগিয়ে এলো একজন মাড়োয়ারি। তাঁর নাম প্রতাপচাঁদ জহুরী। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নামের সঙ্গে এই প্রতাপ জহুরীর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। দীর্ঘ বারো বছর ধরে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের সংস্পর্শে রয়েছেন, অথচ এতে স্থায়ীভাবে যোগ দিতে ভরসা পান নি; না পাবার প্রধান কারণ থিয়েটারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। পেশাদার থিয়েটার নামেই, তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ তখনো পর্যন্ত সুদৃঢ় হয় নি। তাই তাঁকে বারো বছর তার জন্য অপেক্ষা করতে হোল। অতঃপর মাড়োয়ারি ব্যবসাদার যখন এই ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন, গিরিশচন্দ্র আর দ্বিধা করলেন না। এদের অর্থবল ও ব্যবসায়বুদ্ধি দুই-ই আছে, এরা পারবে—এই ভরসাতে এইবার "গিরিশচন্দ্র অফিসের চাকরি ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমী ভাবে যোগ দিলেন। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার থেকেই আরম্ভ হইল।" শুধু তাঁরই প্রতিষ্ঠা নয়, সেই সঙ্গে বাংলা থিয়েটারেরও একটা স্থায়ীরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। তখন গিরিশচন্দ্র ছত্রিশ বৎসরের যুবক। শিশিরকুমারের রঙ্গমঞ্চে যোগদান অনেকটা অনুরূপ ভাবেই ঘটেছিল। উনিশ শতকে ছিল মাড়োয়ারি প্রতাপ জহুরী, আর বিশ শতকে এলো পার্শী ব্যবসায়ী ম্যাডান। শিশিরকুমারের নামের সঙ্গে ম্যাডান সাহেবের নামও বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

প্রতাপ জহুরী যখন গ্রেট ন্যাশনালের মালিক, গিরিশচন্দ্র তখন সেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ। মাইনে মাসে একশো টাকা। বাংলার নাট্য-সম্রাটের নটজীবনে এই কথাটি মনে রাখবার মতো। থিয়েটারের কাজে তিনই প্রথম বেতনভোগী হলেন। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যে থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র, সেই থিয়েটারের জয়জয়কার, যখন যে থিয়েটারে তিনি যেতেন, লোক ভেঙে পড়ত। তাঁর নামেরই যেন কি একটা আকর্ষিণী শক্তি ছিল—যেমন ছিল বিশ শতকের থিয়েটারে শিশিরকুমারের নামের। পেশাদার মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্থায়ীভাবে যোগদান সেই সঙ্কটকালে বাংলা

থিয়েটারের পক্ষে যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অবস্থাটা তখন এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, অভিনেতা আছে, মঞ্চ আছে, দর্শকের আগ্রহ আছে, কিন্তু নাটক নেই। মনে রাখতে হবে যে, বাংলা নাটকের সেই ঘোরতর দুর্ভিক্ষের দিনেই রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। গিরিশ-প্রতিভা তিন দিক দিয়ে বাংলা থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেছে—নাটক রচনা, অভিনয়রীতির পরিপুষ্টি বিধান আর রঙ্গমঞ্চের সংস্কার ও সংগঠন। এই তিন ক্ষেত্রেই গিরিশচন্দ্র অতুলনীয়। সুতরাং "Father of the Bengali Stage"—এ গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' অভিনীত হয় সগৌরবে। লোকোত্তরচরিত্র রামচন্দ্রের কাহিনীকে পাদপ্রদীপের আলোকে এনে গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের যে ধারা প্রবর্তন করেন, পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাঙালির মনে রামচন্দ্রকে কবি কৃত্তিবাস যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বাঙালি দর্শকের সামনে তিনি যদি সেই রামচন্দ্রকে তুলে ধরতে পারেন, তাহোলে নাট্যকার হিসাবে তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। তাঁর সামনে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেলের দৃষ্টান্তও ছিল। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নূতন ভাবে রচিত তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য তাঁকে মহাকবির শাশ্বত গৌরব প্রদান করেছে। তেমনি আমরা দেখতে পাই যে, স্বাধীনভাবে নটজীবন আরম্ভ করবার প্রাক্কালে শিশিরকুমারও সেই রামায়ণকেই আশ্রয় করে রঙ্গমঞ্চে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিন বছর "সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত থিয়েটার চালাইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহরীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।" এই তিন বছর এখানে 'রাবণবধ' ভিন্ন 'সীতার বনবাস' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' 'আনন্দরহো' প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য অভিনীত হয়। যাই হোক, থিয়েটার যে লাভের কারবার, প্রতাপ জহরী তা বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত শহরের অনেক ধনকুবেরদের উৎসাহিত করে তোলে। বাংলা থিয়েটারে দ্বিতীয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হলেন গুর্মুখ রায়। ইনি গিরিশচন্দ্রকে

নিয়ে একটি নূতন থিয়েটার খুললেন—ষ্টার থিয়েটার। এ হোল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বিডন ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থলে আগে যেখানে মনোমোহন থিয়েটারের বাড়ি ছিল সেইখানেই (৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট) গুর্মুখ রায়ের ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হোল। পুরাতন ষ্টারের ভিত্তির ওপরই পরবর্তীকালে মনোমোহন থিয়েটারের সৌধ নির্মিত হয়। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখে সেই ষ্টার বা মনোমোহনের কোন চিহ্নই আজ আর নেই। প্রসঙ্গতঃ একটা জিনিস লক্ষ্য করা করা যায়। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের বাল্য ও শৈশবকাল এই অঞ্চলেই অতিবাহিত হয়। কলকাতার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলই থিয়েটারের পীঠস্থান হিসাবে সেদিন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। অতীত গৌরবের সাক্ষী হিসাবে এই অঞ্চলে একমাত্র মিনার্ভা থিয়েটার আজো দাঁড়িয়ে আছে।

গুর্মুখ রায়ের 'ষ্টার' থিয়েটারেরও কর্ণধার ছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গে এলেন অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র। ষ্টারের প্রথম নাটক, গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ'—প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। তারপর এইখানে একে একে চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস, বুদ্ধদেব-চরিত, বিল্ব-মঙ্গল প্রভৃতি ভক্তিরসমূলক নাটকগুলির সফল অভিনয় বাংলা দেশে সত্যই এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। অনেকের মতে, নাট্যশালা এই সময়ে (১৮৮৪-৮৭ খ্রীঃ) ধর্মশালায় পরিণত হয়। বাংলা থিয়েটারের এই সময়টাকে আমরা কাপ্তেনী থিয়েটারের যুগও বলতে পারি। বহু ধনীসন্তান এই সময়ে থিয়েটারের ব্যবসায়ে ঝোঁকেন; এমনি একজন ছিলেন গোপাল-লাল শীল। তিনি ষ্টারের বাড়ি কিনে নিয়ে স্থাপন করলেন এমারেল্ড থিয়েটার। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "গোপালবাবুর অর্থের প্রলোভন এই সম্প্রদায়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। গিরিশচন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষে পরামর্শে স্থির হইল থিয়েটার বাড়ি গোপাল বাবুকে বিক্রয় করা হউক; কিন্তু ষ্টারের নাম (good-will) কখনও হাতছাড়া করা হইবে না। যে অর্থ ষ্টার রঙ্গমঞ্চ বেচিয়া পাওয়া যাইবে, তাহা অবলম্বনে শহরের অন্যত্র নূতন করিয়া ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" তাই হোল। হাতীবাগানে জায়গা

কিনে ষ্টারের নূতন বাড়ি তৈরি হোল। অধ্যক্ষ হলেন অমৃতলাল বসু।

এমারেল্ড থিয়েটার গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই আরম্ভ হয়। এখানকার অভিনেতৃগোষ্ঠির মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্র বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি এবং একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের একখানা পৌরাণিক নাটক নিয়ে এমারেল্ডের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু থিয়েটার জমল না। মালিক বুঝলেন—একটি লোকের অভাবেই জমছে না। তিনি গিরিশচন্দ্র। কিন্তু তিনি তো তখন তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। গোপাললাল শীল গিরিশচন্দ্রকে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস দিয়ে তাঁর থিয়েটারে আনতে চাইলেন। নিজের সম্প্রদায়কে টাকার লোভে তিনি ত্যাগ করে যাবেন, এমন কথা ছিল না। অথচ "ষ্টারের সে সময়ে টাকার খুব টানাটানি।" নতুন ষ্টেজ করতে গেলে আরো টাকার দরকার; বাড়ি বিক্রির-টাকা তো জমি ও অন্যান্য প্রাথমিক খরচেই এর মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের জন্য যে বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছিলেন, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তা একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। পরবর্তীকালে তার অনুসরণ করতে আমরা আর কাউকে দেখি নি। অপরেশবাবু লিখেছেন, বোনাসের ঐ বিশ হাজার টাকা থেকে ষোল হাজার টাকা গিরিশচন্দ্র ষ্টারকে বিনাসর্তে দান করেছিলেন। একটা সমস্যা মিটল, কিন্তু গিরিশচন্দ্র চলে গেলে নাটক লিখবে কে, এই সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। তখনো নাট্যকার বলে অমৃতলাল বসু তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি। গিরিশচন্দ্র সে সমস্যা পূরণ করে দিলেন বেনামে নাটক লিখে দিয়ে। অতঃপর গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক নিয়ে নবনির্মিতভবনে ষ্টার সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করলেন ১৮৮৮-খ্রীষ্টাব্দে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার যে, হাতীবাগানে যখন ষ্টারের বাড়ি তৈরি হয়, সেই সময় চোরবাগানের প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের পরিবারের একটি শাখা এরই কাছাকাছি একটি বাড়িতে বাস করতেন। সেই দত্তবাড়ির এক তরুণের মনে থিয়েটার করবার সঙ্কল্প জাগে এবং চার-পাচ বছর পরেই তিনি বাংলার নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ করে, গিরিশ-প্রতিভার গৌরবের মধ্যাহ্ন-

কালেই যুগান্তর নিয়ে আসেন। ইনিই ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ নট এবং নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁর বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

পাঁচ বছরের চুক্তিতে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; "কিন্তু পাঁচ বৎসর তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হয় নাই। খেয়ালী বড়লোকের থিয়েটার, কিছুকাল সখ মিটিবার পরই উহা হস্তান্তরিত হইল, এমারেল্ড সম্প্রদায়ভুক্ত মহেন্দ্র বসু ও নাট্যকার অতুল মিত্র ঐ থিয়েটার ভাড়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেণ্টও বাতিল হইয়া যায়; পুনরায় তিনি ষ্টারে আসিয়া যোগদান করিলেন।" এমারেল্ডে অধ্যক্ষ হিসাবে গিরিশ-চন্দ্রের মাইনে ছিল মাসিক ৩৫০৲ টাকা—তখনকার দিনে এই-ই ছিল সর্বোচ্চ বেতন। এমারেল্ড থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের চারখানি উপন্যাস—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও মৃণালিনী—নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয় এবং এই চারখানি নাটকে সুকুমারী দত্ত যথাক্রমে মতিবিবি, সূর্যমুখী, রোহিণী ও গিরিজায়ার ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মৃণালিনীতে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এমারেল্ডের জন্যও গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি নাটক রচনা করেন; এখানে তাঁর প্রথম নাটক 'পূর্ণচন্দ্র' আর শেষ নাটক 'বিষাদ'। এই এমারেল্ড থিয়েটারেই বাংলা ১২৯৭ সনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং একমাত্র পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা সেজেছিলেন মতিলাল সুর, কুমার মহেন্দ্রলাল বসু, রেবতী ক্ষেত্রমণি, সুমিত্রা 'গুলফম' হরি আর ইলার ভূমিকা নিয়েছিলেন কুসুম।

নাট্যসাহিত্যের প্রসার ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালার উন্নতি চিরবিজড়িত। গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই সত্যটি ধরা পরতে দেরী হয় নি। তিনি আরো বুঝেছিলেন যে, থিয়েটারকে যদি লোকশিক্ষার ধারক ও বাহক হতে হয় এবং ব্যবসায়ের দিক থেকে একে যদি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হয় তাহোলে চারটি জিনিসের দরকার, যথা: (১) উৎকৃষ্ট নাটক; (২) উৎকৃষ্ট অভিনেতা; (৩৷ সুদক্ষ পরিচালনা

এবং (৪) সহৃদয় দর্শক। ইংলণ্ডে থিয়েটারের বিশেষ প্রতিপত্তি—গীর্জার পরেই সেখানে রঙ্গালয়ের স্থান। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেখানকার থিয়েটারে দেখবার, শুনবার ও শিখবার অনেক কিছু আছে। অনেকে বলে থাকেন, অভিনয় অভিনয় মাত্র—যবনিকা পতনেই তার শেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অভিনয় একাধারে অভিনয় ও অগ্রচালনী ক্ষমতা। তন্ময় করবার ক্ষমতাই নাটকের বিচারণা বা আদর্শ। শেক্স্পিয়ার এই তন্ময়করণ প্রণালীর সর্বগুণালঙ্কৃত শিক্ষক। মানবচরিত্রকে তিনি তার চিরসত্যতায় প্রদর্শন করেছেন। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নিজেকে ও দর্শকবৃন্দকে আমোদিত করা অপেক্ষা আরো কিছু মহৎ কার্য আছে। তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার।

পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে, আমরা ধারণা করতে পারি, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মধ্যে এইসব চিন্তা-ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল। বাংলা থিয়েটার অতঃপর তাঁর এই পরিণত চিন্তার স্পর্শে কি ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে। কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথা পরে বলব। আপাততঃ তাঁর নটজীবনের কাহিনীকেই আমরা অনুসরণ করব। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আজীবন চাকরি করেছেন সত্য, কিন্তু চাকরির সঙ্গে ছিল কর্তৃত্ব—অখণ্ড কর্তৃত্ব। তাঁর এই কর্তৃত্বসম্পন্ন অধ্যক্ষতার গুণেই বাংলা থিয়েটার একটা স্থায়ী রূপ পেয়েছিল সেদিন, আবার এরই ফলে কোনো একটি মঞ্চে তিনি দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেন নি। মালিকদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ক্রমাগত গিরিশচন্দ্রকে এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে ঘুরিয়েছে এবং এই ভাবেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে রঙ্গমঞ্চকে যা দেবার তা অকৃপণ হাতেই দিয়ে গেছেন।

এমারেল্ড থেকে গিরিশচন্দ্র ষ্টারে এলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল এখানে তিনি থাকতে পারেন নি। না পারার কারণ, "পূর্বকার মত গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্ব ষ্টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না।" অতঃপর তাঁর নটজীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয় নবগঠিত 'মিনার্ভা' থিয়েটারকে কেন্দ্র করে। মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রে প্রথম নাটক 'ম্যাকবেথ'। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন:

"ম্যাকবেথের অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন ; এই ধারা পরিবর্তনে তাঁহার একমাত্র সহযোগী ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর।" বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে মিনার্ভার গৌরব শুধু অভিনয়-ধারার পরিবর্তনে নয়, নূতন অভিনেতৃগোষ্ঠির সৃষ্টিতেও। ন্যাশনালের যুগ থেকে ষ্টারের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল থিয়েটারের এই বিভাগটিতে কোনো নূতন মুখের বা নূতন রক্তের আমদানী হয় নি। নাট্যশালার বড়ো আকর্ষণ এর অভিনেতা ও অভিনেত্রী। গিরিশচন্দ্র তা জানতেন এবং জানতেন বলেই তিনি "এবার শুধু নূতন থিয়েটার খুলিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্মীদলেরও সৃষ্টি করিলেন। এই যে অভিনেত্রী তৈরির ক্ষমতা,—ইহা গিরিশ এবং অর্দ্ধেন্দুর যেমন ছিল, বাংলায় আর কাহারো তেমনটি দেখিতে পাওয়া যায় না।" গিরিশযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রও একজন সুদক্ষ নাট্যশিক্ষক ছিলেন। প্রতিভা-শালিনী অভিনেত্রী তারাসুন্দরী, গিরিশ-পুত্র দানিবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) প্রভৃতির নটজীবন তো অমৃতলালের শিক্ষকতায়ই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। উত্তরকালে বাংলা থিয়েটারে শিশিরযুগে আমরা এই ক্ষমতা নতুন করে প্রত্যক্ষ করেছি শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র মিত্রের মধ্যে। বলেছি, গিরিশ-চন্দ্রের নটজীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায় এই মিনার্ভা-পর্ব। এইখান থেকেই আমরা পেয়েছি দানিবাবু, চুণিলাল দেব, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, নৃপেন্দ্র-নাথ বসু, দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতিকে। নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নূতন নূতন নাটক, এই সবের ভেতর দিয়ে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় বাংলা থিয়ে-টারে যেন এক নবযুগের সূচনা হোল। মিনার্ভার যুগে গিরিশ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান, 'জনার' অভিনয় (১৮৯৩) বাঙালি দর্শককে মুগ্ধ, বিস্মিত করেছিল। 'জনা' নাটকে বিদূষক, নীলধ্বজ, প্রবীর ও বসন্তকুমারীর ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ, হয়েছিলেন অর্দ্ধেন্দু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, দানিবাবু ও কুসুমকুমারী। পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য গিরিশ-যুগের একজন নাট্যকলাকুশল শিক্ষক। মিনার্ভায় ইনি বহুকাল গিরিশচন্দ্রের সহকারীত্ব করেছেন। অর্দ্ধেন্দু-গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যশিক্ষকগণের পরেই উনিশ শতকের বাংলা

থিয়েটারের ইতিহাসে তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র এই সময়েই 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যখানি রচনা করেন। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "এই আড়াই ঘণ্টার অপেরা 'আবুহোসেন' খুলিয়া মিনার্ভা লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করিয়াছিল।" বাংলা থিয়েটারের প্রথম গীতি-নাট্য অবশ্য 'সতী কি কলঙ্কিনী'?—এর রচয়িতা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়; ইনি একসময়ে গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন।

"মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের সাফল্য দেখিয়া ষ্টারের কর্তৃপক্ষরা তাঁহাকে পুনরায় মাল্যচন্দন দিয়া লইয়া আসিলেন।" তাঁকে আনবার প্রধান কারণ নাটকের অভাব, নাট্যকারের অভাব। রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন তখন ষ্টারের নাট্যকার; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইনিই ছিলেন বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। এর তিন বছর পরে বাংলা থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্লাসিক' যুগের সূচনা হয়। নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব এই সময়কারই ঘটনা। ষ্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক—এই তিনটি থিয়েটারই তখন গিরিশ-প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কলকাতার থিয়েটারের আসর তখন জমিয়ে রেখেছিল এই চারটি থিয়েটার: ষ্টার, মিনার্ভা, বেঙ্গল আর অমর দত্তের ক্লাসিক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই পঁচিশ বছরের মধ্যে কলকাতায় যে কয়টি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ জন্মগ্রহণ করেছিল তার প্রত্যেকটি (ক্লাসিক বাদে) তাঁদেরই নিয়ে স্থাপিত হয়, যাঁদের নিয়ে একদা শুরু হয়েছিল পেশাদার নাট্যশালার ইতিহাস।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে যে সময়টাকে বলা হয় 'ক্লাসিক যুগ' তার পুরোভাগে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বা সংক্ষেপে অমর দত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) ক্লাসিকের সৃষ্টি। সুবিখ্যাত বৈদান্তিক ও এ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে সখের দলেই তাঁর নটজীবন শুরু করেছিলেন দানিবাবু, চুণিলাল দেব প্রভৃতি তাঁরই সমবয়সী কয়েকজন তরুণ অভিনেতাদের নিয়ে। গিরিশচন্দ্র নট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায়,

অমর দত্ত তেমনি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' নাটকাকারে রূপান্তরিত করে, তাতে সিরাজের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সর্বপ্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া গিরিশবাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্তিত কবিবর নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি 'সিরাজের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমি প্রথম অভিনয় করি। কবিবর স্বয়ং এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয় শেষে পূজ্যপাদ গিরিশবাবু নবীনচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন, অমর, ইনিই কবি নবীনচন্দ্র। আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। নবীনচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল।" তারপর তিনি এমারেল্ড থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তাঁর ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী দশ বছর বাংলা থিয়েটারে আমরা এই অমর দত্ত তথা ক্লাসিকের অপ্রতিহত গতি লক্ষ্য করি। নানা বিশৃঙ্খলায় মিনার্ভা তখন হৃতশ্রী, বেঙ্গল থিয়েটার চলছে সাবেকী চালে, আর অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় ষ্টার তখন "একটি সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত" হয়েছে—ঠিক এই পরিবেশে নবযৌবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মতো বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে ক্লাসিকের অভ্যুদয় দর্শক মনে একটা সাড়া জাগিয়ে তুললো ; বিশেষ করে ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগান্তকারী গীতিনাট্য 'আলিবাবা'র অভিনয় "থিয়েটারকে একটা সর্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত" করল। এই ক্লাসিক থিয়েটারের অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে থিয়েটার জগতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল...এতদিন বাংলা থিয়েটার জগতের একটা আদর্শস্বরূপ ছিল, অমরবাবু সেসব উল্টাইয়া দিলেন।" সেই 'হৈ-চৈ' কাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে ক্লাসিকের সময় থেকে বাংলা থিয়েটারে কি কি পরিবর্তন এলো, আমরা সংক্ষেপে তার উল্লেখ করবো।

প্রথম কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের অর্থনৈতিক দিকটা

এতদিন পর্যন্ত এক রকম উপেক্ষিতই হয়ে আসছিল। একে তো থিয়েটারে যোগদান করা তখনকার দিনে একটা ঘোরতর সামাজিক মহাপাতক বলেই গণ্য হোত, থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট লোকদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না, তার ওপর বেশির ভাগ লোকই অতি অল্প বেতনে দিনাতিপাত করতো; বড়ো বড়ো দুই একজন অভিনেতার (বিশেষ করে যাঁরা Actor-manager বা অধ্যক্ষ-অভিনেতা ছিলেন) মাইনে ছিল বেশি, তাঁরা বোনাসও পেতেন কিন্তু অধিকাংশ অভিনেতার মাইনে ছিল সামান্যই—এমন কি, "সে সময় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার বেতনের হার ছিল মাসে চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা, অপেরা মাষ্টার পাইতেন ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ, ড্যানসিং মাষ্টারের বেতনও তদনুরূপ; খুব বড় অভিনেত্রীর বেতনও ষাট-পঁয়ষট্টির বেশি ছিল না।" অমরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়ল থিয়েটারের এই দিকটায় সকলের আগে। তিনি নিজে ধনীর সন্তান, তাঁর চাল-চলনই ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা থিয়েটারের বহিরঙ্গের দিকটা তিনি যেন ঢেলে সাজলেন, কিন্তু সকলের আগে থিয়েটারের যারা প্রাণ, সেই অবহেলিত উপেক্ষিত অভিনেতৃগোষ্ঠির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি চিন্তা করলেন এবং তাদের জন্য উচ্চ হারের বেতন এবং বোনাস-বেনিফিটেরও প্রচলন করলেন। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের ফলে ক্লাসিকেরও আয় সেদিন অন্যান্য থিয়েটারের ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেইসঙ্গে থিয়েটারের "হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডের চেহারাও ফিরিল। আগে অতি চোতা কাগজে প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিল বাহির হইত; অমর বাবু উৎকৃষ্ট কাগজে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফটো দিয়া সুন্দর সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিল বাহির করিতে লাগিলেন। হ্যাণ্ডবিল লেখার ভঙ্গীও বদলাইল।...অমরবাবুর পসার জমিয়া গেল। তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতারূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।" কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের একুশ বছরের এক দুঃসাহসী নাট্যানুরাগী যুবক গিরিশ-প্রতিভার মধ্যাহ্ন কালে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সত্যই এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।

অমর দত্ত সুপুরুষ ছিলেন, এবং কিছুটা সুকণ্ঠ ছিলেন। এখন থেকে পরবর্তী দশ বছর বাংলা রঙ্গমঞ্চের তিনিই একমাত্র জনপ্রিয় নায়ক। স্বীয়

পুত্রকে এই গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম গিরিশচন্দ্রের সেদিন কম দুশ্চিন্তা ছিল না। পঁচিশ বছর বাদে বাংলা থিয়েটারে সেদিন সত্যই এক প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাব হয়েছিল। "তিনি ছিলেন কর্মবীর। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জয় সাহস—উন্নতি করিবার এই সকল সদ্‌গুণ তাঁহার যথেষ্টই ছিল।" মোট কথা, বাংলা থিয়েটার ইহার "বাহ্যিক ও আর্থিক সৌষ্ঠব এবং উন্নতির জন্ম" অমর দত্তের নিকট অনেকখানি ঋণী, এ-কথা অপরেশচন্দ্রের মতো ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন। আগে থিয়েটারে যে পুরানো ধারাটা চলে আসছিল তা গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু-শেখরের প্রবর্তিত। গিরিশচন্দ্রের একটা, অর্ধেন্দুশেখরের একটা—এই দুটি ধারা এক হয়ে তখন নাট্যজগৎ পরিচালনা করত। অমরেন্দ্রনাথ সেইটার সংস্কার করে, পাশ্চাত্ত্য রঙ্গজগতে যে ধারায় অভিনয় চলত, সেই ধারাকে বাংলা ছাঁচে ঢেলে, তাকে সেই সংস্কৃত ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, সে-নাট্য-জগতে করলেন ত্রিবেণীসঙ্গম। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে বাংলা থিয়েটারের দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্ম যত্নবান হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের তিনিই প্রথম সংস্কারক। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই Push scene, Cut scene; Box scene, Changeable wings ও প্রেক্ষাপট বা প্রোসিনিয়ম এবং 'যবনিকা' হিসাবে প্রথম Curtain ব্যবহার করা হয়। রঙীন আলো, Spotlight প্রভৃতিরও প্রচলন হয়। ক্লাসিক-পূর্ববর্তী যুগে বাংলা ষ্টেজে কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরি-করা রঙীন কাপড়-মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহৃত হোত। অমরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের প্রবর্তন করেন। আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আয়না, ছবি ইত্যাদি মঞ্চের ওপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতার মুখেই থিয়েটারে এলো নবীনের স্পর্শ। বারুণী পুকুর থেকে সিক্তবসনা রোহিণীকে তুলে নিয়ে এলো গোবিন্দলাল তার জামা-কাপড় ভিজিয়ে, শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাঁতার কেটে উঠতে লাগল ভিজে কাপড় পরে, এই প্রথম মঞ্চের ওপর জলপ্রপাত ও ঝর্ণার

ছন্দে ঝর ঝর করে জল ছিটিয়ে পড়তে শুরু হোল। তবে এর সবই যে সুচারু বা কলাসম্মত হোত, তা নয়। এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তাঁর মৃত্যুর পরে (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকায় লেখা হয়: "If Babu Girish Chandra Ghosh was the father of the Indian Stage and the master dramatist, Babu Amarendra Nath Dutt on whom his mantle fell, was the foster father of the art as applied on the stage."

বাংলা থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি—'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির'; এই দুইখানি পত্রিকা মারফৎ তিনি রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে একটা নিয়মিত আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় থিয়েটার সম্পর্কে কাগজ এই প্রথম। একখানি ছিল সাপ্তাহিক, অপরখানি মাসিক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখককে তিনি সাপ্তাহিক রঙ্গালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন এবং পত্রিকা দুখানির পেছনে তিনি বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ অনেকেই এই কাগজ দুখানির নিয়মিত লেখক ছিলেন। গিরিশযুগের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথা 'নাট্যমন্দিরেই' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নাটক নির্বাচন থিয়েটারের সাফল্যের একটি বড়ো কথা। এই ক্ষেত্রেও অমরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। নাটক নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ, এ-কথা গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে একখানি নাটকও 'মার' খায় নি। অমরেন্দ্রনাথ "বহু নাটকের বহু ভূমিকা খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অভিনয় বা নাটকের ধারা বদলাইয়া উহার নব কলেবর কিছু দিতে পারেন নাই।" শিশিরকুমার বলতেন, "এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা—এই ছিল ক্লাসিকযুগের অভিনয়রীতি।" গীতিনাট্যের একটা নূতন রূপ তিনিই দিয়েছিলেন। "নৃত্যে নূতন ভঙ্গির প্রচলন ও প্রবর্তন তাঁহার থিয়েটারেই হয়।" আবার, দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয় আয়োজনের প্রবর্তকও তিনি। হাইকোর্টের জজ-ব্যারিষ্টার থেকে আরম্ভ করে শহরের শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে অভিনয় প্রদর্শন করার রীতিও ক্লাসিকের যুগ থেকে শুরু হয়। অমরেন্দ্রনাথ

নটের ব্যবসায় করতেন বটে, কিন্তু তিনি সে ব্যবসায়কে স্বীয় প্রতিভাবলে সমুজ্জ্বল ও বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনয়-প্রতিভার আর একটি বৈশিষ্ট্য একই নাটকে দুইটি বিভিন্ন রসসমন্বিত ভূমিকার অভিনয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ ও অটল; চন্দ্রশেখরে প্রতাপ ও ফষ্টর, খাসদখলে মোহিত ও নিতাই ইত্যাদি। তাঁর নটজীবনের দু' একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব।

ক্লাসিক উঠে যাবার পর অমর দত্ত যখন ষ্টারে যোগদান করেন, তখন এইখানে তিনি চন্দ্রশেখর নাটকে প্রতাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। "প্রতাপের ভূমিকাকে তিনি এক নবরূপ, নবপ্রাণ দান করেন। এতদিন ধরিয়া নাটকের নায়ক ছিলেন চন্দ্রশেখর, নায়িকা শৈবলিনী। চন্দ্রশেখর ও দলনীই এতকাল নাটকের প্রাণ ছিল। প্রতাপ নাটকের মধ্যে একটি গৌণ (secondary) চরিত্র মধ্যে গণ্য ছিল, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া এই ভূমিকায় যে অভিনয় করিলেন তাহাতে এই নাটক সম্বন্ধে সকলের ধারণা পাল্টাইয়া গেল—অতঃপর প্রতাপই নাটকের প্রধান চরিত্র হইয়া দাঁড়াইল।"

বাংলায় স্বদেশীযুগের প্রাক্কালে গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' রচনা করেন। মিনার্ভায় এর প্রথম অভিনয় হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১২, ২৪শে ভাদ্র, রবিবার)। মিনার্ভার মালিক তখন মনোমোহন পাড়ে; অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র আর শিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু দুজনেই। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দানিবাবু, করিমচাচার ভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকার, দানসা ফকিরের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর আর তারাসুন্দরী দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেন—আলিবর্দি বেগম ও জহরা। প্রায় এক বছর পরে একই দিনে (২৭শে জানুয়ারি, ১৯০৬) ক্লাসিক ও মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলার' অভিনয় হয়। শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার "মিনার্ভায়—সিরাজদ্দৌলা", "ক্লাসিকে—সিরাজদ্দৌলা"; নাট্যামোদী দর্শকের মনে তুমুল কৌতূহল—এই কৌতূহলের কারণ সিরাজের ভূমিকা। মিনার্ভাতে দানিবাবু সিরাজ, ক্লাসিকে অমর দত্ত। সিরাজ দানিবাবুর নট-জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা। কথিত আছে, এই পার্ট তিনি 'জালিয়ে'

দিয়েছিলেন। এই ভূমিকার অভিনয় করেই দানিবাবু রঙ্গজগতে নায়কের অংশে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে সক্ষম হন। মঞ্চের ওপর তাঁকে সিরাজের বেশে দেখলে বাস্তবিকই সকলেরই বাংলার সেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা স্বতঃই মনে হোত। তিনি সিরাজের অবস্থা ও ভাব অতি সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই একটিমাত্র ভূমিকা অভিনয় করেই দানিবাবু সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করেন। তবে চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে অমরেন্দ্রনাথের দানিবাবুর চেয়ে সুবিধা ছিল অনেক, তাই এই ভূমিকায় সেদিন তাঁরও অভিনয় খারাপ হয় নি। নাটকের শেষাংশে সিরাজের অসহায় অবস্থার প্রকাশভঙ্গিতে অমর দত্তের অভিনয় দানিবাবুর তুলনায় উৎকৃষ্টতর হোত। তবে এই ভূমিকায় তাঁর বেশি সুনাম হয় নি। তেমনি 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় দানীবাবু ও অমর দত্তের অভিনয় তুলনীয়; এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভায়, পরে ষ্টারে। দানিবাবুর বিশেষ খ্যাতি ছিল এই ভূমিকায়। তাঁর ঔরংজেব ক্রূর, ভণ্ড, কুটীল, চক্রী—সে বিবেককে চোখ রাঙিয়ে বোঝায়; অন্যদিকে অমরেন্দ্রনাথের ঔরংজেব, সে ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে বিবেককে চোখ ঠারে না, সে ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। অমরেন্দ্রনাথ-চিত্রিত ভাগ্যবিপর্যস্ত অনুতপ্ত ঔরংজেবকে দেখে দর্শকদের অনেক সময়ে চোখের কোণ থেকে জল মুছতে হোত। তাঁর ঔরংজেব ছিল দানিবাবুর ঔরংজেব থেকে এক সম্পূর্ণ নূতন ছবি। তেমনি গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি' নাটকে শিবাজীর ভূমিকা নিয়ে দানিবাবু ও অমর দত্তের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হোত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'সিরাজদ্দৌলা' গিরিশচন্দ্র প্রথমে ক্লাসিকের জন্যই লেখেন। এই ঐতিহাসিক নাটকই থিয়েটারে দর্শকদের রুচির পরিবর্তন করলো। তখন স্বদেশীর উত্তেজনায় জনমানস স্পন্দিত, দেশের লোকের মন সেই দিকে, সে মনের ক্ষুধা মেটাল 'সিরাজদ্দৌলা'। কিন্তু দেশের এবং দর্শকের রুচির এই হাওয়া-বদল অমরেন্দ্রনাথ ঠিক ধরতে পারলেন না এবং তার সঙ্গে তাল রেখে ঠিক চলতে পারলেন না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ তাই ক্লাসিকের জীবনে শেষ বৎসর। ক্লাসিক উঠে গেল। ১৯১১

খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অমর দত্ত পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন ষ্টার থিয়েটারে। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার সুযোগ পান নি ; তাঁর অকালমৃত্যু (চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়) বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি শোকাবহ ঘটনা। তবে তাঁর ক্লাসিকের স্মৃতি নাট্যামোদী বাঙালি কোনো দিনই বিস্মৃত হবে না। "সে একদিন গিয়াছে যখন বঙ্গীয় নাট্যজগতের সকল সার সার রত্নগুলিই ক্লাসিকে সমবেত হইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের অমন দোর্দণ্ড প্রতাপ—অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতি-গৌরব বুঝি বঙ্গীয় নাট্যজগতে আর কোনো নাট্যশালার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আবার পক্ষান্তরে অমন অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত শোচনীয় পতনও বুঝি কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। গৌরব ও পতনের এমন অতুলনীয় মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বিরল।"

এই সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যজগতের কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক একে একে নিভে গিয়েছে। পুরাতনদের মধ্যে বেঁচেছিলেন দুজন—গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্র তখন রোগশয্যায় আর অমৃতলাল বার্ধক্যে অশক্ত। বাংলা থিয়েটারের বিখ্যাত ট্র্যাজেডিয়ান, করুণরসের অদ্বিতীয় অভিনেতা, নটশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটার বিংশ শতকে পদার্পণ করল। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিতচিত্তে গিরিশচন্দ্র লিখলেন : "যৌবনে যাহাদের সহিত নাট্যক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল একজন। আমাদের অবৈতনিক নাট্যসমাজ যখন 'লীলাবতী' অভিনয়ের উদ্যোগ করে, সেই সময়ে মহেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম দেখা। কৈশোর কাল অতীত, যৌবনে পদার্পিত, গৌরবর্ণ সুঠাম কলেবর মহেন্দ্রলালকে আমি এখনও চক্ষের উপর দেখিতেছি। 'লীলাবতী' নাটকে তাঁহাকে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকা দেওয়া হইল। অভিনয় অন্তে স্বর্গগত দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। 'নীলদর্পণে' পদী ময়রাণী, কৃষ্ণকুমারীতে রাণী, 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার, মহেন্দ্রলালের সকল অভিনয়ই উত্তম হইত। 'বিষাদে' অলর্কের ভূমিকায় তাহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'

বৃহন্নলার অভিনয়ে দ্রৌপদীর প্রতি উক্তি : 'হের দীর্ঘবেণী শঙ্খের বলয়— আমি ধনঞ্জয়, কি হেতু প্রত্যয় কর ?'—এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বলিয়াছি প্রতি ভূমিকায়ই মহেন্দ্রলাল সুদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণে চলিতেছে। কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই। 'ভ্রমরে' কৃষ্ণকান্ত দর্শনে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় মহেন্দ্রলালের প্রদর্শিত স্বভাবছবি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া যান। 'পাণ্ডবগৌরবে'র ভীষ্ম যেন প্রকৃত ভারতগৌরব ভীষ্ম, হাব-ভাব, চলন-ধরণ সমস্তই সেই রামজয়ী ভীষ্মের উপযোগী। মহেন্দ্রলাল যে কেবল অভিনয় কার্যে দক্ষ ছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য অনুভব ছিল মহেন্দ্রলালের স্বভাব সিদ্ধ।''

তারপর বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে একে একে অমৃতলাল মিত্র, (বাংলা থিয়েটারের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় 'চন্দ্রশেখর') মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরনাথ পাঠক— প্রভৃতি গিরিশযুগের শক্তিমান অভিনেতাদের মৃত্যু গিরিশচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৫) অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুতে মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় গিরিশচন্দ্র বললেন : ''বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর খসিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকগত।'' যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুল শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বাংলা থিয়েটারের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যাভিনেতা। তাঁর প্রত্যেক ভূমিকাই ছিল বিস্ময়কর। নাট্যকলার সকল দিকেই তিনি সমান দক্ষ ছিলেন, তবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হাস্যরসেই সমধিক হোত। গিরিশচন্দ্র তাই বলেছিলেন—''প্রতি নাটকে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়—তাঁহার জলধর ('নবীন তপস্বিনী') অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। তিনি একাধারে অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শক্তি ও শিক্ষা ছিল অসাধারণ। আমি অভিনেতা— এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ মুস্তফীসাহেব গর্ববোধ করিতেন। সেই কলাবিদ্যা-গর্বিত, কলাবিদ্যাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই।''

কবি নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুও এই বৎসরের (১৯০৯, ২৩শে জানুয়ারি) ঘটনা। মাইকেল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সকলেই বাংলা থিয়েটারের জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এঁদের প্রত্যেকেরই (হেমচন্দ্র বাদে) রচনা বাংলা থিয়েটারকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত-উদ্ধার' কবিতাটি একসময়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রোগ্রামে স্থান পেয়েছিল। নবীন-চন্দ্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অমরেন্দ্র-নাথ দত্তের নাট্যজীবন তো নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যকে আশ্রয় করেই শুরু হয়েছিল। তেমনি বাংলা থিয়েটারের প্রথম দৃশ্যপটশিল্পী ধর্মদাস সুরের মৃত্যুতে (১৯১১ খ্রীঃ) গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন : "অদ্বিতীয় নাট্যশিল্পী ধর্মদাস অনেকের নিকট পরিচিত নন। আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ। আমরা করতালি পাইয়াছি, প্রশংসা পাইয়াছি। কিন্তু ধর্মদাস অনেক সময়েই নেপথ্যে। সমস্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ই তাঁহার নিকট আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণী।" সে-যুগের নাটকের দৃশ্যপট-সৃষ্টিতে ধর্মদাসের নৈপুণ্য ছিল অবিসম্বাদী। গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' নাটক ও 'চন্দ্রশেখরে'র দৃশ্যপট অঙ্কনে তিনি বাংলা থিয়েটারে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, অনেকের মতে আজো তা অতুলনীয় ও অননুকরণীয় হয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব বৎসরটি (১৯১১ খ্রীঃ) বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। এই বছর সর্বপ্রথম কয়েকখানি নাটকের অভিনয় সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়। সেই নাটকগুলির নাম : বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, আনন্দমঠ ; গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি ; ক্ষীরোদাপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য, বাংলার মসনদ, পলাশির প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার এবং মনোমোহন গোস্বামীর শিবাজী। পরে বহু চেষ্টায় চন্দ্রশেখরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। এই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দানিবাবু। এই জটিল ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয় দেখে নাট্যজগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে গিরিশচন্দ্র পুত্রকে মঞ্চে

সুপ্রতিষ্ঠিত হোতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। শিশিরকুমারের মতে, অভিনয়ে বাস্তবতা এই সময় থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে আশ্রয় করেই দেখা দেয়। চাণক্যের ভূমিকায় দানিবাবু তাই দানিবাবু হোতে পেরেছিলেন। এই বছর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে অমর দত্ত রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের নাট্যরূপ 'জীবনে-মরণে' মঞ্চস্থ করেন। এই বছরই বাংলা থিয়েটারের প্রথম মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুরের মৃত্যু হয়। এই বছর (১৫ই জুলাই) 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকার গিরিশচন্দ্র শেষ অভিনয় করেন। এই বছর মহেন্দ্রনাথ মিত্র মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে বাইশ হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দুর্দিনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে এই বছর ষ্টার থিয়েটারের দরজা বন্ধ হবার উপক্রম হয়; সেই সঙ্কটক্ষণে অমরেন্দ্রনাথ এসে এখানে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পরিচালনায় ষ্টার থিয়েটার শহরের সর্বপ্রধান থিয়েটার বলে পরিগণিত হয়।

গিরিশযুগে বাংলা থিয়েটারে দু'রকম অভিনয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; একটি গিরিশ-পদ্ধতি, অপরটি মুস্তফী-পদ্ধতি। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য ছিল অস্বাভাবিক সুর আর দ্বিতীয়টি ছিল সুরবর্জিত স্বাভাবিক অভিনয়। অভিনয়ে naturalism-এর প্রবর্তক অর্ধেন্দুশেখর। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নিজের বক্তব্য এই: "অভিনয় স্বভাবের ছবি। স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, আর নট ভাবপ্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন। অনেকের ধারণা গদ্যে যাহা রচিত হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি, সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাবপ্রকাশ করি, অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশি মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়। কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নয়।" আর অর্ধেন্দুশেখর বলতেন: "বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি (যদি ঐ নামের কেউ

থাকেন)। রঙ্গমঞ্চ ঐ পৃথিবীর অনুকরণে মানুষের সৃষ্টি। এখানে জগতের সুখদুঃখময় ঘটনার ছায়া দেখাইয়া আমরা আনন্দ উভভোগ করি। দর্শকেরও আনন্দ, অভিনেতারও আনন্দ। আমি নরহরি ভট্টাচার্য। থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করিলাম। নানা মণিরত্নখচিত রাজপরিচ্ছদ, নানা রত্নজড়িত রাজমুকুট, পদে বহুমূল্য (সত্যকার বহুমূল্য নহে) পাদুকাযুগল। দর্শককে কত হাসাইলাম, কত কাঁদাইলাম—আমার রাজ্য গেল, ঐশ্বর্য গেল, আত্মীয়বন্ধু স্ত্রী-পুত্র সবই গেল, শেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলাম। শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমি যে নরহরি, সেই নরহরি। ইহাই অভিনয়। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না; যে অংশ অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না।" কিন্তু মুস্তফীসাহেব নিজে ছিলেন একজন সচেতন অভিনেতা (conscious artist)—মঞ্চে দর্শক অর্ধেন্দু-অভিনীত ভূমিকার ভেতর দিয়ে মানুষ অর্ধেন্দুকেই বেশি করে দেখত এবং দেখে আনন্দ পেত।

এই যুগের অভিনেত্রীদের মধ্যে সুকুমারী ও বিনোদিনী অর্ধেন্দুর দুইটি সৃষ্টি। বাংলা থিয়েটারে সুখ্যাতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করবার গৌরব সুকুমারী দত্তের (গোলাপ); ইনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের রাজা বসন্তরায় নাটকে (কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ) সুরমার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ক্ষেত্রমণি, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা, তিনকড়ি, প্রকাশমণি, কুসুমকুমারী—গিরিশযুগের এঁরাই ছিলেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। তারাসুন্দরী গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতায় নাট্য-সম্রাজ্ঞীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয়েও তারাসুন্দরী পরিণত বয়সে কম প্রতিভার পরিচয় দেন নি। তিনকড়িও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষানৈপুণ্যে সেদিন মঞ্চে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন; তাঁর জনা ও লেডি ম্যাকবেথ অবিস্মরণীয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর কতকগুলি ভূমিকা ছিল তিনকড়ির নিজস্ব; তিনি ছাড়া সেগুলির অভিনয় দুর্ঘট ছিল। কুসুমকুমারীও তেমনি গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমর দত্তের নাটকসমূহের কয়েকটি ভূমিকা নিজস্ব বলে দাবী করতেন; যেমন—পাণ্ডবগৌরবে উর্বশী, জনায় মদনমঞ্জরী, আলিবাবায় মর্জিনা, ভ্রমরে ভ্রমর; সেইসময়ে কুসুমকুমারী ভিন্ন আর কারো পক্ষে যেন এই ভূমিকাগুলির অভিনয় শোভা পেত না। পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রারম্ভে 'আলমগীর' নাটকে উদিপুরীর ভূমিকায় এঁকে আমরা দেখেছি। গিরিশযুগের মাঝামাঝি অথবা শেষভাগে যাঁরা মঞ্চে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হরিমতি, রাণীসুন্দরী, মৃণালিনী, বসন্তকুমারী, হেমন্তকুমারী, সরোজিনী, চারুশীলা, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি নবীনা অভিনেত্রীদের অনেকেই শিশিরযুগে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে চারুশীলা। আর গিরিশযুগের অভিনেতাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ঘোষ, সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচি, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নাট্যকলাকুশল শিক্ষক পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, নৃত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্টাপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন গোস্বামী বি. এ, চুণিলাল দেব, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মন্মথনাথ পাল, হাস্যাভিনেতা কার্তিকচন্দ্র দে, শশীভূষণ বসু (অমৃতলালের লুত্র), রাধাকিশোর কর, লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও স্মরণীয়; এঁদের মধ্যে অনেকেই শিশিরযুগ পর্যন্ত মঞ্চে অভিনয় করেছেন; কেউ-কেউ (যেমন হীরালাল বাবু, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, গোপালদাস ভট্টাচার্য) শিশিরকুমারের থিয়েটারেই যোগদান করেছিলেন।

গিরিশযুগের নাট্যকার হিসাবে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, মনোমোহন গোস্বামী, রাজকৃষ্ণ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল রাজকৃষ্ণ ও অতুল মিত্র নাট্যকার হিসাবে সমসাময়িক; আর ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই বিংশ শতকের প্রথম যুগের নাট্যকার।

প্রহসনে অমৃতলাল অদ্বিতীয়, এ-কথা গিরিশচন্দ্র বলেছেন। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় একাধারে নাট্যকার ও বাংলা থিয়েটারের অন্যতম সংগঠক; 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। কিন্তু পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ক্ষীরোদপ্রসাদই ছিলেন নাট্যজগতের নাট্যসম্রাট। রঙ্গনাট্য রচনায় তাঁর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা—'আলিবাবা'য় তিনি এর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অতুলবাবু খুব ভালো অপেরা লিখতে পারতেন—'শিরী ফরহাদ' নাটকে তার পরিচয় আছে। এই সময়কার আর একজন নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ইনি মথুর সাহার যাত্রার দলের পালা বাঁধতেন। এঁরই ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক 'জয়দেব' গিরিশ-পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা মঞ্চের একখানি বিখ্যাত নাটক। গিরিশযুগের জনপ্রিয় যাত্রার দলগুলির মধ্যে পাঁচটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা—মতিলাল রায়ের যাত্রা, মথুর সাহার যাত্রা, ভুবণদাসের যাত্রা, ত্রৈলোক্য পাইনের যাত্রা ও ত্রৈলক্ষ্যতারিণীর যাত্রা; শেষেরটি মহিলা পরিচালিত। তখন থিয়েটারের প্রভাব গিয়ে পড়েছে এইসব যাত্রাদলের ওপর, তাই গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত এইসব যাত্রার পালায় তৎকালীন বাংলা নাটকেরও ছায়াপাত হয়েছিল। গিরিশযুগের থিয়েটারের ধারাটা প্রধানতঃ ছিল পৌরাণিক ও গীতিনাট্য-প্রধান। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ছিলেন ভক্তিরস-মূলক নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত—সেই রস তাঁর একাধিক নাটকের ভেতর দিয়ে বাংলা থিয়েটারে এক যুগ ধরে প্রবল বেগে বয়ে গেছে। বাংলা থিয়েটারের প্রথম মহিলা নাট্যকার স্বর্ণকুমারী; তাঁর প্রথম নাটক 'ফুলের মালা' বা 'রাজা গণেশ'। এর প্রথম অভিনয় হয় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা থিয়েটারে প্রথম সামাজিক নাটক এলো ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা', বাংলা থিয়েটারের প্রথম সামাজিক নাটক। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল এবং ষ্টার থিয়েটারে এর প্রথম অভিনয় হয়। "এই সরলা নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে। সরলার অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমানভাবেই চলিয়াছিল। সামাজিক নাটকের এই আদর দেখিয়া ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রকে একখানি

সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন: এই অনুরোধের ফল—'প্রফুল্ল'।"

কিন্তু গিরিশযুগের বাংলা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পরেই উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকাবলী। বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপই বাংলা ষ্টেজের ধারা ফিরিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই বাংলার নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সের যুগ আনিল। বাংলার সাহিত্যেও যেমন, বাংলার নাট্যশালায়ও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রই রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক। প্রায় তিন-পুরুষ ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালি দর্শককে সমানভাবেই আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে।···এ পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিম-চন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।···রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে এত আদর, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রায়ই ড্রামাটিক এবং এই ড্রামাটিক বলিয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের অনুকূল। রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে, প্রায় সব থিটোরেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখনই দর্শক ও অভিনেতারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমের প্রায় সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন।" অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনা কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে অতুলকৃষ্ণের 'কপালকুণ্ডলা', অমৃতলালের 'চন্দ্রশেখর' ও অমরেন্দ্রনাথের 'ভ্রমর' প্রসিদ্ধ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ প্রদানে বিহারীলালের তুলনায় গিরিশচন্দ্রই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা ও সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপই বাংলা

থিয়েটারে সেদিন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আবার এই তিনখানির মধ্যে চন্দ্রশেখরের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

গিরিশযুগের থিয়েটারের একটা মোটামুটি চিত্র আমরা দিলাম। এইবার গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। বাংলা নাট্যশালার সৃষ্টি ও পুষ্টিবিধানে গিরিশ-প্রতিভা তিন দিক দিয়ে সক্রিয় ছিল; নাট্যকার হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে এবং নাট্যশিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসাবে, এ-কথা আগেই বলেছি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ Actor-manager এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে (দানিবাবু) আমরা কিছুকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি। মঞ্চে নাট্যকার-রূপে গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ হোল ১৮৮০ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাঙালির সামাজিক জীবনে, ধর্মজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে রঙ্গমঞ্চ থেকে নাটকের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্র যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার তুলনা নেই। নাট্যকাররূপে তিনি কাজ করেছিলেন কম-বেশি পঁচিশ বছর, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন শতাবধি নাটক। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি মুখ্যতঃ মঞ্চধর্মী। অভিনয়ের উপযোগী নাটক না পেয়ে অবশেষে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক রচনার সঙ্কল্প করেন, অর্থাৎ একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে একাধিক থিয়েটারের জন্ম নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু যুগধর্মকে অবহেলা করে তিনি নাটক লেখেন নি। বাংলাদেশে যখন যে সামাজিক বা রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক আন্দোলন জেগেছে, তাঁর সর্বতোমুখী নাট্যপ্রতিভা তার কোনটিকেই উপেক্ষা করে নি—মঞ্চে তিনি তা প্রতিফলিত করেছেন বিভিন্ন নাটকের ভেতর দিয়ে। গিরিশযুগের থিয়েটারের অগ্রগতির মূল কারণ তো এইখানেই। "দেশের হৃদয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া যখনই প্রয়োজন হইয়াছে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে ভাবের স্রোতোমুখ তখনই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।" কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম দর্শকের দৃষ্টি ও রুচি বদলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। পৌরাণিক নাটকে দর্শকের যখন অরুচি হোল অমনি গিরিশচন্দ্র লিখলেন

'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি অপূর্ব নাটক। দর্শক চাইল সামাজিক নাটক, অমনি লিখলেন 'প্রফুল্ল', 'বলিদান'। তেমনি বিংশ শতকের প্রারম্ভে স্বদেশীযুগের রোমাঞ্চিত দিনে দর্শকচিত্ত কি ধরণের নাটক হোলে পরিতৃপ্ত হবে, তা অনুমান করতে গিরিশচন্দ্রের বিলম্ব হয় নি। লিখলেন 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম' ও 'ছত্রপতি'। অবশ্য বাংলা থিয়েটারে স্বদেশীভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'ও সমান মর্যাদার দাবী করে। বাংলা মঞ্চ তথা নাট্যসাহিত্যে 'প্রতাপাদিত্য' একখানি অবিস্মরণীয় নাটক। ভাল নাটকই থিয়েটারের প্রাণ—এই সত্যটি গিরিশচন্দ্র প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তখনকার দিনে যে কয়েকটি পেশাদার মঞ্চ তাঁর সহযোগিতায় পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, তার প্রত্যেকটার পেছনে ছিল গিরিশচন্দ্রের নাটক। নাটকের সঙ্গে ছিল শিক্ষাদান। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান বাংলা নাট্যশালার এক অক্ষুণ্ণ গৌরবের অধ্যায়। তখনকার দিনের একাধিক খ্যাতিমান নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সমালোচক গিরিশচন্দ্রের রিহার্সালের আসরে তাঁর শিক্ষাদানের নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, গিরিশচন্দ্রের যুগই বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। পারিবারিক রঙ্গমঞ্চের যুগ তখন শেষ হয়ে এসেছে। এতকাল যা ছিল কলকাতার নাগরিক সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত সমাজশ্রেষ্ঠের রুচি ও আস্বাদনের সীমায় আবদ্ধ, যা তাঁদেরই অর্থানুকুল্যে চলে আসছিল, জাতির সেই নাট্যপ্রয়াসকে বৃহত্তর সমাজজীবনের মধ্যে, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি সন্তানের এই কীর্তি বাংলা নাটাশালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনো দিনই মুছবার নয়।

॥ ৩ ॥ নবযুগের পূর্বাভাস

১৮৯৯। ২৭ শে জানুয়ারি।

বাংলার নাটকাভিনয়ের ইতিহাসে মনে রাখবার মতো একটি তারিখ। কলকাতার কয়েকটি কলেজের গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা মিলে শেক্‌স্‌পিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' ও মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' নাটক অভিনয় করলেন এইদিন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ছাত্ররা মিলে 'হ্যামলেট' অভিনয় করেছিলেন। তারপর এই পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে কলকাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আর কোনো নাট্যাভিনয় হয় নি, কিংবা তার কোনো প্রচেষ্টাও হয় নি। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এইসময়ে অভিনয় বা আবৃত্তি বিরল হোয়ে এসেছে। বস্তুতঃ, উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ কোনো লক্ষণই দেখা যেত না। ছাত্রসমাজের এই অভাব দূর করবার জন্য এই শতকের নবম দশকে শহরের তৎকালীন ছাত্র-সুহৃৎ মনীষীরা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁদের সেই চিন্তার পরিণত রূপ হোল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট, প্রথমে যার নাম ছিল "Society for the higher training of youngmen"। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনাকালে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমকালীন বাংলার বরেণ্য সন্তানগণ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উন্নতিবিধানের জন্যই বিশেষভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। এখন ইনষ্টিট্যুটের যে সুন্দর ভবন দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাকালে অবশ্য তার নিজস্ব

ভবন ছিল না। সংস্কৃত কলেজের আগের ইমারতের পশ্চিমদিকে কতকগুলি ঘরে হিন্দু স্কুল হোত আর পূর্বদিকের ঘরে ছিল ইনষ্টিট্যুট। ইনষ্টিট্যুট বলতে তখন ছিল একটি হলঘর, সেখানে সভা-সমিতি আর নাটকাভিনয় হোত। দক্ষিণে গোলদীঘি। এই প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যশাখার প্রথম সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের প্রভাব অবিস্মরণীয়। "শাস্ত্রিক বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যার মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র" থেকেই আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি বাংলার যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। ইনষ্টিট্যুটের সাংস্কৃতিক জীবনে ঐ ২৭শে জানুয়ারি তারিখে যে নাট্যানুষ্ঠানটি হয় তারই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইনষ্টিট্যুটের সভ্যদের এই প্রথম অভিনয় এবং সেই কারণেই এতে সমারোহ ছিল। মেঘনাদবধের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভিনয় পরিচালনা করেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই অভিনয়ের উদ্বোধন করবার সময় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "It was a matter of sincere congratulation that for the first time in the history of the Bengali drama so many young graduates and undergraduates of Calcutta had come forward to take part in a performance like this." বক্তৃতার শেষে রাজা প্যারীচাঁদ অজ্ঞাতসারে একটা আশ্চর্য রকমের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "I believe that these performances will in future determine and guide the National stage." এই ভবিষ্যদ্বাণীর পঁচিশ বছর পরেই দেখা গেল, বাংলা সাধারণ নাট্যশালার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন ইনষ্টিট্যুটেরই একজন সদস্য—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম. এ.; এবং তাঁরই প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সাধারণ নাট্যশালার যে রূপান্তর ঘটলো, সে তো আমরা প্রত্যক্ষই করেছি। সেদিনের সেই স্মরণীয় অভিনয় সম্পর্কে ইনষ্টিট্যুটের হীরক-জুবিলী স্মারক-গ্রন্থে বলা হয়েছে: "সন্ধ্যা ছটায় অভিনয় আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় রাত্রি আটটায়।

অভিনয় এতদূর উপভোগ্য হয়েছিল যে তা দেখে প্রীত হয়ে বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ইনষ্টিট্যুটের সভ্যগণকে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে এক উদ্যান-সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানালেন। তখনকার দিনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহামিলন ক্ষেত্র ছিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট।...ইনষ্টিট্যুটের অভিনয় দেখবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। সদস্যগণ কেবল বাংলা নাটকের অভিনয় করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; শেক্‌স্‌পিয়ারের একাধিক নাটকও এখানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং রসপিপাসু ইংরেজ-দর্শকদেরও মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়।"

বাংলার প্রথম জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারকে আমরা হিন্দু মেলার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি বলে গণ্য করতে পারি। সেদিনকার নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক—সবই যেন হিন্দুমেলার জাতিপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেই চেতনা থেকেই পরবর্তীকালে এক থেকে একাধিক নাট্যশালা শহরে গড়ে উঠেছে; মফঃস্বলে ঘুরে বেড়িয়েছে ভ্রাম্যমান নাট্যাভিনয়ের দল—এমনি করেই সেদিন বাঙালির মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল একটা Théatre spirit বা রঙ্গালয়-প্রীতি। প্রথমে হিন্দুকলেজ, তার অনেক পরে হিন্দুমেলার ভাবপ্রেরণাকে আমরা বাংলা থিয়েটারের মূল প্রেরণা বলে স্বীকার করে নিতে পারি। এই প্রেরণার সঙ্গে যখন গিরিশ-প্রতিভার সংযোগ সাধিত হোল, তখন বাংলার সাধারণ থিয়েটার পঁচিশ বছরের মধ্যে কী আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল তার একটা মোটামুটি চিত্র আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে দিয়েছি। কিন্তু গিরিশযুগের থিয়েটারের একটা বড়ো ত্রুটি এই ছিল যে, দেশের যথার্থ বিদগ্ধ ও শিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে এর সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। নানা রকমের আবিলতাও তখন এসে গিয়েছিল বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এবং তার ফলে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা থিয়েটারের স্রোতোধারা যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই উনিশ শতকের শেষভাগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের আবির্ভাব এবং তার তরুণ সদস্যদের বহুমুখী সাংস্কৃতিক উদ্যম, বিশেষ করে তাঁদের ঐকান্তিক নাট্যপ্রয়াস; বাংলার সংস্কৃতি তথা নাট্যজগতে সত্যই এক নবযুগের সূচনা করে দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রসমাজ তখন থেকেই ইনষ্টিট্যুটের ভাবধারায়

নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল; ইংরেজি ও বাংলা নাটকাভিনয়ের ভেতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ছাত্রসমাজের সাংস্কৃতিক উদ্যম যে পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটারকে আবিলতামুক্ত করে একটা নতুন রূপ, নতুন ঐতিহ্যমণ্ডিত করে তুলেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং হিন্দুমেলার মতোই এই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের নাট্যপ্রয়াস থেকেই বাংলার বিংশ শতকের নাট্যজগতে সংস্কারযুগের আরম্ভ।

মুখ্যত: অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ইউনিয়নের আদর্শেই এই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের মূলে ছিলেন বিশেষ করে একটি মানুষ। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বনামধন্য বিদগ্ধ অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। সেদিন কলকাতার ছাত্রসমাজের ওপর তাঁর কী অসামান্য প্রভাব ছিল, ছাত্রদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানে তাঁর কী অপরিসীম আগ্রহ ছিল, সে-কথা শিশিরকুমারের মুখে বহুবার শুনেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'Prof. Benoyendra Nath Sen wielded a great influence among the general body of the students in Calcutta .. He was for many years Honorary Secretary of the Calcutta University Institute and here his influence was very great. He quickened its life and enlarged its activities". শিশিরকুমারও বলতেন, "তখন ইনষ্টিট্যুটে আমাদের আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র তো ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ বাবু; তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, ছাত্রজীবনে তা আর কারো কাছ থেকে পাই নি। নাটক ও রঙ্গমঞ্চকে তিনি যে কতখানি ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায়—"Student life and the stage".—এ-বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ১৯০১ সালে। এ-বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য যে কত গভীর ছিল, তা তাঁর এই বক্তৃতাটি পড়লেই জানা যায়।" *

---

* এই কথা শিশিরকুমার বলেছিলেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত বিনয়েন্দ্রনাথের সাম্বাৎসরিক স্মৃতি-সভায়।

১৯০৮। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুসনের (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) ছাত্ররা 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয় করলো। কলকাতার কলেজের ছত্রেদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের নতুন উন্তম আমরা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই লক্ষ্য করি। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সেই সময়ে কলকাতার প্রায় সব কলেজে ছেলেরা বছরে একটা-দুটো করে অভিনয় করত—বাংলা আর ইংরেজি দুই ভাষাতেই। ছেলেরা শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকই সাধারণত অভিনয় করত আর কখনো কখনো আধুনিক ইংরেজ নাট্যকারের দু-একটা হাল্কা প্রহসনও বাদ যেত না। আর গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—এঁদেরই বাংলা নাটক অভিনয় করা হোত।" শেক্‌সপিয়ারের নাটক 'জুলিয়াস সিজার'; এর সাজ-পোষাক সবই রোমান যুগের হওয়া দরকার। জেনারেল এসেমব্লিজের উৎসাহী ছাত্রগণ শিশিরকুমারের নেতৃত্বে (শিশিরকুমার তখন এই কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র আর সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন) কিভাবে এই অভিনয় সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ সুনীতিবাবু এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জন্য সাজ-পোষাক কলেজের ছাত্ররা (বিশেষ করে আমি ও আমার দুজন সহপাঠী) নিজেরাই রোমান ইতিহাস পড়ে যতদূর সম্ভব রোমান যুগের মত করে তৈরি করে নিয়েছিল। ব্যাশকারী হয়ে নেপথ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আমি। শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। পোষাক দেখে হয়ত সমঝদার লোকে হেসে ছিলেন, তবে আমাদের উৎসাহকে তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেন নি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল শিশিরের ব্রুটাসের অভিনয়। আমরাও দর্শকের সারিতে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য আবৃত্তি ও অভিনয় দেখেছি।"

কলেজে তিনি 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে এ্যান্টনিওর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, নরেশ মিত্র শাইলকের। শিশিরকুমার তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাফ কলেজ ও জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন মিলে গিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে রূপান্তরিত হয়। মিঃ এ. বি. ওয়েন ছিলেন স্কটিশের প্রথম অধ্যক্ষ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শিশিরকুমারকে আমরা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের মেরিগোল্ড ক্লাবের জুনিয়র সদস্যতালিকাভুক্ত দেখতে পাই। ছাত্রদের অভিনয় ব্যাপারে তিনজন মনীষির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়: স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই সময়ে অভিনয়-প্রীতি প্রকৃতপক্ষে জাগিয়ে তুলেছিলেন অধ্যপক বসু, আবার তিনিই ছিলেন তখনকার ছাত্রদের প্রধান নাট্যশিক্ষক; ইনষ্টিট্যুটের নাট্যবিভাগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তিনিই। এঁর সম্পর্কে সুনীতিবাবু লিখেছেন: "আমাদের মাষ্টারমশাই অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু একাধারে ছিলেন শিক্ষক ও নাট্যাচার্য। মন্মথবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, কিন্তু কলেজে আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন। নাট্যাভিনয় ও নাটকরচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল। আমাদের ছাত্রদের অভিনয় ব্যাপারে অতি সহজেই তিনি শিক্ষাগুরুর আসন পেয়েছিলেন। তাঁরও ছাত্রদের আপন করার শক্তি ছিল আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই বিষয় ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপকের মর্যাদার সঙ্গে নাট্যগুরুর মর্য্যাদা দুই-ই তাঁতে মিলে গিয়েছিল।" শিশিরকুমার নিজেও কত সময়ে বলতেন—"গুরু বলে যদি কাউকে মানতে হয় তবে ঐ একটি লোককে, ঐ আমাদের মাষ্টারমশাইকে।" ইনষ্টিট্যুটে গরীব ছাত্রদের বই কিনে আর মাইনে ও পরীক্ষার ফী দেবার জন্য সাহায্য করতে একটি অর্থ ভাণ্ডার খোলা হয়—'Students fund'। ইনষ্টিট্যুটের সদস্যারা স্টুডেন্টস ফাণ্ডের টাকা তুলবার জন্য টিকিট বিক্রয় করে নাটকাভিনয় করবার রীতি প্রবর্তন করেন এবং এই সময় থেকেই "সাধারণত ইংরেজি নাটকের অভিনয় একেবারে উঠে না গেলেও বাংলা নাটকের দিকে ঝোঁক পড়ে; আর ক্রমে ইংরেজি নাটকের অভিনয় ধারা একরকম উঠেই যায়। ইনষ্টিট্যুটে অভিনয়ের ধারা গোড়া থেকেই একটু উঁচু শ্রেণীর হোত। এর কারণ ছাত্র-সদস্যদের রুচি ও সাহিত্যজ্ঞান বেশ উচুদরের ছিল এবং এর ফলেই তখন তাদের হাতে অভিনয় বেশ একটা মনোজ্ঞ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলে রাখা দরকার। অনেকের মনেই এই ধারণা

আছে যে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে তখন বুঝি শুধু অভিনয়ই হোত, আর কিছু হোত না। কথাটা ঠিক নয়। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা যাঁরা করেছিলেন, যাঁরা এর পরিচালনার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্যর গুরুদাস এবং অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বরেণ্য মনীষিরা বাঙালি তরুণদের মনে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সংস্কৃতির অনুশীলনের ভেতর দিয়ে। কলেজের যেসব ছাত্র এখানে তখন সদস্য হিসাবে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক অনুশীলন কী পর্যায়ে উঠেছিল তা আজকের ইনষ্টিট্যুটের সভ্যদের কর্মোদ্যোম দেখে ধারণা করা যাবে না। সেকাল আর একালের ইনষ্টিট্যুটে 'আশমান-জমিন্ ফারক' বললেই চলে। একটা বছরের পরিচয় এখানে দিচ্ছি। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারির তালিকায় দেখতে পাই গ্রন্থাগার, রোয়িং, সামাজিক অনুষ্ঠান, ডিবেটিং, খেলা-ধূলা, পত্রিকা ও সভা-সমিতি প্রভৃতি এতগুলি বিভাগের ভেতর দিয়ে ইনষ্টিট্যুটের সভ্যদের কর্মোদ্যম প্রকাশ পেয়েছিল। প্রত্যেকটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আণ্ডার-সেক্রেটারিকে তাঁর বিভাগের এক বছরের কাজের রিপোর্ট তৈরি করতে হোত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি ছিলেন অমূল্যরতন চক্রবর্তী (লাইব্রেরি) ; পান্নালাল মুখোপাধ্যায় (রোয়িং) ; নরেশ মিত্র ও রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সামাজিক অনুষ্ঠান) ; প্রফুল্লচন্দ্র ঘটক (ডিবেটিং) ; অমল হোম (সভা-সমিতি) ; অঘোরনাথ ঘোষ (খেলাধূলা) ; সুধীন্দ্রকুমার হালদার (স্টুডেন্টস ফাণ্ড) এবং শিশিরকুমার ভাদুরী (পত্রিকা)। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছেন। পত্রিকা বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারিরূপে সে-বছর (১৯১১-১২) শিশিরকুমার যে রিপোর্টটি রচনা করেছিলেন, ইনষ্টিট্যুটের তদানীন্তন সম্পাদক অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন তার খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, "অল্প কথায় যে কত সুন্দর রিপোর্ট রচনা করা যেতে পারে, শিশিরের এই লেখাটি তারই একটি চমৎকার নিদর্শন।" শিশিরকুমার বিনয়েন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপক সেনের প্রতি শিশিরকুমার আজীবন অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

শিশিরকুমারের লেখা সেই রিপোর্টের একটু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম:

"Our Magazine had a chequred career in the beginning of the last session. When charge was made over to me in November, the October Number was still overdue and could not be brought out till late in the same month. Thus we had to make a single issue of the November and December numbers which made its appearance in the last week of December. The excitement of the Imperial visit to our city made us lay aside all work in the beginning of January and it is not to be wondered therefore that the January number was belated. Since February, however, things have looked up a bit and we are now in quite a regular footing. But it would be very difficult to maintain this regularity if our contributors do not look sharp. If the magazine wanes in quality or comes out late, the responsibility lies with those of us who having the gift of a facile pen would not use it for our benefit. I would take this opportunity therefore to make a strong appeal to our student members of the Institution and to all students of the University to try their best to uphold the traditions of our magazine by sending in to us as many articles and notes as they can. The Magazine had published this year articles of great variety...There has also appeared witty sketches, accounts of travels, Institute and College notes and reviews.

Sisir Kumar Bhaduri, B.A. *

* *The Calcutta University Magazine, Vol. XXI, No 8, Aug. 1912.*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে তখন শুধু অভিনয় বা আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানই হোত না, সভ্যদের মধ্যে ছিল একটা সর্বতোমুখী সাংস্কৃতিক প্রয়াস। আর এঁদের মধ্যে শিশিরকুমারই ছিলেন সবচেয়ে দেদীপ্যমান—এ-কথা আমি শ্রীঅমল হোম প্রমুখ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছ থেকেই শুনেছি। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে পরীক্ষায় কৃতিত্ব হয়ত অনেকেই তাঁর চেয়ে বেশি দেখিয়েছেন, কিন্তু সেই তরুণ বয়সে শিশিরকুমারের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সহজ স্ফুরণ সকলকেই চমৎকৃত করেছিল। ইনষ্টিট্যুটের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর ওপর যে একটা সংগঠনী প্রভাব (formative influence) বিস্তার করেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ইনষ্টিট্যুটের অভিনয়েই শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র-সদস্যরা 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ করলেন। শিশিরকুমার এই নাটকে ক্লডিয়াস ও হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা—এই দুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইনষ্টিট্যুটে এই তাঁর প্রথম অভিনয়। "তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইনষ্টিট্যুটে তাঁর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর নবীনচন্দ্র সেনের প্রসিদ্ধ কাব্য, 'কুরুক্ষেত্র' অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। কুরুক্ষেত্রের নাট্যরূপ দেন শ্রীমন্মথমোহন বসু; অভিনয়-শিক্ষকও তিনি ছিলেন। এই নাটকে অভিমন্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিশিরকুমার তাঁর সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে সকলকে মুগ্ধ করেন। শিশির-যুগের বাংলা থিয়েটারের অন্যতম প্রসিদ্ধ অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র এই নাটকেই একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় ('দুর্বাসা') প্রথম আত্মপ্রকাশ করে স্বকীয় অভিনয়-প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ছাত্র সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য এই বছরের ১১ই অক্টোবর পুনরায় কুরুক্ষেত্রের অভিনয় হয়। এই-সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের একটি অভিনয় প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার লিখেছেন: "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিয়ে তিনি সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করালেন—কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। শাস্ত্রী মহাশয় নিজে ছিলেন ইতিহাসবিদ্। তাই প্রাচীনকালের পোষাক, পরিচ্ছদ

প্রভৃতি সংস্কৃত বই থেকে ও প্রাচীন নক্সা ও চিত্র থেকে ঠিক করে ঐ নাটকের অভিনয়ের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারত আর সাঁচীর পাগড়ির নকলে সেলাই-করা পাগড়ি, ডাকের সাজের নানারকম গয়না, বিভিন্ন রঙিন কাপড়ের জরিপার বেনিয়ান আর আংরাখা—এসব তিনি করিয়েছিলেন। তাঁর প্রযোজনায় এইরকম একটা নূতন সুরুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের অভিনয় বিভাগের সদস্যরা বিশেষভাবে উপকৃত হন।”

১৯১০-এ ইনষ্টিট্যুটের সদস্যরা গিরিশচন্দ্রের ‘বুদ্ধদেব’ নাটক অভিনয় করলেন। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার। আবৃত্তিপ্রধান এই ভূমিকায় তাঁর মধুর উদাত্তকণ্ঠের আবৃত্তি সকলকেই মুগ্ধ করে। সে আবৃত্তি ছিল ভাব ও রসের সুষ্ঠু প্রকাশ। শিশিরকুমারের অভিনয় যে এত রসোজ্জ্বল হোত তার একটা বড়ো কারণ এই যে, তাঁর অভিনয়-প্রতিভা সর্বপ্রথম আবৃত্তির ভেতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়েছিল, আবার যেমন-তেমন আবৃত্তি নয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সেই কাব্যকে আশ্রয় করে শিশিরকুমারের অনুপম কণ্ঠের ছন্দ-সঙ্গীতময় আবৃত্তি রসজগতের এক দুর্লভ সৃষ্টি। সে দুর্লভ রসসৃষ্টি উপভোগ করবার সুযোগ যাঁদের কখনও হয় নি তাঁদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। ‘বুদ্ধদেব’ নাটকেও ক্ষুদ্র একটি ভূমিকায় নরেশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ইনষ্টিট্যুটের সভ্যবৃন্দের আর একটি স্মরণীয় নাট্যপ্রয়াস—‘চন্দ্রগুপ্ত’। এ অভিনয়ের তারিখ ছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর। তখন সাধারণত প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বরেই অভিনয় হোত। ইনষ্টিট্যুটের হীরক-জুবিলি স্মারক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: ‘অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন ইনষ্টিট্যুটের একজন অতি উৎসাহী অবর সম্পাদক। তিনি প্রস্তাব করেন গ্রীক সৈন্যের পোষাক-পরিচ্ছদ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নিজেরাই তৈরি করবেন। সভ্যগণের ভিতর যেন উৎসবের ন্যা বয়ে চললো। সুনীতিবাবু ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পুরানো ব ঘাটতে। তার সহকর্মীগণের সহায়তায় প্রস্তাব কার্যে পরিণত হোতে না। গ্রীক সৈন্যের বিচিত্র সাজ-সজ্জা প্রস্তুত হোল। স্তর

গুরুদাস তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের নব রূপায়ন দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। সেদিন চাণক্যের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন ক'রে শিশিরকুমার ভবিষ্যৎ বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উচ্চমান স্থাপন করেন।" ইনষ্টিট্যুটের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের এই অভিনয় প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু লিখেছেন: "চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর প্রাচীন গ্রীক পোষাক মায় যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম প্রভৃতি পুরানো ছবি ও ভাস্কর্য দেখে তৈরি করা হয়। শিশিরকুমার ও তাঁর সহ-অভিনেতাদের কৃতিত্ব এবং পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য—এই দুইয়ে মিলে এই অভিনয়কে বাংলা দেশে নাট্যকলার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উঁচু জায়গায় তুলে দিয়েছিল। শিশিরকুমার চাণক্য, নরেশ মিত্র কাত্যায়ন, রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দর ভূমিকায় নেমেছিলেন।" এই অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি বলেছিলেন: "শিশিরকুমারের চাণক্য বুদ্ধিদীপ্ত এক অসাধারণ অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি, এই অভিনয় তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে—ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" পেশাদার রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রথম অভিনয় এর প্রায় দু'মাস আগের ঘটনা। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে দানিবাবু চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে নাট্যজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। কথিত আছে, শিশিরকুমার দানিবাবুর কাছে গিয়ে চাণক্যের ভূমিকাভিনয়ের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং পাবলিক ষ্টেজের চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ও তিনি কয়েকবার দেখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, গিরিশোত্তর যুগের শক্তিমান নট দানিবাবু এবং বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভাবান নট শিশিরকুমার প্রায় একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন মঞ্চে বিংশ শতকের এক বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকারের একখানি বিখ্যাত নাটকের একই চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'চাণক্যের' ভূমিকাটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে দানিবাবু ও শিশিরবাবুর অভিনয়কে উপলক্ষ করে তাই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ও শ্রীঅমল হোমের কাছে আমি যা শুনেছি তা এইরকম। ইনষ্টিট্যুটের সভ্যরা যখন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক মঞ্চস্থ

করেন, তখন তাঁদের খুব ইচ্ছা হয় যে, দানিবাবু একবার এসে তাঁদের অভিনয় দেখে যান। মন্মথবাবু ছিলেন দানিবাবুর বন্ধু ও সমবয়সী। দানিবাবুই তাঁকে 'মাষ্টার' বলে ডাকতেন; তখন থেকেই তিনি 'মাষ্টারমশাই' নামে সুপরিচিত হন। মন্মথবাবু দানিবাবুকে প্রথমে অনুরোধ করেন; তারপর শ্রীঅমল হোম প্রমুখ ইনষ্টিট্যুটের কয়েকজন সদস্য দানিবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিশেষ-ভাবে বলে আসেন। ইনষ্টিট্যুটের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে ড্রপসিন উঠবার কিছু আগে দানিবাবু এসে উপস্থিত হন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, দানিবাবু ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন পাশাপাশি বসে সে অভিনয় দেখেছিলেন। অভিনয় শেষে শিশিরকুমার ও অন্যান্য সভ্যরা এসে যখন দানিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, অভিনয় কেমন দেখলেন, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"তা বাপু আপনারা লেখাপড়া-জানা লোক, মাষ্টার বললে অনেক করে, তাই এলাম; তা অভিনয় আপনাদের ভালই হয়েছে। আমি আর কি জানি? বাপি যা বলে দেয়, তাই ষ্টেজে দাঁড়িয়ে বলি।" পরবর্তীকালে অবশ্য এই দুই প্রতিভাধর নট একত্রে বহুবার অভিনয় করেছিলেন, সে-কাহিনী যথাস্থানে বলব।

এরপর গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে ইনষ্টিট্যুটের সদস্যরা 'জনা' মঞ্চস্থ করলেন এবং এই নাটকের অভিনয়েও সভ্যগণ পূর্বের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। 'জনা'-য় শিশিরকুমার প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পরের বছর গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' অভিনীত হয়। নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় ও মারের ছোট্ট ভূমিকায় নরেশচন্দ্রের অভিনয় সকলকে বিস্মিত করে। "এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সভ্যগণের আর একটি কীর্তি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন 'মার'-এর ভূমিকাটি অত্যন্ত নগ্নভাবে রূপদান করা হোত। সুনীতিবাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তা পছন্দ হয় না। তখন স্থির হয় সুনীতিবাবুর পরিকল্পনানুযায়ী 'মার'-কে নব কলেবরে সজ্জিত করা হবে। অন্যান্য পোষাকও ইতিহাস-সম্মতভাবে তৈরি করা হয়। এই ভাবে সভ্যগণ অভিনয়-কলার গতানুগতিক ধারাকে আমূল সংস্কৃত করে নানাদিকে তার উৎকর্ষ সাধন করেন।"

ইনষ্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়ের সুনাম হয়েছিল দুটি কারণে: প্রথম, অভিনয়ে নূতনত্ব আর দ্বিতীয়, নাটকের প্রযোজনায় ছিল অভিনবত্ব। কলকাতায় তখন আরো দু'একটি সংস্থায় অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ইনষ্টিট্যুটের অভিনয়ই ছিল সবচেয়ে শোভন ও সুন্দর। সুনীতিবাবু সত্যই লিখেছেন: "বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের অভিনয়গুলির একটি বিশেষ সার্থকতা এবং মূল্যবান স্থান আছে। প্রাচীন ভারতীয় পারিপার্শ্বিকে যে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হোত তার বাতাবরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাস্তুকৃতি, শিল্পবস্তু প্রভৃতি যাতে যথাসম্ভব প্রাচীন ভারতেরই মতো হয়, যাতে আমাদের যাত্রার শল্‌মাচুমকি ঝলমলে পোষাক রঙীন ভেলভেটের হ্যাপপ্যাণ্ট, কোট, ওয়েষ্টকোট, আচকান, পিঠবস্ত্র প্রভৃতি মিলে জিনিসটাকে জবরজং আর কিম্ভূতকিমাকার না করে, সে বিষয়ে গোড়া থেকেই আমরা দৃষ্টি রাখতুম।'' পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির বলেই শিশিরকুমার বাংলা থিয়েটারের চেহারা পালটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইনষ্টিট্যুটে ছাত্রদের অভিনয়ের এই উৎকর্ষতা লক্ষ্য করেই সমসাময়িক একটি পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল এই মর্মে: "The noticeable feature of the pleasing performances in the University Institute was that every player seemed to have understood his part and that would be saying a great deal of the abilities of our students in histrionic line." ইনসষ্টিট্যুটের নাটক-অভিনয়ের সাফল্যের পেছনে একটা বড়ো জিনিস ছিল teamwork বা সংঘচেতনা। নাট্যশিক্ষক মন্মথমোহন বাবুর শিক্ষার ভেতর দিয়ে এই জিনিসটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন শিশিরকুমার। এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু লিখেছেন: 'এই সংঘচেতনা গড়ে তুলবার মতো আকর্ষণী শক্তি ছিল শিশিরের। চেহারায়, চালচলনে, কথাবার্তায় একটা সহজ আন্তরিক হৃদ্যতায় শিশির সকলকেই আপনার করে নিতে পারত।' এবং তা পারতেন বলেই টিমওয়ার্ক অমন সুন্দর হোত—দর্শকচিত্তে নাটকের আবেদন সামগ্রিক হয়ে উঠত। অভিনয় কার্যটি যে একটা সম্পূর্ণ ব্যাপার—এই বোধটি

তখন থেকেই শিশিরকুমারের শিল্পচেতনায় ধরা দিয়েছে। এবং এই কারণেই তিনি সেদিন ইনষ্টিট্যুটের অভিনেতা হিসাবে মাত্র কয়েকটি ভূমিকায় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের চিত্তজয় করতে পেয়েছিলেন। যিনি একদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন, সেই শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ ইনষ্টিট্যুটেই ঘটেছিল। এখানকার "উর্বর নাট্যক্ষেত্রে স্যর গুরুদাসের সজাগ তত্ত্বাবধানে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর নিয়মিত জল সেচনে শিশির-প্রতিভার এই অঙ্কুর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করতে থাকে।" এ-প্রতিভা ছিল তাঁর সহজাত; তার ওপর ছিল রবীন্দ্রকাব্যামৃত আস্বাদন—সে কাব্যরস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, পরিপাক করেছিলেন। বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ পথ-নির্দেশ—নাট্যাভিনয়ের নূতন ধারার প্রবর্ত্তন, এর সূচনা এই ভাবেই হয়েছিল এবং ইনষ্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়কে আশ্রয় করেই এক শিক্ষিত তরুণ নটের প্রতিভার উদয়াচলে আমরা প্রত্যক্ষ করি বাংলা থিয়েটারের নবযুগ।

॥ ৪ ॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শিশিরকুমারের বাল্য ও শৈশব জীবন সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল ফণীন্দ্র-কিশোর আচার্য আমাকে যতটুকু লিখে দিয়েছিলেন তাই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। এই বৃত্তান্ত সঠিক হওয়াই সম্ভব, কেন না ফণীন্দ্রকিশোর সম্পর্কে কেবল যে শিশিরকুমারের মাতুল ছিলেন তা নয়, দুজনে প্রায় সমবয়সী হওয়ায় এঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও ছিল নিবিড়; সেইজন্য শিশিরকুমারের বন্ধু-মহলেও তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ভাগিনেয় শিশিরকুমারের প্রতিভার একান্ত অনুরাগী ছিলেন ফণীন্দ্রকিশোর, এ আমি তাঁর কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলাম। ভাগিনেয়ের শেষ জীবনের জন্য তিনি মর্মান্তিক দুঃখবোধও করেছিলেন। ফণীন্দ্রকিশোর লিখেছেন:

"শিশিরকুমারের পূর্বপুরুষদের বাস সাঁতরাগাছি (হাওড়া)। সাঁতরাগাছির ভাদুড়িরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সুদূর অতীতে তাঁদের কোনো পূর্বপুরুষ তখনকার মুসলমান শাসকদের দ্বারা 'খান' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে সাঁতরাগাছির ভাদুড়িরা 'খান' উপাধি ব্যবহার করেন। ভাদুড়িরা ধনশালী জমিদার ছিলেন; এই অঞ্চলের বহু অংশ সেদিন পর্যন্ত তাঁদের জমিদারির অন্তর্গত ছিল।

"শিশিরকুমারের পিতার নাম হরিদাস ভাদুড়ী। তাঁর পিতামহরা খুব দাতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের অত্যধিক দানের ফলে এবং পরে শরীকানি বিবাদের ফলে অত বড় জমিদারি নষ্ট হয়ে যায়। হরিদাসবাবু অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। জমিদারি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে পাশ করে তখনকার গভর্ণমেণ্টের P. W. Department-এ চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা হতে বুঝতে পারা যাবে শিশিরকুমার তাঁর নির্ভীক

স্বাধীন স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন এবং তাঁর মাতামহের কাছ থেকেও।

"এইসময় তৃতীয় বর্মাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হরিদাসবাবু ও একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ারকে সরকারী কাজে বর্মা যেতে হয়। হরিদাসবাবু এই সাহেবের সহকারী হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে এঁরা দুজনে কর্মস্থল হতে শহরে নিজেদের তাঁবুতে ফিরছিলেন—দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। কথা হচ্ছিল অনেক বিষয়ে। হঠাৎ সাহেব বলে ফেললেন, 'Mr. Bhaduri, তোমরা বাঙালিরা লেখাপড়ায় Burmese-দের চাইতে অনেক উন্নত, কিন্তু লর্ড মেকলের মতো লোকও বলেছেন যে বাঙালি জাত মিথ্যাবাদী।' এ-কথা শুনে হরিদাসবাবু মনে ব্যথা পান এবং খুব রাগান্বিত হন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে অতি ভদ্র ভাষায় সাহেবকে বলেছিলেন, 'আপনি একজন শিক্ষিত ইংরেজ, আপনার কি এটা উচিত একটা সমগ্র জাতিকে মিথ্যাবাদী বলা?' সাহেব মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন— 'Well, Mr. Bhaduri, truth is truth, সত্য কথা বলবার অধিকার আমার আছে।'

"হরিদাসবাবু তখনো নিজেকে সংযত রেখে বলেছিলেন, 'কথাটা সত্য নয়। তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনে নিলেও, যেহেতু আমি বাঙালি, আমার সম্মুখে আমার জাতকে মিথ্যাবাদী বলে কষ্ট দেওয়া আপনার মতো শিক্ষিত ভদ্রলোকের কি উচিত?' চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, তখনকার দিনের সাহেবরা ভারতবর্ষে এসে ধরাকে সরা জ্ঞান করত এবং এক-একটি দম্ভের অবতার বনে উঠত। সাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি-হেসে বললেন, 'Mr. Bhaduri, I had no idea that you were such a thin-skinned fellow—can't you stand truth?'

"হরিদাসবাবু বাড়ির অসচ্ছল অবস্থা স্মরণ করে চাকরি করা দরকার জেনে এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই কথা শোনার পর তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। Stirrup-এর ওপর দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'Enough Mr. Wright, enough of your silly arrogance. I do not allow anybody to insult my

nation in my presence, I give you five minutes time to withdraw your insulting remarks about my people, the Bengalees. Please withdraw, or else I shall know how to administer a good hammering for your jawing'—এই কথা বলেই হরিদাসবাবু তাঁর ওয়েষ্ট-কোটের পকেট হতে তাঁর ঘড়িটা বার করে হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। সাহেব কিন্তু তখন রেগে উন্মাদের মত hunter তুলে হরিদাসবাবুর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে; উদ্দেশ্য—তাঁকে hunter-এর দ্বারা আঘাত করবে; কিন্তু সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হরিদাসবাবু মুহূর্তে নিজের ঘোড়া সাহেবের উত্থিত চাবুকের বাইরে সরিয়ে নিয়ে, পর মুহূর্তে বিদ্যুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সাহেবের বাঁ পাশে এসে তাঁর নিজের hunter দিয়ে সাহেবকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজে ঘোড়া হতে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের বুকের ওপর এক পা তুলে বলেছিলেন, 'Now Mr. Wright, will you withdraw your insulting and false allegations and apologise ?'

"সাহেব তখন সেই নির্জন তেপান্তর মাঠে আর কোনো উপায় নেই দেখে, ভীত, শুষ্ক কণ্ঠে বলেছিলেন, 'Yes, Mr. Bhaduri, I withdraw the remark and apologise to you.' কিন্তু রাইট সাহেব একে খাঁটি ইংরেজ তার ওপর Superior officer; তাই তিনি অধীনস্থ বাঙালি অফিসারের হাতে মার-খাওয়ার অপমান ভুলতে পারেন নি। সেইদিনই সন্ধ্যায় কলকাতায় P. W. D.-র সদর দপ্তরে টেলিগ্রাম করে কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগে হরিদাসবাবুকে কর্মচ্যুত করেছিলেন। অন্যায়ভাবে এই কর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে হরিদাসবাবু বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের কাছে আপিল করেছিলেন, কিন্তু তখন কোনো ফল হয় নি; অনেক বছর পরে তিনি ভারত সরকারের কাছে আবার আপিল করে কর্মে পুনরায় বহাল হয়েছিলেন।

"হরিদাসবাবু এই সময় বিবাহ করেছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলার দাদপুর গ্রামে। চাকরি

উপলক্ষে তাঁরা মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর বড় ভাই মেদিনীপুর কালেক্টরের ট্রেজারার ছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বাবু ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। এমন কি, বড়ো বড়ো সিভিলিয়ান ইংরেজরা বলতেন যে, ইংরাজিতে এত বড়ো পণ্ডিত তাঁরা দেখেন নি। এইচ. ডি. ফিলিপস, আই. সি. এস-কে তিনি বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন। এই ফিলিপস সাহেব কাশীরাম দাসের মহাভারত ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তারই মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'আমি আই. সি. এস. অফিসাররূপে ভারতবর্ষের অনেক জেলায় কাজ করেছি, কোথাও কোনো ভারতবাসীকে কৃষ্ণকিশোর বাবুর মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্র, ও ইংরেজি সাহিত্যে এত বড়ো পণ্ডিত আমি দেখি নি।' এই ফিলিপস সাহেব কৃষ্ণকিশোর বাবুকে মৈমনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী তাঁকে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর পরদুঃখকাতর মহান হৃদয়ের মাধুর্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর জন্য ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত প্রচুর। কৃষ্ণকিশোর বাবু তাদের অনেক উপকার করতে পারবেন বলে স্ব-ইচ্ছায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ত্যাগ করে, মেদিনীপুরে জেলা বোর্ড স্থাপন করে তার সেক্রেটারি হয়ে মেদিনীপুর জেলায় অনেক স্কুল প্রভৃতি করে দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর শহরে 'কৃষ্ণকিশোর রোড' তাঁর প্রতি মেদিনীপুরবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে আজো রয়েছে। জেলা শাসক মিঃ ব্র্যাডলি, আই. সি. এস. এই সড়কটি উন্মোচন করেছিলেন।

"কৃষ্ণকিশোর বাবুর প্রথম সন্তান ও কন্যা কমলেকামিনীর সঙ্গে হরিদাস বাবুর বিয়ে হয়েছিল। রূপে-গুণে কমলকামিনী সত্যই তাঁর নামের উপযুক্ত ছিলেন। এই হরিদাস ভাদুড়ী ও কমলেকামিনী দেবীই শিশিরকুমারের জনক-জননী। শিশিরকুমার তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বাবুর সম্বন্ধে এইসব কথা বলার কারণ শিশিরকুমারের বাল্য-জীবনে কৈশোর ও পাঠ্যাবস্থা তাঁর এই মহাপণ্ডিত দাদামহাশয়ের সঙ্গে কেটেছিল। কৃষ্ণকিশোরবাবু অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন; তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল আয়ত নয়ন, সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত

সুঠাম প্রশস্ত বক্ষ—এই মানুষটি ছিলেন যেমন বলশালী তেমনি নির্ভীক। তাঁর গুরুগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে তিনি শেক্‌স্‌পিয়ার, মিলটন প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের লেখা হতে এবং আমাদের দেশের মহাকবি মাইকেলের কবিতা এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আবৃত্তি করতেন, আর বালক শিশির-কুমার মুগ্ধ বিস্ফারিত চক্ষে তাঁর মাতামহের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার স্বভাব ও অভ্যাস শিশিরকুমার তাঁর দাদামশাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকিশোরের গভীর পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ শৈশবকাল হতে তাঁর সঙ্গে সাহচর্যের ফলে শিশিরকুমারের স্বভাবেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

"হরিদাসবাবু গভর্ণমেণ্টের চাকরি হারিয়ে মার্টিন প্রভৃতি সদাগরী কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে কবে কোথায় থাকতেন, তার স্থিরতা ছিল না। সাঁতরাগাছিতে ভাদুড়িদের তখন ভাঙন অবস্থা—পৈতৃক বসতবাড়ি শরীকে শরীকে ভরে গিয়েছে; মা, বাবা বা নিকট আত্মীয় কেউ সেখানে ছিল না। তাই হরিদাসবাবু তাঁর নব-বিবাহিতা পত্নীকে তাঁর পিতা কৃষ্ণকিশোর বাবুর মেদিনীপুরের বাড়িতে রেখে যেতেন। শিশিরকুমারের সাঁতরাগাছিতে না জন্মে মেদিনীপুরে জন্মাবার কারণ এই। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শিশিরের জন্ম তারিখ।"

নরাণাং মাতুল ক্রম—মাতামহের কাছ থেকে শৈশবে শিশিরকুমার যেমন সাহিত্যানুরাগ ও আবৃত্তি-প্রীতি লাভ করেছিলেন, তেমনি তিনি তাঁর দুই মাতুলের কাছ থেকেই লাভ করেন অভিনয়-প্রীতি। মেদিনীপুরে বান্ধবনাট্যসমাজ বলে একটি অবৈতনিক থিয়েটার সম্প্রদায় ছিল (এখনো আছে); এই থিয়েটারের পাণ্ডা ছিলেন দেবকিশোর ও ফণীন্দ্রকিশোর—শিশিরকুমারের দুই মাতুল। এঁরা দুজনেই যে প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন তা নয়, যাকে বলে থিয়েটার-পাগল লোক, এঁরা দু'ভাই তাই ছিলেন। সাহিত্য বা থিয়েটার ও অভিনয় সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মাতুল-বংশই প্রতিভাশালী। ফণীন্দ্রকিশোর শিশিরকুমারের ছোটমামা ছিলেন,

বয়সে তিনি ভাগিনেয় অপেক্ষা দু'বছরের বড়ো ছিলেন কিন্তু, মামা-ভাগ্নের মধ্যে এমন নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তা বিরল। শিশিরকুমারের নটজীবনে বিপদে-আপদে তিনি তাঁর ছোটমামার দ্বারা বহু উপকার পেয়েছেন, এ-কথা শিশিরকুমারের মুখেই আমি শুনেছি। অবশ্য শেষ বয়সে মাতুলও তাঁর ভাগ্নের দ্বারা কম উপকৃত হন নি। মামা ও ভাগ্নের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার আরো একটি কারণ এই ছিল যে, ফণীবাবুর শৈশবে তাঁর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেইজন্য তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী ফণীবাবুকে মানুষ করেছিলেন। এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে তিনি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। ভাই-ভগ্নীর মধ্যে মতানৈক্য খুব কমই হোত। শিশির-কুমার যখন নটের বৃত্তি গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করেন, তখন সকলের আগে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন দুজন—তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল আর তাঁর মাতাঠাকুরাণী। শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ নটজীবনে তাঁর মাতুল ফণীন্দ্র-কিশোরের যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, এ-কথাটি সর্বাগ্রে স্বীকার করতেই হবে। শিশিরকুমারের এই মাতুল মেদিনীপুর, ঢাকা ও বর্ধমানে জজের সেরিস্তাদার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমারের বন্ধুত্ব ছিল চিরকাল। মাতুল যখন বর্ধমানে, তখন সময় পেলেই শিশিরকুমার ফণীন্দ্রকিশোরের সঙ্গলাভের জন্য কলকাতায় অভিনয়ের পরই সোজা মোটরে করে সেই রাত্রেই বর্ধমান চলে যেতেন।

শিশিরকুমারের মাতুল-প্রীতির একটি চমৎকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন ফণীন্দ্রকিশোর এবং তাঁরই লিখিত বিবরণ থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম :

"কলকাতায় মুসলমান ও মাড়োয়ারিদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় একদিন সকালে শিশিরকুমার তাঁর ছোট মামার পত্রে সংবাদ পান যে, মামা মেদিনীপুর থেকে আজ সকালের ট্রেণে কলকাতায় পৌছবেন। তিনি কলকাতার হাঙ্গামার কথা জানতেন না, সুতরাং হ্যারিসন রোড দিয়ে আসবার সময় পাছে হাঙ্গামাকারিদের হাতে পড়ে তিনি লাঞ্ছিত হন বা প্রাণ হারান এই ভয়ে শিশিরকুমার একলাই হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটে চলেন, যাতে ট্রেণ আসবার পূর্বেই তিনি প্লাটফর্মে পৌছতে পারেন।

তখন শিশিরকুমার সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে এক বাড়িতে থাকতেন। হ্যারিসন রোডে প্রবেশ করা মাত্রই একজন ইউরোপিয়ান সার্জেন্ট শিশিরকে বাধা দিয়ে বলে: 'Hallo youngman, don't you know that up there is the disorder and killings going on due to the riot betwen Marwaris and Muslims.' অকুতোভয় শিশিরকুমার বললেন, 'Yes, I know, but go I must, as my maternal uncle is coming without knowing anything about the riot.' তখন সার্জেন্টটি বলে, 'But you are risking your life, mind that. I have warned you, now the responsibility is yours.' তারপর শিশিরকুমার ছুটতে ছুটতে হাওড়া ষ্টেশনে প্লাটফর্মে গিয়ে পৌঁছেছিলেন—সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও বিপদ অগ্রাহ্য করে।"*

ফণীন্দ্রকিশোরের লেখা থেকে আরো একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"বাল্যকাল ছাড়াও, যতদিন তাঁর দাদামহাশয় বেঁচে ছিলেন, কলকাতার কলেজে পড়বার সময় ও প্রত্যেক ছুটির বন্ধে এবং প্রায় প্রতি শনি-রবিবার শিশিরকুমার মেদিনীপুরে এসে দাদামশায়ের কাছে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য আলোচনা, আবৃত্তি ও ইতিহাস প্রভৃতির চর্চায় দিন কাটাতেন। প্রৌঢ় দাদামশায় ও যুবক শিশিরকুমারের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের এমন একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, মাতামহের মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময়ে শিশিরকুমার দু'মাস স্নান-আহার ত্যাগ করে তাঁর রোগশয্যা পার্শ্বে বসে থাকতেন, তাঁকে ওষুধপত্র খাওয়াতেন—তাঁর সঙ্গে তখনো শেক্‌স্‌পিয়ার মিলটন-বায়রণ-কীটস্-শেলি ও রবীন্দ্রনাথ-মাইকেলের পদ্য প্রভৃতি আবৃত্তি করে দিন কাটাতেন। তাঁর দাদামশাইয়ের মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞান বজায় ছিল এবং মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্বেও দুজনে গল্প করেছেন। বিদ্বান, মহাপ্রাণ ও দাতা বলে তাঁর দাদামশাইয়ের যেমন খ্যাতি ছিল, আবার তিনি ছিলেন তেমনি সরল ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ;

* বিধাতার এমনই নিষ্করুণ পরিহাস যে, শিশিরকুমারের মৃত্যুর তিন মাস পরেই ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতার খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, সেই বিক্ষোভে পুলিশের অতর্কিত গুলিতে ফণীন্দ্রকিশোর আচার্য নিহত হন।

অপমানিত বোধ করলে সিংহবিক্রমে অপমানকারীকে আক্রমণ করতেন, কারো কাছে কোনো দিন মাথা নত করেন নি। মেদিনীপুরে বহু উদ্ধত ইংরেজ সিভিলিয়ান কৃষ্ণকিশোর আচার্যের স্বাধীনচিত্ততা এবং নির্ভীকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। শিশির তাঁর মাতামহের এইসব গুণ অনেকখানি পেয়েছিলেন; 'He was an influencing factor in my early life',—বহুবার আমি শিশিরকে তাঁর মাতামহ সম্পর্কে এই কথা বলতে শুনেছি।"

শিশিরকুমার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুরও তিনি খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। বঙ্গবাসী, জেনারেল এসেম্ব্লিজ ও প্রেসিডেন্সী—সকল বিদ্যানিকেতনেই তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অকুণ্ঠ স্নেহ ও সমাদর লাভ করেছিলেন; তাঁরা সকলেই শিশিরকুমারের সহজ প্রতিভায় মুগ্ধ হতেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে কলেজে তাঁর সহপাঠী শ্রী যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরি (প্রিন্সিপাল জে. কে. চৌধুরি) মহাশয় আমাকে বলেছেন যে, "তখন থেকেই আমরা শিশিরের ব্যাক্তিত্বমণ্ডিত চালচলন ও কথাবার্তা দেখে মুগ্ধ হতাম; এমন কি ইংরেজ অধ্যাপকেরা পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বলতেন: He is a presence to be felt and known' এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিশিরকে সকলের পুরোভাগে নিয়ে এসেছিল।" প্রেসিডেন্সীতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ক্ষীতিশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শচীন্দ্রনাথ হালদার, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্কটিশে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার ও যতীন্দ্রকিশোর প্রভৃতি তখন এখানে পড়তেন এবং এঁরা সকলই শিশিরকুমারের সঙ্গে একত্রে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সীতে তিনি এম. এ. পড়েন; এইচ. আর. জেমস ছিলেন তখন প্রেসিডেন্সীর অধ্যক্ষ। এইখানেই তিনি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং ইনস্টিট্যুটের জুনিয়র সদস্য হিসাবেও তিনি অধ্যাপক সেনের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। শিশিরকুমারের প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি ও সুস্পষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁকে বিশেষ-

ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনিই সেদিন এই তরুণ ছাত্রটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এম. এ. পাশ করার কথা ১৯১১তে, কিন্তু কি কারণে যে তা হয়ে ওঠে নি, তা জানা যায় না। সুনীতিবাবু লিখেছেন যে, ছাত্রজীবনে শিশিরকুমার ছিলেন—"সবচেয়ে বিভূতিমান ছাত্র। পরীক্ষায় সে ভাল করতে পারে নি। কিন্তু তার বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যে—ইংরেজি ও বাংলায় সে অদ্ভুত জ্ঞান ও বিচারশক্তির অধিকারী ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে শেকস্‌পিয়ার প্রভৃতি বড়ো বড়ো ইংরেজ লেখকদের অনেক বই তার যেন নখদর্পণে ছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে তার বোধ ছিল খুবই প্রাচীন বা প্রৌঢ়। ইংরেজি ভাষা তার ভালভাবেই আয়ত্ত করা ছিল ; আর ইংরেজি বাংলা পাঠভঙ্গিও তার ছিল অনবদ্য।"

শিশিরকুমারের ছাত্রজীবনের একটা সুন্দর চিত্র দিয়েছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: "১৯০৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।...ক্লাসে তাহার গতিবিধি অতর্কিত, অনিয়মিত ও খেয়াল খুশি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন কলেজের বহির্ভূত যে বহুবিস্তৃত, নানা প্রতিষ্ঠানে শাখায়িত আড্ডা মজলিশের আয়োজন ছিল, সেইখানেই যে তাহার প্রধান আকর্ষণ ও তাহার শক্তির স্বচ্ছন্দ লীলাময় বিকাশ এ রহস্যটি যেন জানিতাম না, পরে জানিয়াছিলাম।" তখন মানিকতলা স্ট্রীটে স্কটিশচার্চ কলেজের প্রায় সন্নিকটে কলেজের ছাত্রদের থাকবার জন্য একটি ছাত্রাবাস ছিল। সেই ছাত্রাবাসে সাহিত্যের জোর আড্ডা হোত। শিশিরকুমাকে সেই মজলিশে প্রায়ই দেখা যেত। সহপাঠিরা সবিস্ময়ে দেখতো যে ছাত্র শিশিরকুমার বিধিদত্ত বহু দুর্লভ গুণের অধিকারী। দৈহিক আকৃতি তো তাঁর পরম সুষমামণ্ডিত ছিল ("গ্রীক দেবতার মত সুঠাম অঙ্গবিন্যাস"), কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর রসজ্ঞান ছিল অসামান্য। চমৎকার ইংরেজি ও বাংলা তিনি অনর্গল বলতে পারতেন—এই গুণেই তিনি সহপাঠিদের চিত্ত জয় করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিসাবেও তিনি এই গুণেই ছাত্রদের মন জয় করেছিলেন। স্কটিশে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মুগ্ধ হয়েছিলেন শিশিরকুমারের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি জিনিস দেখে: এক, সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহ আর দ্বিতীয়ত তাঁর

সুকণ্ঠের আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে। কবি নিজেও তখন জানতেন না যে সেই সময়ে কলকাতার ছাত্রসমাজে তাঁর কাব্যের এমন একজন রসগ্রাহী পাঠক ও সমজদার আছেন। তখনো মধু-হেম নবীনচন্দ্রের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে অনেক ছাত্রের কাছে প্রিয় ছিল; ব্যতিক্রম একমাত্র শিশিরকুমার। শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন: "তাহার মধুর উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করিয়া সে আমাদের রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে বাধ্য করিত।···বাস্তবিক, কাব্য-আবৃত্তি যে এত মধুর হইতে পারে, কবিতার রস যে এমন প্রাণস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে, বিশুদ্ধ ভাবানুগামী উচ্চারণ যে অন্তরের এত গভীরে আবেদন সঞ্চার করিতে পারে, আমরা শিশিরের সুধাস্রাবী কণ্ঠ হইতে তাহার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।"

এমনি করেই তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং তারপর প্রেসিডেন্সীতে এম. এ. পড়তে আসেন। তখই তার মধ্যে ইনষ্টিট্যুটের অভিনয়প্রীতি জেগেছে; যা তিনি লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে মাতামহের কাছ থেকে। সেই আবৃত্তি ও অভিনয়প্রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে। শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন: "প্রেসিডেন্সীতে এম. এ. ক্লাসে তাহার ক্লাস-পলায়ন বৃত্তি একটা রীতিমত শিল্প কলায় উন্নীত হইল। ক্লাসের নির্দিষ্ট, নিয়ম-বন্ধুর গণ্ডী ছাড়াইয়া সে ইনষ্টিট্যুটে নিজ স্বচ্ছন্দ মানস বিহারের সিংহাসন পাতিল।···শিশির পড়িত, কিন্তু পরীক্ষার পাঠ-ক্রমের সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না। নিজের রুচির তাগিদে, খেয়ালখুশির যদৃচ্ছ নির্বাচনেই তাহার পড়ার বিষয় নিরূপিত হইত। যে কেন্দ্রশাসিত উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত বৃত্তির অনুশীলনে পরীক্ষায় ভাল করা যায়, তাহা শিশিরের যাযাবর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এই সময়ে অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রথম মাদকতা শিশির আস্বাদন করিল।" শিশির-কুমারের ছাত্রজীবনের শেষ বৎসরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যা অনেকেরই হয়ত জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্তম-জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক টাউন হলে তাঁর সংবর্ধনার পরের দিন পরিষৎ-মন্দিরে একটি সান্ধ্যসম্মিলন হয় (১৩১৮, ১৫ই মাঘ)। তাতে ইউনিভার্সিটি

ইনস্টিট্যুটের জুনিয়র মেম্বাররা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন। শিশির-কুমার কেদারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; কবি এ অভিনয় দেখে, শ্রীঅমল হোমকে পরে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: "তোমার ইনস্টিট্যুটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছিল। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।" এই চিঠির তারিখ ২৩শে মাঘ, ১৩১৮। এর থেকে জানা যায় যে, শিশিরকুমারের প্রতিভা রবীন্দ্র-নাথের চোখে তখনই ধরা গড়েছিল। এর বারো বছর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'সীতা' নাটকে রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভা দেখে কবি আরেকবার বিস্মিত হয়েছিলেন।

শিশিরকুমার এম. এ. পাশ করলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর সঙ্গে এই বছর যাঁরা এম. পাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরি, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জে, পি, নিয়োগি, সুশীল মৈত্র, সোমেশ্বর মুখার্জি ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। যতীন্দ্রকিশোর মেট্রোপলিটানে তাঁর সহকর্মি ছিলেন। হিসাব মত ১৯১১তে তাঁর এম. এ. পাশ করার কথা, কিন্তু তা হয় নি। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের ছেলে তিনি। তাঁর ভেতরে যে দুর্লভ প্রতিভা রয়েছে, অভিনয় প্রতিভার যে আশ্চর্য সম্ভাবনা রয়েছে, সংসারে তা বুঝবার মত লোক সেদিন কেউ ছিল না। পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার অবাধ স্ফুরণের সুযোগ তিনি তখনি পেলেন না। সুদীর্ঘ আট বছর তাঁকে এর জন্য সেদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শিশিরকুমার এম. এ. পাশ করলেন। তারপর তাঁকে "গতানুগতিক ধারারই অনুবর্তন করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও ছোট ছোট ভাইদের তত্ত্বাবধান তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। তাহার বাবার ইচ্ছা ছিল তাহাকে হাইকোর্টের উকিল করা এবং সেই উদ্দেশ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব দাশরথি সান্ন্যালের নিকট তাহার শিক্ষানবীশীরও ব্যবস্থা তিনি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শিশির এই পিতৃ-উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা

করিয়া ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিল।" যাই হোক্ পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায় ও দায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে চাপল তখন "শিশিরকে বাধ্য হইয়া তাহার সমস্ত রঙীন স্বপ্ন-কল্পনাকে বাস্তবের কঠোর প্রয়োজনের ঘেরাটোপে আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করিতে হইল।" শিশিরকুমার তখন কৃতদার। আগ্রার সুবিখ্যাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা উষাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শিশিরকুমারের বিবাহিত জীবন স্বল্পস্থায়ী ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের তখন নাম ছিল মেট্রোপলিটান, ১৯১৭-তে নাম বদলে হয় বিদ্যাসাগর কলেজ। সেই বছরে (১৯১৪ খ্রীঃ) এই চারজন একসঙ্গে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন: যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার আর অমর পালিত। সকলেরই মাইনে ১৫০৲ টাকা। সারদারঞ্জন রায় তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ।

তারপর শিশিরকুমার ভাদুড়ি, এম. এ.—ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে কিভাবে ছাত্রসমাজের idol হয়ে উঠেছিলেন, কিভাবে তিনি ছাত্রদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেও তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, অধ্যাপক হিসাবে তিনি কি সুনামই না অর্জন করেছিলেন—সেসব কাহিনী সুপরিচিত। তাঁর অধ্যাপকজীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন শ্রীসুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: "১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজে আমি শিশিরকুমারকে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে পাই। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। পোষাকের পরিপাট্য ছিল। তিনি প্যাণ্ট কোট পরে আসতেন। প্রত্যহ নূতন নেকটাই বদলে আসতেন। মাথায় একটা কালো গোল টুপি থাকত। তখন তাঁর বয়স ২৪।২৫ বৎসর। সেই বয়সেই তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়েছিলেন। অধ্যাপনা করবার সময়েই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়।" আর এই প্রসঙ্গে কবি কালিদাস রায় লিখেছেন: "শিশিরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমি তার ছাত্রদের কাছে শুনেছি, ইংরেজি সাহিত্যের এমন অপূর্ব অধ্যাপনা তারা কোথাও শোনে নি। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শিশিরের অধ্যাপনা শোনে। কেবল চমৎকার অভিনয়াত্মক আবৃত্তি করে সে এমনভাবে শেক্সপিয়ার পড়াত যে, শুধু আবৃত্তি শুনেই ছাত্রেরা অনেকটা অর্থবোধ হয়ে যেত।"

শিশিরকুমারের মেধা ছিল অসাধারণ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

শিশিরকুমার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি অধ্যাপকের চাকরি নিলেন—সেই সময়ে তাঁর পক্ষে সেটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর সমগ্র চিন্তা তখন বিধৃত হয়েছে একটি বিন্দুতে—তিনি অভিনেতা হবেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মনোজগতের পটভূমি আলো করে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর শেক্সপিয়ারের নাটক। তিনি অভিনেতা না হয়েই পারেন না। তারপর ছাত্রজীবনেই তিনি এসেছেন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে, ক্ষণিকের হোলেও নটগুরুর প্রতিভার উত্তাপ অলক্ষ্যে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। প্রাক্-অধ্যাপকজীবনেই তিনি ইনস্টিট্যুটের একজন খ্যাতিমান অভিনেতা। অধ্যাপনাকালেও ইনস্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সমানভাবেই ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী উচ্চসম্মানে ভূষিত হলেন এবং এই উপলক্ষে ইনস্টিট্যুটের সভ্যগণ একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হলো—সেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি আর নরেশচন্দ্র মিত্র—একজন অবিনাশ অপরজন কেদার। ১৯১৫, ১লা সেপ্টেম্বর। ইনস্টিট্যুটের সভ্যগণ ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' মঞ্চস্থ করলেন। এই নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমার কোনো অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু অভিনয় শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। মূল নাট্যশিক্ষক মন্মথমোহন বসু এই প্রসঙ্গে লেখককে বলেছিলেন: "ইনস্টিট্যুটের সব নাটকেই অমিই ছিলাম motion master বা নাট্যশিক্ষক। 'ভীষ্ম' নাটক ছেলেদের খুব শক্ত মনে হোল; তারা এসে আমাকে বললে, স্যর, এ বই তৈরি করা শক্ত, আপনি একটু ভাল করে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, আমি তো আছিই, তবে তোমরা শিশিরের কাছ থেকে ট্রেনিং নাও। তাই হোল। শিশিরের শিক্ষাপদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হই। নাটকের প্রত্যেকটি ভূমিকা সে বিশ্লেষণ করে ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র না[illegible]বাতাবরণ সে এমন ভাবে তাদের

সামনে তুলে ধরেছিল যে নাট্যকার ক্ষীরোদবাবু পর্যন্ত তা শুনে পরম বিস্ময় বোধ করেছিলেন। অভিনেয় নাটকের এমন বিচার বিশ্লেষণ তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও নাকি কখনো দেখেন নি। এর ফলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকা ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পেরেছিল।'' এই নাটকের একটি অমাত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার। সেদিন 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় দেখতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্যর গুরুদাস, স্যর আশুতোষ এবং ডাঃ সর্বাধিকারী। এরপর "১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দু'বার 'রঘুবীর' নাটকের অভিনয় হয়। প্রথমবার বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যার্থে, দ্বিতীয়বার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি তখন অধ্যাপক। তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে 'রঘুবীর'-এ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।"

দেখা যাচ্ছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ইনস্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্য যুগ-প্রবর্তকের আত্মপ্রকাশের মাঙ্গলিক বেজে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, "সে সময় ইনস্টিট্যুটে যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে, প্রত্যেকটিরই নাট্যশিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। তাঁর আন্তরিক সাহায্য ব্যতিরেকে এতগুলি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোত কিনা সন্দেহ। সন্তানের প্রতি মায়ের টানের মত মন্মথমোহনের নাড়ীর টান ছিল ইনস্টিট্যুটের সভ্য-গণের প্রতি। শিশির-প্রতিভার বিকাশ সাধনের মূলে ছিল তাঁর অভিনয় শিক্ষাপদ্ধতির অভিনব কৌশল।" এ-যুগে বাংলার শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে নাট্যানুরাগ জাগিয়ে তোলার পেছনে আচার্য মন্মথমোহনের প্রয়াসের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

ইনস্টিট্যুট ছাড়া তখন শহরের যে দুই একটি শৌখিন দলের নাট্যাভিনয়ের কথা শোনা যেত তাদের মধ্যে 'ওল্ড ক্লাব' এবং ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাব' সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ওল্ডক্লাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিলেন ললিতমোহন লাহিড়ী, যিনি পরবর্তীকালে শিশির-সম্প্রদায় ভুক্ত হোয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেছিলেন। ইনস্টিট্যুটের অভিনেতা শিশির-

কুমার এই দুটি ক্লাবের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট আর বৌবাজার ষ্ট্রীটের ঠিক সংযোগস্থলের একটি বাড়িতে ছিল ওল্ড ক্লাবটি। আর 'ইভনিং ক্লাব' ছিল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে প্রেসিডেন্সী ফার্মেসীর বিপরীত দিকে। ইভনিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর সহ-সভাপতি ক্ষীরোদপ্রসাদ। তখনকার দিনে ইনস্টিট্যুটের বাইরে শিক্ষিত বিদগ্ধজনদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে এই দুটি ক্লাবের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সন্ধ্যার পরে ক্লাবের সদস্যগণ মিলিত হতেন। সভ্যদের মধ্যে একমাত্র শিশিরকুমারই ছিলেন সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র। কেন না, তাঁর মত আর কেউই বিদেশী সাহিত্য, রবীন্দ্রকাব্য এবং নাট্যপ্রসঙ্গ প্রভৃতির স্বচ্ছন্দ ও অনর্গল আলোচনার দ্বারা আসর মাতিয়ে রাখতে পারতেন না। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের আবৃত্তিতে বৈঠক রস-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। ওল্ড ক্লাবের একটি রাত্রের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন নলিনীকান্ত সরকার। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে ইনি একজন।

নলিনীকান্ত লিখেছেন: "একটি রাত্রির কথা। শিশিরকুমার ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর' নাটকখানি কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। রিহার্সাল চলছে। সে-সময়ে শিশিরকুমারের ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র 'রঘুবীর'। এই 'রঘুবীর' নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশি দিন চলে নি, কিন্তু শিশিরকুমার এই অচল নাটকখানিকেই সচল করবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এই নাটকের মধ্যে নাটকীয় রসবৈচিত্র্যের যে কাব্যমাধুর্য অভিসিঞ্চিত হয়ে কাছে—তার বিশ্লেষণ করতেন ক্লাবের বন্ধুদের কাছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই অভিনয়-প্রসঙ্গ চলতো। সদস্যেরা ক্রমে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু শিশিরকুমারের চোখে ঘুম নেই। বোধ হয় রাত্রি দুটো কি তিনটে। গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হোয়ে আছি। শিশির-কুমার ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে নাম ধরে ডাকলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বললাম—ব্যাপার কি? একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শিশিরকুমার বললেন—ঐ কোণটিতে একটু দাঁড়ান তো। আপনাকে জাফর হতে হবে। —জাফর?—হ্যাঁ, রঘুবীরের সঙ্গে জাফরের সাক্ষাতের সেই সীনটা...দাঁড়ান না ঐখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। একটা প্যাঁচ মাথায় এসেছে।

অগত্যা দাঁড়াতেই হোল। আর তিনি একই কথা বারবার বিভিন্ন ধারায় উচ্চারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভাবের ব্যঞ্জনায় রঘুবীরের ভূমিকাটি রূপায়িত করতে লাগলেন।"

এই ঘটনাটির (এ ঘটনা তাঁর ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান করার পর) উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করবার পর অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে শিশিরকুমার নট হিসাবে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল এই রকম কৃচ্ছ্র সাধনা, রসচর্যা আর অভিনয় নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা আর রসবোধই তাঁকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। তেমনি ইভনিং ক্লাবের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্রনাথ দেব। সেটি এই। "ইভনিং ক্লাব এই সময়ে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ওদিকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দুই দলের মধ্যে একটা যেন প্রতি-যোগিতার ভাব এসে পড়েছে। হরিদাসবাবু (হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ইনি এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) একদিন শিশিরকে বললেন—তুমি এসে প্রমথর (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ইনি ছিলেন ক্লাবের প্রধান সম্পাদক) চাণক্য কেমন হচ্ছে একটু দেখে যেও। শিশির এলেন, দেখলেন। বললেন, খুব ভাল হচ্ছে। এরপর প্রমথ বাবু একদিন গেলেন ইনস্টিট্যুটে শিশিরের 'চাণক্যে' মহরা দেখতে। ফিরে এসে বললেন, আমি পারব না চাণক্যের পার্ট করতে। শিশির যা করছে দেখে এলুম তার পাশে আমি দাঁড়াতে পারব না। বিশেষ তার সঙ্গে নরেশ মিত্রের কাত্যায়নের ভূমিকায় যেন মনিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে।"

ক্রমে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে শিশিরকুমারের নাম শহরের বিদগ্ধ মহলে ছড়িয়ে পড়ল। ইনস্টিট্যুটে অভিনয় করে শিশিরকুমার যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতেই তিনি স্যর গুরুদাস, স্যর আশুতোষ প্রমুখ মনীষিদের স্নেহ আর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এঁরা ছাত্রদের নাট্যা-ভিনয়ে উৎসাহ দিতেন—বিশেষ করে বাংলা নাটক অভিনয়ে। সুতরাং এ-কথা বললে অসঙ্গত হবে না যে, বাংলা নাটকের প্রতি ছাত্রদের এঁরা শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিলেন [illegible] সেই সময়ে শিশিরকুমারের মনে ধীরে

ধীরে বাংলা নাটকের প্রতি গভীর অনুরাগ জেগে উঠেছিল সকলের অলক্ষ্যে। অধ্যাপকজীবনে তিনি মাইকেল-দীনবন্ধু থেকে শুরু করে সেই সময়কার খ্যাতিমান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের যাবতীয় নাটক গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন। প্রাক্-অধ্যাপক জীবনে তিনি গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। নাটকপাঠে অনুরাগ, অভিনয়ে প্রবল আকর্ষণ, বাংলা থিয়েটারের নাট্যঐতিহ্য—শিশির-মানসে এই সবের যুগপৎ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার বিষয়।

পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার আগে ওল্ডক্লাবের পক্ষ থেকে শিশিরকুমার ষ্টার মঞ্চে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনি ভীম ও জনৈক ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নাটকে তাঁকে আমরা সর্বপ্রথম একাধারে প্রয়োগকর্তা, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে পাই। তবে অবৈতনিক ক্লাবের এই অভিনয়-অনুষ্ঠানে মুষ্টিমেয় নাট্যরসিক ভিন্ন বৃহত্তর দর্শকসাধারণ অনুপস্থিত ছিলেন বললেই হয়। কিন্তু শৌখিন নট হিসাবে তাঁর খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পায় এই অভিনয়ের ফলে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম তখন থেকেই শিক্ষিত লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে বাংলার থিয়েটার জগতে পার্শী ব্যবসায়ী ধনকুবের ম্যাডান সাহেবের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশের সময়ও আসন্ন হোয়ে এলো। এবং সেই সঙ্গে নরেশচন্দ্র, তিনকড়ি চক্রবর্তি, অহীন্দ্র চৌধুরি, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবীন্দ্রনাথ রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি নবযুগের অন্যান্য প্রতিভাবান অভিনেতাদের প্রকাশ্য থিয়েটারে আবির্ভাবের দিনও নিকটবর্তি হয়ে এলো। এঁরাও ছিলেন শৌখিনদলের অভিনেতা—এঁদের সকলেই তখন থিয়েটারের মঞ্চে ও যাত্রার আসরে অভিনয় করতেন। এঁদের অনেকেই তখন কিছু কিছু খ্যাতিও অর্জন করেছেন অভিনেতা হিসাবে। কেউ কেউ আবার ইনষ্টিট্যুটেরও অভিনেতা ছিলেন। বাগ-বাজারের সখের দল থেকে একদিন জন্ম নিয়েছিল সাধারণ থিয়েটার বা কমার্শিয়াল থিয়েটার; তারপর সাধারণ থিয়েটারে যখন অবনতি দেখা দিল তখন সেইখানে আর একদল শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমারকে পুরোভাগে

রেখে নবযুগের প্রবর্তন করলেন। পূর্বের সখের দলের অভিনেতাদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য ছিল এই যে, এঁরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ প্রাক্-শিশিরযুগের স্বনামধন্য নট দানিবাবু সম্বন্ধে কিছু বলবো। কালানুক্রমিক বিভাগ অনুসারে বাংলা থিয়েটার এ পর্যন্ত তিনটি যুগ অতিক্রম করে এসেছে, দেখা যায়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিরিশ-যুগ; ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত অমর দত্তের যুগ আর ১৯০৬ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দানিবাবুর যুগ। ১৯০৬ থেকে ১৯১৬—এই দশ বছর পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী নট হিসাবে দানিবাবু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পিতার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের ভূমিকা দিয়েই পুত্রের নটজীবনের প্রতিষ্ঠার শুরু, সে-কথা আগেই বলেছি। "এই শতাব্দীর প্রারম্ভে দানিবাবু গুরুগম্ভীর ভূমিকায় একজন নিম্ন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ভিন্ন অন্য কোনো রূপে গণ্য হইতেন না। বরঞ্চ হাস্যরসবিশিষ্ট ভূমিকাতেই তাঁহার প্রতিভা বিলক্ষণ স্ফূর্তি পাইত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দানিবাবু (তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর) একমাত্র 'প্রবীর' ভিন্ন অন্য কোনো নায়কের ভূমিকায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তখন থিয়েটারে নায়কের অভাব, গিরিশ-চন্দ্র চাহিয়াছিলেন পুত্র সেই অভাব পূর্ণ করে। দানিবাবুর চেহারা ও কথার ভঙ্গি ছিল কমিক পার্টেরই উপযোগী। কিন্তু পুত্র একজন comic actor হইবে, ইহা গিরিশচন্দ্র পছন্দ করিলেন না। তাহার পর হইতে গিরিশচন্দ্র নিজে পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও গুরুগম্ভীর ভূমিকায় অভিনয়ে দানিবাবুকে তৈরী করিতে থাকেন। তিনি পুত্রকে নায়কের অংশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন।" শিশিরকুমার যখন মঞ্চে এলেন তখন পূর্বযুগের খ্যাতিমান অভিনেতা হিসাবে একমাত্র দানিবাবু জীবিত ছিলেন। নটকুলের পিতামহস্বরূপ অমৃতলাল বসু তখন মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন। অভিনয়প্রীতি দানিবাবুর মধ্যে বাল্যাবধি ছিল। গিরিশচন্দ্রের শ্যালকপুত্র চুনিলাল দেব আর দানিবাবু প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং উভয়ের নটজীবনের আরম্ভ প্রায় একই সময়ে। বাগবাজারের বসুপাড়ার প্রসিদ্ধ অভিনেতা

বিনোদবিহারী সোমের থিয়েটারের দলে 'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের ভূমিকায় দানিবাবু অভিনেতা হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর থেকে তিনি নানা অবৈতনিক দলে যোগদান করে অভিনয় করতে থাকেন এবং সুখ্যাতিও হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রেমানন্দ ভারতী সেই সময় দানিবাবুর অভিনয় দেখে নাম দিয়েছিলেন 'young G. C. Ghose', যেমন প্রথম প্রথম লোকে শিশিরকুমারকে বলতো 'white Dani'। পুত্রকে গিরিশচন্দ্র একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন—'কখনো প্রোপ্রাইটরি করিস নি'; দানিবাবু পিতার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না পুত্র নটের বৃত্তি গ্রহণ করে—কিন্তু থিয়েটারে তার প্রবল অনুরাগ দেখে তিনি আর বাধা দেন নি, তবে একত্রে এক থিয়েটারে অভিনয় করতে তিনি প্রথমে সম্মত হন নি। গিরিশচন্দ্র যখন ষ্টারের কর্ণধার, তখন অমৃতলাল মিত্র দানিবাবুকে সেখানে আনতে চাইলেন। প্রস্তাব করলেন তিনি একদিন গিরিশচন্দ্রের কাছে। গিরিশচন্দ্র আপত্তি করে বললেন, পিতাপুত্রে একত্র অভিনয় করা বড়ই লজ্জার কথা। পরে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। দানিবাবুর প্রথম নাট্যশিক্ষক অমৃতলাল মিত্র। ষ্টারে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে 'বিষ্ণু', আর 'চণ্ড' নাটকে 'রঘুদেব' এই দুই ভূমিকায় দানিবাবু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। রঘুদেবের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন। তারপর অঘোর পাঠকের যাত্রাদলে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মহাদেবের ভূমিকায় তিনি দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসালাভ করেন। বীনা রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটারে তিনি অধিকাংশ নাটকে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করেন। তারপর মিনার্ভা যখন স্থাপিত হয় তখন তিনি পরিপূর্ণ অভিনেতা এবং এই সময় থেকে তিনি দস্তুর-মত পিতার নিকট শিক্ষা পেতে লাগলেন। এইখানেই নটগুরুর নিকট দানিবাবুর সূক্ষ্ম কলাবিদ্যা শিক্ষায় হাতে খড়ি। তারপর তিনি যখন ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন তখন থেকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে দানিবাবুর অভিনয় প্রতিভার বিকাশ হয়; জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁর ওপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ক্লাসিক থেকে দানিবাবু আবার মিনার্ভায় যোগদান করেন। এখানে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকাবলী এবং গিরিশচন্দ্রের

একাধিক নাটকে (শঙ্করাচার্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, অশোক, তপোবল প্রভৃতি) নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকেই ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই তিনি actor-manager হন। শিশিরকুমার যখন সাধারণ থিয়েটারে যোগদান করেন দানিবাবুর বয়স তখন প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তখনো তাঁর কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হয় নি। দানিবাবুর অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল এই যে, যখন তিনি যে রসের অভিনয় করতেন, সেই রসানুযায়ী চলনবলন, মুখভঙ্গী, হস্তপদ-সঞ্চালন প্রভৃতি এমন স্বাভাবিক ভাবে করতেন যে দর্শকরা যেন সেই চরিত্র জীবন্ত দেখতে পেতো। তিনি সত্যই ভগবানদত্ত ক্ষমতাপন্ন স্বভাব-অভিনেতা ছিলেন। শিশিরযুগে, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তর ভূমিকা-ই দানিবাবুর শেষ অভিনয়। সেই তাঁর প্রতিভার শেষ উদ্ভাসন।

॥ ৫ ॥ নটের আবির্ভাব—আলমগীর ॥

'লাইমলাইট' কথাচিত্রে চার্লি চ্যাপলিন নটের জীবনের একটি মর্মান্তিক সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। সেটি হোল এই : নটের জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ বার্ধক্য। যা ব্যক্তিগতভাবে নটের জীবনে সত্য, সমষ্টিগতভাবে তা নটের কর্মক্ষেত্র নাট্যশালার জীবনেও আরো মর্মান্তিক· ভাবে সত্য। থিয়েটারের অপর নাম রঙ্গালয়। যৌবনের সতেজ দীপ্তিকে আশ্রয় করেই তো রস এবং রঙ্গের স্ফূর্তি। থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ তার নট, তার অভিনেত্রী, তার নাটক। পুরানো নাটক দিয়ে যেমন আসর জমানো যায় না, তেমনি বিগতযৌবন নট-নটী নিয়ে সেই নাটকের অভিনয়ে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আসা কোনোমতেই সম্ভব হয় না—বর্ণাঢ্য দৃশ্যপট বা সাজসজ্জা বা উচ্চকিত নৃত্যগীতের সমবায়ে থিয়েটারের এই ত্রুটির সংশোধন অসম্ভব। রঙ্গনাথের আসরে স্থবিরের স্থান নেই। জীবনের শেষ অঙ্কে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্রকে তাই আক্ষেপ সহকারে বলতে হয়েছিল :

হৃদে সাধ বলবান্, সম উৎসাহিত প্রাণ
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস-রঞ্জন।
কিন্তু এ বার্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণ কায়,
বিফল প্রয়াস জনমন-বিমোহন।

বয়স হোলে নটের আর আত্মপ্রত্যয় থাকে না, তেমনি নাট্যশালারও পূর্বেকার জৌলুষ থাকে না। পিছনে গোধূলি-আলোক, সম্মুখে অন্ধকার, রসের পাত্র শূন্য—বার্ধক্যে নটের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যা দিয়ে সে পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে দর্শকচিত্তে ভাবসন্ধি স্থাপন করতে পারে। বয়সের ভারে নটের দেহটাই শুধু বিকল হয় না, সেই সঙ্গে "শ্রমার্জিত বিদ্যা, ক্লেশার্জিত কলাজ্ঞান, কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা, বিলাস-বর্জিত সাধনা" সবই একে একে নিষ্ফল হয়ে যায়। বাংলায় একটি প্রবাদ

আছে, নট, নাপিত আর নর্তক বয়স হোলে অকর্মণ্য হয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই অভিনয়-শক্তি ম্লান হোয়ে যায়। নটকে আশ্রয় করেই তো নাট্যশালার শ্রী। নটের বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সেই শ্রী—সেই সৌন্দর্যের উপরে যবনিকাপাত অবশ্যম্ভাবী। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা থিয়েটারের ওপর সেই যবনিকা নেমে এসেছিল অনিবার্যভাবেই। যা ছিল একদিন দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত, তার ওপর নেমে এল অন্ধকার।

সেই যবনিকা একদিন বলিষ্ঠ হাত দিয়ে তুলে ধরলেন প্রতিভাবান এক নবীন নট। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ.—মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক। এইবার আমরা নটের আবির্ভাবের সেই কাহিনী বলব। কিন্তু তার আগে প্রসঙ্গত আর একজনের কথা উল্লেখ করব। তিনি আচার্য মন্মথমোহন বসু—বাংলা থিয়েটারের সর্বজনমান্য নাট্যানুরাগী 'মাষ্টারমশাই'। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংস্কারপ্রয়াসে তিনিই ছিলেন শিশিরকুমারের পূর্বসূরী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই কলকাতার স্কুল-কলেজে ছাত্রদের মধ্যে নাট্যচর্চা বা নাটকাভিনয় একরকম বিরল হোয়েই এসেছিল। মন্মথমোহন তখন স্কটিশচার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আবাল্য নাট্যানুরাগী এবং থিয়েটার-প্রেমিক এই মানুষটির দৃষ্টি পড়ল এই দিকটিতে। রঙ্গমঞ্চের ওপর ছিল তাঁর প্রাণের দরদ। গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতলালের প্রতিভা এবং প্রযত্নে যে সাধারণ নাট্যশালা গড়ে উঠেছে, তার ক্রমপরিণতি তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করতেন এবং কোন্‌খানে এসে রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি বাধা পাচ্ছে তাও তিনি অনুভব করলেন। দিক্‌পাল সব অভিনেতা, একাধিক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, একাধিক মঞ্চ, কত নাটক, শক্তিমান কত সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষক—এতগুলি জিনিসের সমাবেশ সত্ত্বেও দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই বাংলা থিয়েটার যেন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় যেন একটা ত্রুটি, একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। মন্মথমোহনের দৃষ্টিতে সেই ত্রুটি ধরা পড়ল—তিনি বুঝলেন এর সংস্কার ব্যতিরেকে রঙ্গমঞ্চের আর উন্নতি নেই। তখন থেকেই তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে

সচেষ্ট হলেন। তিনি তখনই বুঝেছিলেন, থিয়েটারে যে জিনিসটার অভাব রয়েছে—অভিনয়ে সামগ্রিকতা—তার প্রতিকার করতে হোলে শিক্ষিত নটের প্রয়োজন। তারপর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট স্থাপিত হোল এবং আট বছর পরে ইনষ্টিট্যুটে কলেজের ছাত্র-সদস্যদের নিয়ে যখন নাট্যাভিনয় শুরু হোল, তখন থেকেই তিনি নাট্যশিক্ষকরূপে আত্ম-প্রকাশ করে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা প্রবলভাবে জাগিয়ে তোলেন। যে ইনষ্টিট্যুটের অভিনয়কে আশ্রয় করে শিশিরকুমার তাঁর ভবিষ্যৎ নটজীবনের সূচনা করেছিলেন, তার নাট্যবিভাগের কর্ণধার ছিলেন মন্মথমোহন বসু। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কৃষ্টিকলা সাধনার যে কতবড়ো প্রয়োজনীয়তা আছে, তা সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি করে বুঝেছিলেন বলেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কৃষ্টিসাধনার পীঠস্থানে পরিণত করে তুলেছিলেন। এইখানেই তিনি একদিন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন নবযুগের প্রতিভাবান নট শিশির-কুমারকে। এই দুর্লভ যোগাযোগের ফলেই গিরিশোত্তর বাংলা থিয়েটারের সংস্কারের পথ কিভাবে সুগম হয়েছিল, সে ইতিহাস তো আমরা প্রত্যক্ষই করেছি।

দশঘড়ার এক সুপ্রাচীন কায়স্থ বংশের সন্তান, মালাধর বসুর বংশধর মন্মথমোহন বসুর জন্ম ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। শিক্ষক, সমালোচক, সাহিত্য-রসিক নাট্যকার এবং নাট্যশিক্ষক মন্মথমোহন বসুর সমগ্র জীবনটা বলতে গেলে বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁর কর্মের কেন্দ্র ছিল স্কটিশচার্চ স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌। এই শিক্ষাব্রতীর কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছিল স্কটিশচার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং তখনই তিনি কলেজের বাংলা ক্লাসে পড়াতেন। পরবর্তীকালে তিনি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। পরে তিনি Emeritus professor নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেকচারার হিসাবে তিনি

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ওপর উহাই সর্বোত্তম আলোচনা হিসাবে স্বীকৃত। বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সভাপতি (১৯৪৫ ও ১৯৪৬) হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিবিধানে মন্মথমোহনের দান অবিস্মরণীয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই দুই যুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল তাঁর জীবন। বিংশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময় এই একটি মানুষ যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার মতন। বিদগ্ধ ও সাহিত্যরসিক মন্মথমোহনের wit-এর দীপ্তি একদা বহু সাংস্কৃতিক সভা ও জনসভাকে উদ্ভাসিত করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। জীবনের দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল তিনি শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি বাংলাভাষায় তাঁর রায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই একটি মানুষের উদ্যম ও উৎসাহের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর আচার্য বসুর ৮১তম জন্মদিবস উপলক্ষে স্কটিশের প্রাক্তন ছাত্ররা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন শিশিরকুমার। সেদিন তিনি বলেছিলেন: "আমার জীবনের এক স্মরণীয় ক্ষণে নটের বৃত্তি গ্রহণ করবার সময়ে আমি আচার্য মন্মথমোহনের কাছ থেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম। তিনিই আমার জীবনের গতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলে বাংলাদেশের পেশাদার মঞ্চে দেখা দিল নূতন জীবন।" জীবনের শেষ বয়সে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন শিশিরকুমারের মৃত্যুতে। "পিতার শ্রাদ্ধ পুত্রে করিয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি দৈবক্রমে পিতাকে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহা কিরূপ কষ্টকর সকলেই বুঝিতে পারেন। শিশিরকুমার ছিল আমার পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ শিষ্য।"—শিশিরকুমারের মৃত্যুতে স্কটিশ-

চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত একটি শোক সভায় এক লিখিত ভাষণে তিনি এই কথা বলেছিলেন। জীবনের শেষ বয়সেও তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সর্বদেশের পূজা পার্বণ সমূহের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, দেখেছি। তাঁর 'আঁধারে আলো' নাটকখানি বহুকাল রাতের পর রাত মিনার্ভা থিয়য়টারে অভিনীত হয়েছিল। 'আমি ও আমার দেহ', অধ্যাপক বসুর আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক ; এমন সরস দার্শনিক পুস্তক বাংলা ভাষায় বিরল। জীবনে যাঁকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন, যাঁর মাধ্যমে তিনি রঙ্গালয়ে আকাঙ্খিত সংস্কার সাধনে সফলকাম হযেছিলেন, সেই প্রিয়তম শিষ্য ও ছাত্র শিশিরকুমারের মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পরে (১৪ই অক্টোবর, বুধবার, ১৯৫৯) আচার্য মন্মথমোহন বসুর মৃত্যু বিংশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন তথা এর নাট্যশালার ইতিহাসে একটি শোকাবহ ঘটনা হিসাবেই পরিগণিত হবে। তাঁর 'মাষ্টারমশাই'-এর কথা বলতে কত সময়ে শিশিরকুমারকে উচ্ছ্বসিত হোতে দেখেছি। বলতেন: "মাষ্টার মশাই না থাকলে আমার পক্ষে ষ্টেজে আশা হোত কি না সন্দেহ।"

মন্মথমোহনের কথা আরো একটু বলব। "Ring out the old, ring in the new"—এরই জীবন্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। নব্বুই বছরেও তাঁর মধ্যে নূতন কিছু করার উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেই কালো আচকান, বিরলকেশ মাথা, হাসিমুখ আর চোখ-ঘোরানো ভদ্রলোকটি শহরের তখনকার দিনের প্রায় সব নাম-করা ক্লাবের নাট্যশিক্ষক ছিলেন। সর্বজন পরিচিত মোশন্ মাষ্টার। এ্যামেচার ক্লাব, পেশাদার থিয়েটার—সর্বত্রই তাঁর প্রয়োজন হোত। বাড়ি বাগবাজার। বাগবাজারের সঙ্গে কলকাতার থিয়েটারের নাড়ীর যোগ। শুধু কি থিয়েটার? হাজারটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ। অফুরন্ত আনন্দ পেতেন সভায় বক্তৃতা করতে। সবরকম বিষয়ের ওপর বলার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সাহিত্যবাসর, স্মৃতিসভা, পুরস্কার বিতরণ উৎসব, গানের জলসা, নাট্যানুষ্ঠান, আর্তত্রাণ সমিতি থেকে পাড়ার বারোয়ারি পর্যন্ত—সর্বত্রই তাঁকে দেখা গিয়েছে। বাংলার অধ্যাপক, কিন্তু কলেজে পড়িয়েছেন যখন যা হঠাৎ দরকার পড়েছে—ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান—এ কথা বলেছেন তাঁরই অন্যতম

ছাত্র, অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ইংরেজিতেও অধিকার ছিল যথেষ্ট, হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতন। শেষজীবনে দেখেছি খাটে শুয়ে শুয়ে, সেই লাল মোটা ফাউণ্টেন পেনটি দিয়ে শেষ গ্রন্থখানি রচনা করছেন। নব্বুই বছর বয়স, চশমা নিতে হয় নি। এমন জনপ্রিয় অধ্যাপক, এমন ছাত্রবৎসল শিক্ষক, বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পর, কলকাতায় খুব বেশি দেখা যায় নি। নিরহঙ্কার, অমায়িক, সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন মন্মথমোহন। সকলকে ভালবেসেছেন, সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় একযুগের মধ্যেই নানা কারণে বাংলা থিয়েটারের ক্রমাবনতি দেখা গেল। প্রথম কমার্শিয়াল ষ্টেজ স্থাপিত হবার দিন থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও বাংলা থিয়েটারের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয় নি এবং এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যাঁরা থিয়েটারের ব্যবসায় অগ্রণী হয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁদের কারোই দৃষ্টিভঙ্গি বা approach জাতির বৃহত্তর স্বার্থচেতনা নিয়ে উদ্দীপ্ত হোয়ে ওঠেনি—জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে রঙ্গমঞ্চের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, এই বোধ কি গিরিশযুগ, কি গিরিশোত্তর যুগের কোনো মঞ্চ-ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রত্যক্ষ হোয়ে ওঠে নি। থিয়েটারের ক্রমাবনতির এইটাই ছিল একটা মস্ত বড়ো কারণ। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতায় তিনটের বেশি থিয়েটারের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় নি, অথচ এই সময়ের মধ্যে এমারেল্ড, বীণা, সিটি, ক্লাসিক, কোহিনুর, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল প্রভৃতি দশ-বারটি থিয়েটারের উত্থান-পতন দেখা গিয়েছে। বাংলা থিয়েটারে দুইটি প্রতিভা—গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর—দীর্ঘকাল কখনো একত্রে কাজ করতে পারেন নি; কেবল-মাত্র বিংশ শতকের প্রথমে মিনার্ভায় যখন 'প্রতাপাদিত্য' নাটক মঞ্চস্থ হয় (১৯০৪) সেই সময়ে কিছুকালের জন্য আমরা এঁদের দুজনকে একমঞ্চে অবস্থান করতে দেখি। এই সময়ের মধ্যে বহু দল গড়েছে, বহু দল ভেঙেছে আবার কোনো একটি থিয়েটার দীর্ঘকাল একজনের স্বত্বাধিকারীত্বে অথবা পরিচালনাধীনে থাকে নি। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা থিয়েটার কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলতা ও বিরোধের ভেতর দিয়ে চলে এসেছে এতদিন। এই

দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো বড় সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির কথা নাট্যশালার ইতিহাসে দেখতে পাই না। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অজস্র নাটক ও প্রহসন বিভিন্ন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে, এক একখানা নাটক নামাতে কম-পক্ষে বিশ হাজার টাকার কম খরচ হয় নি, কিন্তু তার সবগুলি তো নয়ই, সেসব নাটকের অর্ধেকও ব্যবসাগত সফলতা অর্জন করে নি—তার প্রতিক্রিয়া অনেক সময়েই মঞ্চের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। বাঙালি দর্শক টাকা খরচ করে টিকিট কিনে এবং অন্যভাবেও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে কোনো দিন পরাঙ্মুখ হয় নি। বাংলার নাট্যানুরাগী একাধিক জমিদার থিয়েটারে অজস্র অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, কিন্তু তবু এর অর্থনৈতিক চেহারা ফেরে নি, এর সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (নাম করা দু'চারজন বাদে) অর্থনৈতিক মানও উন্নত হয় নি। থিয়েটারের ব্যবসাগত দিকটি সে যুগে দু'জন ঠিক ভালভাবে বুঝেছিলেন, গিরিশচন্দ্র ও মনোমোহন পাড়ে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র আজীবন পরের চাকরি করেছেন, থিয়েটারের সংগঠনে দিকটা তাই একরকম অবহেলিত হয়েই এসেছে। উন্নতির মধ্যে দেখা গিয়েছিল দুটি জিনিস, যথা,—অভিনয়ের ধারার রূপ-বিবর্তন, আর নাটক রচনার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবটাই ছিল এ-ক্ষেত্রে সক্রিয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে থিয়েটারের ক্রমাবনতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হোয়ে উঠল যেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার 'সাজান বাগান' তখন 'শুকিয়ে গেছে'—প্রতিভাবান নটদের কেউই বেঁচে নেই—একা দানিবাবু তখন স্থবির সিংহের মত পুরাতনের রোমন্থন করে চলেছেন, মঞ্চে তখন তাঁর নতুন কিছু দেবার ছিল না। থিয়েটারের ভিতর এবং বাইরের সৌন্দর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে। দানিবাবুর যুগের অভিনয়ের কথা মনে হলেই—সেই সারারাত্রিব্যাপী চিত্ত-বিনোদনের নামে ক্লান্তিকর চিত্তবিক্ষেপের কথাই সকলের আগে মনে পড়ে। তখনকার দিনের থিয়েটার মানেই আট আনার টিকিট কিনে সমস্ত রাত রঙ-বেরঙের অভিনয় দেখা। রাত শেষ হয়ে সকাল হোল—তখনো দর্শকসাধারণ নিদ্রাতুরা নৃত্যপরা ব্যালে গার্লদের অলস-অবশ-অবসন্ন চরণক্ষুণ্ণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন রঙ্গপীঠে অভিনয়-সুখ সম্ভোগ করতেন। তারপর বেলা

আটটার সময়ে ঘনঘোর এন্‌কোর সত্ত্বেও যবনিকা পড়তে দেখতে ক্ষুব্ধ চিত্তে চোখ মুছতে মুছতে রঙ্গালয় ত্যাগ করতেন। প্রসঙ্গত দানিবাবুর যুগের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার এখানে উল্লেখ করব। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩২৫, ৩২শে শ্রাবণ) মিনার্ভা থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্য 'কিন্নরী' মঞ্চস্থ হোল। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বক্স-অফিসের দিক দিয়ে 'আলিবাবা'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ অপেরা; 'কিন্নরী' আলিবাবার ট্রাডিসনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে—এই গীতিনাট্য অভিনয় করে মিনার্ভার প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল। কিন্নরী প্রথম-প্রথম ষ্টার ও মিনার্ভা—দুই থিয়েটারের অভিনীত হয়। তখন ষ্টারের পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্নরীর অভিনয়স্বত্ব নিয়ে দুই থিয়েটারে মামলা হয় ও ষ্টারের কর্তৃপক্ষ হেরে যান। এই মামলার ফলেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলা থিয়েটারে নাটকের অভিনয়স্বত্ব সম্পর্কিত প্রথম নিয়মাদি প্রচলিত হয়।

বাংলা থিয়েটার জগৎ তখন একরকম নিষ্প্রদীপ বললেই হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শহরে মাত্র তিনটি রঙ্গালয়—ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন—কোনো-মতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে গতানুগতিক ধারায় পুরাতনের জাবর কেটে চলছিল। প্রেক্ষাগৃহ মলিন, দর্শকদের বসবার আসনগুলি পীড়াদায়ক, শিল্পীদের বেশভূষায় তিন যুগের ছাপ পড়েছে, নূতন নাটক নেই, নাট্যকারও নেই। অপরেশচন্দ্র, দানিবাবু, মন্মথ পাল, কার্তিকচন্দ্র দে, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী তারক পালিত, প্রবোধ ঘোষ, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী প্রভৃতি গিরিশ যুগের পুরাতন নট-নটীরা প্রতি শনি, রবি ও বুধবার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাঁড়াতেন। নাট্যানুরাগী বাঙালি দর্শক, যারা রঙ্গ-মঞ্চকে চিরদিন ভালোবেসে এসেছে, ধূলিমলিন, হৃতসৌন্দর্য প্রেক্ষাগৃহে এসে তাঁদের অভিনয় দেখতেন আর ভাবতেন, এমনভাবে থিয়েটার আর ক'দিন চলবে? ঠিক এমনি সময়ে বাংলা থিয়েটারের ওপর দৃষ্টি পড়ল পার্শি ধনকুবের। জে. এফ. ম্যাডানের।

ম্যাডান সাহেব তখন ভারতবর্ষের চিত্রজগতের একচ্ছত্র অধিপতি। নির্বাক ছবির যুগে তিনিই ছিলেন সারা ভারতবর্ষে একাধিক ষ্টুডিও এবং চিত্রগৃহের মালিক এবং এই ব্যবসায়ে তিনি সাফল্যও লাভ করেছিলেন

অসামান্য। সবাক ছবির যুগ তখন আসন্ন হোয়ে এসেছে। কলকাতায় ম্যাডান সাহেবের কয়েকটি চিত্রগৃহ ছিল; সেগুলির মধ্যে একটি ছিল উত্তর কলিকাতায় খাস বাঙালি পাড়ায়—কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার (বর্তমানের 'উত্তরা')। সেই সময়ে তিনি ধর্মতলা ষ্ট্রীটে কোরিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে Parsi Theatrical Company নাম দিয়ে একটি থিয়েটারও খুলেছিলেন। এখানে উর্দু ও হিন্দীতে অভিনয় হোত। ম্যাডান সাহেবের সমস্ত কারবার চলতো একটি মূল নামে—Madan Theatre, বাঙালি যার নাম দিয়েছিল 'মদন থিয়েটার'। ম্যাডান থিয়েটারের আসল কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর জামাই রুস্তমজী ধোতিওয়ালা। তখন শহরে দর্শকদের মনে ধীরে ধীরে সিনেমার প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। বাঙালি যে থিয়েটার ভালবাসে, সেটা কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে বাঙালি দর্শকের সমাগম থেকেই রুস্তমজী বুঝতে পারলেন। পার্শি থিয়েটারে সূক্ষ্ম শিল্পকলাসম্মত সুরুচিপূর্ণ অভিনয়ের বালাই ছিল না, কেবল "অজস্র অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আলোর দুর্দান্ত খেলা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতেন তাঁরা। ভাষা না বুঝলেও বহু বাঙালি দর্শক শুধু এই বিস্ময়কর দৃশ্যপটের বাহার দেখতেই দলে দলে সেখানে টিকিট কাটতেন।" রুস্তমজী তখন কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু থিয়েটারের সুযোগ নিতে আর এক পদ অগ্রসর হলেন। একেবারে খাস বাঙালি পাড়াতেই কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে তিনি খুললেন 'বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি'। কর্ণওয়ালিশের পাশেই তৈরি হোল আর একটা নতুন চিত্র-গৃহ—ক্রাউন সিনেমা। (বর্তমান 'শ্রী')। রঙ্গালয় আর চিত্রগৃহ—কলকাতায় সেই প্রথম পাশাপাশি দেখা দিল। যান্ত্রিক শিল্পের পাশে স্বাভাবিক শিল্প। ম্যাডান সাহেব বাংলা থিয়েটার খুলছেন—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে কলকাতায় এটি একটি বড়ো রকমের সংবাদ হিসাবে নাট্যামোদী জনসাধারণের মনে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন। বাংলা মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের তুলনায় পার্শি থিয়েটারের আলো-ঝলমল ষ্টেজ এবং আরামপ্রদ অডিটোরিয়াম দেখে ইতিমধ্যেই বাঙালি দর্শকের মনে জেগেছে ম্যাডান-প্রীতি। তারপর ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন থেকে বেশি টাকা মাইনে দিয়ে তখনকার নাম-করা কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে

নবগঠিত বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিতে নিয়ে এলেন রুস্তমজী সাহেব। সেই সঙ্গে কোম্পানির প্রধান নাট্য উপদেষ্টা ও পরিচালক হয়ে এলেন আগা হিস্‌সার কাশ্মীরি। আগা ছিলেন উর্দু কবি, নাট্যকার এবং অভিনেতা। ইনি কোরিন্থিয়ানের জন্য নাটক লিখতেন। হিন্দী এবং উর্দু পাঠকদের কাছে আগার খুব সুনাম ছিল। আগা সাহেবের লেখা 'অপরাধী কে?' নাটক দিয়ে এই নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন হবে, এই ঠিক হোল। প্লাকার্ডে প্লাকার্ডে শহর ছেয়ে গেল। অজস্র অর্থ ব্যয় করে জমকালো দৃশ্যপট আর পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরি হোতে লাগল। কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের ভিতর ও বাহির সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত হোল। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য নেই, আয়োজনে ত্রুটি নেই।

অতঃপর? শিশিরকুমারের আবাল্য বন্ধু এবং তাঁর নটজীবনে ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বাংলার রঙ্গালয়-গুলির তখন প্রায় ভগ্ন অবস্থা। নৃপেন বসু, সত্যেন দে, মনোমোহন গোস্বামী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল দত্ত, গোপালদাস ভট্টাচার্য ও অভিনেত্রীদের মধ্যে কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী প্রভৃতি ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। মহাসমারোহে আগা সাহেবের পরিচালিত নাটক আরম্ভ করা হোল। কিন্তু কয়েক রাত্রি যেতে না যেতে ম্যাডান কোম্পানি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের হিন্দী-উর্দু রৌদ্র-করুণরসের প্যাঁচ বাঙালি দর্শকের কাছে হাস্যরসের উদ্রেক করে। সে সময়ে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের অভিনয় করে দিগ্বিজয়ী হয়ে পড়েছেন। ম্যাডান কোম্পানি খুঁজে খুঁজে শিশিরকুমারকে তাঁদের এই বাংলা থিয়েটারের পরিচালনার ভার দিলেন।"

শিশিরকুমার তখনও মেট্রোপলিটানের অধ্যাপক। ১৯১৪-র জুলাই থেকে ১৯২১-এর ১৪ই জুলাই পর্যন্ত মোট সাত বছর তিনি অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী ছিলেন। শিশিরকুমারের স্থলে নিমাই মৈত্র ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে আসেন এই কলেজে। ১৯২১-এর সেসন আরম্ভ হবার আগেই তিনি অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে নটের বৃত্তি গ্রহণ করেন। রুস্তমজীর সঙ্গে কথা-বার্তা যখন পাকাপাকি হয়, তখন তিনি তাঁর মাষ্টারমশাই মন্মথমোহন বসুর কাছে সকলের আগে গিয়েছিলেন পরামর্শ করবার জন্য। তিনিই তাঁকে

উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "শিশির তোমার স্থান মঞ্চে, কলেজের লেকচার রুমে নয়। থিয়েটার ডুবতে বসেছে, একে টেনে তুলবার মত প্রতিভা তোমার আছে। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সফলতা লাভ করবে।" শুধু কি আশীর্বাদ আর মৌখিক সমর্থন? সেইসঙ্গে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁর অন্যতম পুত্র অমিতাভ বসুকে (ইনি তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন) উপহার দিয়েছিলেন শিশিরকুমারের সঙ্কল্পের বেদীমূলে। কলেজে মাইনে পেতেন দেড় শো টাকা, ম্যাডান থিয়েটারে মাইনে হোল সাড়ে সাত শো টাকা। তখনকার দিনে একজন অভিনেতার এত টাকা মাইনে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। তিনি নটের বৃত্তি গ্রহণ করবেন কি না, এই কথা শিশিরকুমার স্যার আশুতোষকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। শিশিরকুমারকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতে। সব শুনে প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "যদি কলেজের চাকরিতে তোমার মন না বসে বা পেট না ভরে তা'হলে আমি তোমাকে ইউনি-ভার্সিটিতেই নেব; আর যদি তুমি decide করে থাক যে stage-এ join করবে তা'হলেও বলব যে সব পেশাই সমান সম্মানজনক—every profession is honourable."। আর দ্বিধা রইল না। তিনি ম্যাডান কোম্পানির চুক্তিপত্রে সই করলেন।

রঙ্গমঞ্চে কলেজের অধ্যাপকের যোগদানের দৃষ্টান্ত কিন্তু এই প্রথম নয়। শিশিরকুমারের বহু পূর্বে স্কটিশের কৃতী অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে থিয়েটারে যোগদান করেছেন নাট্যকার হিসাবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অপরেশচন্দ্র যখন কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন তার কিছু পূর্ব থেকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপনাতে ইস্তফা দিয়ে স্থায়ী নাট্যকার হিসাবে ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেছেন। এই ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে শিশিরকুমারের মিলন হোল ম্যাডান থিয়েটারে। শিশিরকুমারের নির্দেশমত রুস্তমজী নাটক লিখবার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করলেন। বাংলা থিয়েটার জগতের তিনিই তখন জনপ্রিয় নাট্যকার। দুই প্রতিভার মিলনের ফল ভালই হয়েছিল। শিশিরকুমার কিন্তু আগা সাহেবের নাটকে অবতীর্ণ হলেন না। কারণ সেই নাটক তাঁর

পছন্দমত ছিল না। তা ছাড়া, শিশিরকুমারের সূক্ষ্ম রুচির সঙ্গে উর্দু কবির স্থূল রুচির সামঞ্জস্য ঘটবার কোনো হেতুই ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে তিনি নূতন নাটক লেখালেন। এই নাটক রচনার ইতিহাস শিশিরকুমারের মুখে আমি শুনেছি। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে আলোচনা হয়। ম্যাডান কোম্পানি জাঁকজমক পছন্দ করে—ঐতিহাসিক নাটক ভিন্ন জাঁকজমকের সুযোগ কোথায় ? ঠিক হোল মুঘলযুগের একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে একখানি নাটক লেখা হবে। বাবর থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত সব কয়টি চরিত্রকে সামনে হাজির করা হোল। তালিকা থেকে প্রথমেই সম্রাট সাজাহানকে বাদ দেওয়া হোল—দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'-এর পর ঐ চরিত্র নিয়ে আর কোনো সার্থক নাটক রচনা করা সম্ভব নয়। তখনো পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চে মূল চরিত্র হিসাবে ঔরংজেবের আবির্ভাব ঘটে নি। 'সাজাহান' এবং 'ছত্রপতি' নাটকে ঔরংজেব পার্শ্ব-চরিত্র মাত্র। ঠিক হোল ঔরংজেবকে মূল চরিত্র করে একখানা নাটক লিখতে হবে। তারপর আলোচনা হোল ঔরংজেবের চরিত্রের কোন্ aspect-কে নাটকের উপজীব্য করা হবে—তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নানা অধ্যায়ে নানা কাহিনী পল্লবিত হয়ে রয়েছে। স্যর যদুনাথ সরকারের বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ 'ঔরংজেব' তখন প্রকাশিত হোয়ে ঐতিহাসিক মহলে একটা নূতন আলোড়ন এনে দিয়েছে। শিশিরকুমার সেই বই আনিয়ে পড়লেন। তারপর সেই বই থেকে এই বহু-ভঙ্গিম চরিত্রের মানুষটির প্রকৃতির একটা aspect সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত পেলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদকে তিনি সেটা বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন। সুদীর্ঘ-কাল তিনি থিয়েটারের নাটক লিখে আসছেন, এমনভাবে নাটক লেখার কথা ক্ষীরোদপ্রসাদ কখনো শোনেন নি বা দেখেন নি। শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা জাগল। বুঝলেন এই মানুষটির মধ্যে রয়েছে একাধারে একজন নট এবং কবি। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর পরিণত প্রতিভা প্রয়োগ করে লিখলেন সেই নাটক। নাটক পছন্দ হোল শিশিরকুমারের, কিন্তু এর নামকরণ নিয়ে গোল বাধল। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে নাম দিয়েছিলেন 'উদিপুরী', পরে পরিবর্তন করে নাম দিলেন 'বিজয়িনী'। এ দুটো নামই শিশিরকুমারের পছন্দ হোল না। পরে তিনি একদিন বললেন—"ক্ষীরোদদা,

নাটকের নাম হবে 'আলমগীর', কি বলেন ?" অভিজ্ঞ নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ এমন চমৎকার নামকরণে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই প্রকাশ করে-ছিলেন। এই নাম—'আলমগীর'—যুগপৎ নাটক, নাট্যকার এবং মূল চরিত্রাভিনেতা শিশিরকুমারকে বাংলা থিয়েটার-জগতে এক অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী করে দিয়েছিল। বাংলা থিয়েটারের নাটকের তালিকায় চির-স্মরণীয় কয়েকখানি নাটকের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'আলমগীর' একটি। শিশিরকুমার বলতেন, "নাটক হিসাবে আলমগীরের দুর্বলতা অনেক, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য একটি বিরাট ঐতিহাসিক চরিত্রের একটি বিশেষ aspect-এর রূপায়ণে এবং এক বিশেষ ভঙ্গির সংলাপের জন্য। এমন dialogue ক্ষীরোদবাবু ভিন্ন আর কারো কলমে আসত না। এই নাটকের অভিনয়ে আমি তাই কখনো ক্লান্তি বোধ করি না।"

নাটক লেখা হোল। রিহার্স্যাল আরম্ভ হোল। উদিপুরীর ভূমিকায় কুসুমকুমারী, নামভূমিকায় শিশিরকুমার। রিহার্স্যাল দিতে অসুবিধায় পড়লেন শিশিরকুমার। দুই-একজন বাদে নট-নটী সবই পুরাতন যুগের—তাদের অভিনয়ের ধরণ-ধারণে থিয়েটারের প্রচলিত প্রথার ছাপ। কোনো রকমে মানিয়ে নিতে হয় তাঁকে। শহরে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত বিরাট প্রাচীরপত্র (Poster) পড়েছে :—

ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত

কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে

বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর নাট্যনিবেদন

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.-বিরচিত

নূতন ঐতিহাসিক নাটক

আলমগীর

নাম-ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ.

নাট্যরসিকমহলে তুমুল চাঞ্চল্য—পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং ইনষ্টিট্যুটের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুমার যোগ দিয়েছেন! কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সেদিন এই একটি সংবাদ যে আলোড়নের সৃষ্টি

করেছিল, বাংলা থিয়েটারের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন আর কখনো দেখা যায় নি। এ জিনিস সেদিন অভাবনীয় ছিল বলেই বিস্ময়ের মাত্রা এত বেশি হয়েছিল।

শৌখিন নটরূপে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। তখনকার দিনে পরিচ্ছন্ন এবং যথার্থ শিল্পসুষমামণ্ডিত নাট্যাভিনয় বলতে শহরের বিদগ্ধজনরা বুঝতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক অভিনয়। সেই ঠাকুরবাড়ির বাইরে সাধারণ মঞ্চে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রযোজনানৈপুণ্য সেদিন শিক্ষিত দর্শকদেব জানিয়ে দিয়েছিল যে, ভীম ও ব্রাহ্মণের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করলেন সেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী নামক লোকটি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর নটই নন, তাঁর প্রয়োগপটুতাও নূতন ধরণের। গিরিশচন্দ্রের পুরাতন পালা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'কে এক নূতন রূপ দিয়ে সেদিন পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "সাজপোষাক ও অভিনয়ের নূতন ভঙ্গিও দিলে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলাম। মনে বারম্বার প্রশ্ন জাগতে লাগল, অধঃপতিত বাংলা নাট্যজগতে এতদিন যাঁর পদধ্বনি শোনবার জন্য নিরাশার মধ্যেও আশার স্বপ্ন দেখেছিলাম, ইনিই কি তিনি?"

সেই আশার স্বপ্নকে সার্থক করে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর। ম্যাডান কোম্পানি যখন বাংলা থিয়েটারের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তখন বাংলা নাট্য-জগতে দানিবাবুরই অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা। তাঁকে নিয়েই মনোমোহনের আসর জমজমাট ছিল। রুস্তমজীর দৃষ্টি তাই প্রথমে তাঁরই ওপর গিয়ে পড়েছিল; কিন্তু কথিত আছে যে, মনোমোহনের অধ্যক্ষতা আর লাভের অর্ধাংশ ছেড়ে যেতে তিনি সম্মত হন নি। তখনই ম্যাডান কোম্পানির আহ্বানে শিশিরকুমার এসে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। রঙ্গালয়ে একটি নূতন প্রতিভার আবির্ভাবের উপলক্ষ হয়ে থাকার জন্য বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ম্যাডান সাহেব তথা রুস্তমজীর নাম চিরস্মরণীয়

হয়ে থাকবে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'আলমগীর'-এর প্রথম রজনীর অভিনয় সম্পর্কে শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন: "প্রথম দৃশ্যেই শিশির এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে দর্শকসাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল। সমস্ত ষ্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর শিশির। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসছে যাচ্ছে কিন্তু লোকে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী যাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে। আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা। অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রনীশক্তি। আলমগীর নাটকের শেষ দৃশ্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন রাণা রাজসিংহের কৌশলে দোবারির গিরিবর্ত্মে সসৈন্যে আটকা পড়েছিলেন, সেই সময়ে কয়েকদিনের অনাহারে তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক অবস্থায় শিশিরের সেই কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি বোধ হয় পৃথিবীর যে কোন অভিনেতার পক্ষে গৌরবের কথা।"

এই দিনটি থেকে তিপ্পান্ন বছর আগে বাঙালি আর একজন নটের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সধবার একাদশী নাটকে 'নিমচাঁদ'-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে প্রথম রজনীতেই তিনি দর্শক-চিত্তে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। আজ তিপ্পান্ন বছর পরে নাট্যামোদী বাঙালি দর্শক অনুরূপ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। সূক্ষ্ম শিল্প-কলার অভিনব অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন নবযুগের নবীন নট শিশিরকুমার ভাদুড়ি। হিন্দুস্থানের জিজিয়াখ্যাত বাদশাহ আলমগীরের ঐতিহাসিক জটিল চরিত্রের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় সেদিন সেই শুভ সন্ধ্যায় সত্যই এক নটের মহিমান্বিত আবির্ভাবকে আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল। "দেশজুড়ে একটা আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল। নাট্য-রসবেত্তা শিক্ষিত সজ্জনগণের কণ্ঠে ধন্য ধন্য রব উঠল।" বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা এইখান থেকেই। সূচনা বলছি এইজন্য যে, শিশিরকুমারের অভিনয়ই ছিল আলমগীরের প্রথম এবং শেষ কথা।

এখানে তিনি অভিনেতারূপেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়োগ-প্রতিভার কোনো নিদর্শনই 'আলমগীরে' ছিল না, থাকবার কথাও নয় ; শোনা যায়, প্রয়োগকর্তারূপে এখানে তাঁর কোনো স্বাধীনতা ছিল না ; যে প্রতিভা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রযোজনায় দেখা গিয়েছিল, 'আলমগীরে' তার অভাব ছিল ষোল আনা। আগা সাহেবের স্থূলরুচির ছাপ ছিল আলমগীরের জমকালো দৃশ্যপট ও সাজসজ্জায় আর অসঙ্গতিপূর্ণ নৃত্যগীতের মধ্যে। তবু এরই মধ্যে সেদিন রঙ্গমঞ্চে বিঘোষিত হয়েছিল প্রত্যাশিত প্রতিভার আবির্ভাব।

সে-প্রতিভা শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

॥ ৬ ॥ নবযুগের প্রস্তুতিপর্ব

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটা বড়ো রকমের turning point বা দিক-পরিবর্তনের সময় বলে পরিগণিত হবে। আলমগীরের বিস্ময়কর অভিনয় এবং অজস্র দর্শক সমাগম প্রাচীনপন্থীদের বুঝিয়ে দিলে যে, গতানুগতিক ধারায় থিয়েটার চলবার দিন সত্যই শেষ হয়ে এসেছে। আলমগীরের পর 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'রঘুবীর' নাটকে যথাক্রমে শিশিরকুমারের চাণক্য ও রঘুবীরের ভূমিকাভিনয় সেই ধারণাকে আরো স্পষ্টতর করে দিল। ম্যাডানে শিশিরকুমারের চাণক্য ও রঘুবীরের অভিনয় সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঐখানে থাকতে থাকতেই তিনি নিজের বিচিত্র প্রতিভার আরো দুটি অপূর্বরূপ দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিলেন। সে সময়ে বাংলা দেশে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য বলতে বোঝাত একমাত্র দানিবাবুকেই। দানিবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ঐ ভূমিকা গ্রহণ করবার সাহস ছিল না আর কোনো অভিনেতার। কিন্তু নবীন শিশিরকুমার ঐ জটিল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেখিয়ে দিলেন, অভিনেতা প্রতিভাধর হ'লে বহু-অভিনীত যে কোন ভূমিকাকেই সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন নূতন রসে ও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে।" শিশিরকুমার তাই-ই করেছিলেন। আলমগীরের পর চাণক্য ও রঘুবীরের অভিনয় প্রচলিত অভিনয় ধারা থেকে একটা সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম বলে সকলের কাছে মনে হোল। "ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক নিয়ে যখন শিশিরকুমার পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ালেন তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, দৃপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকদের চিত্রার্পিত করে প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিল। সারা নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হোল।" তাঁর অভিনয়রীতির স্বাতন্ত্র্য ও নিগূঢ় রসাঢ্য ভাব মঞ্চের ওপর

নিয়ে এলো নূতনের ইঙ্গিত। কিন্তু এ দুটি নাটকেও তিনি অভিনেতা হিসেবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

ম্যাডান থিয়েটারে শিশিরকুমার কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারলেন না। কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই তিনি বুঝেছিলেন যে এই সোনা-রূপো-মোড়া দৃশ্যপট-সমন্বিত মঞ্চ আর শলমাচুমকীর জৌলুস ভরা পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে তাঁর মতো কলারসিক অভিনেতার স্থান হোতে পারে না। "রঘুবীর নাটক কয়েক মাস চলার পরই ম্যাডান কোম্পনির সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে শিশিরকুমার বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।" হাজার টাকা মাইনের প্রলোভন দেখিয়েও রুস্তমজার পক্ষে শিশিরকুমারকে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। তিনি যদি কেবলমাত্র প্রতিভাবান নট হতেন তা'হলে এই সম্পর্কচ্ছেদ হয়ত এত দ্রুত ঘটত না, কিন্তু প্রতিভার সঙ্গে তাঁর ছিল স্বাধীন-চিত্ততা। এই স্বাধীন প্রকৃতিই তাঁকে তাঁর নটজীবনে কারো অধীনে চাকরি করতে দেয় নি। স্বাধীন প্রকৃতি আর আদর্শনিষ্ঠা—এই দুইটিই ছিল শিশির-কুমারের স্বভাবের প্রবল বৃত্তি। কেবলমাত্র প্রতিভাবান নট হোলে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয় সংস্কার তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হোত কি না সন্দেহ—কিন্তু তাঁর প্রতিভার সঙ্গে মিলেছিল একটা দুর্দমনীয় স্বাধীন প্রকৃতি আর সুকঠিন আদর্শনিষ্ঠা। বিগত শতাব্দে রেনেসাঁসের যুগে বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের মধ্যে একদা আমরা দেখেছি এমনি প্রতিভা, আদর্শনিষ্ঠা আর স্বাধীনচিত্ততার সমাবেশ। আর এই শতাব্দে বাংলা নাট্যজগতে সেই জিনিস আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শিশিরকুমারের মধ্যে। বিপ্লবীর সকল গুণ নিয়েই তিনি সেদিন রঙ্গজগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাই ধনকুবের ম্যাডানের সাধ্য হয় নি রূপোর শিকল দিয়ে সেই বিপ্লবী প্রতিভাকে বেঁধে রাখার।

শিশিরকুমার তথা ম্যাডান থিয়েটারের সাফল্য থেকে ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহনের কর্তৃপক্ষরা একটা বড়ো রকমের ইঙ্গিত পেলেন। তাঁরা বুঝলেন পুরাতন যুগের নট-নটীর সঙ্গে কিছু নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানী করতে না পারলে এবং ম্যাডান থিয়েটারের মতন দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু জমকালো ভাব না আনতে পারলে থিয়েটার আর চালানো কঠিন হবে। এই ইঙ্গিতকে প্রথম ধরতে পেরেছিলেন উপেন্দ্রনাথ

মিত্র। তিনি তখন মিনার্ভার মালিক, পুরাতনদের মধ্যে তিনিই মঞ্চে নূতন অভিনয় ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে এই সময়ে যোগদান করেন নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রগুপ্ত তখনকার দিনের একমাত্র জনপ্রিয় নাটক; জনপ্রিয় অর্থে Box office draw করবার ক্ষমতা বুঝতে হবে। সেই চন্দ্রগুপ্ত নাটক মিনার্ভা সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করলেন। চাণক্যের ভূমিকায় নরেশ মিত্র আর এ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় রাধিকানন্দ, অন্যান্য ভূমিকায় মিনার্ভার শিল্পীবৃন্দ। সাজপোশাক যথাসম্ভব নূতন। এখানে চাণক্য অপেক্ষা রাধিকানন্দের এ্যান্টিগোনাস-এর সুখ্যাতি বেশি হোল। তার কারণ এতকাল এই নাটকের অভিনয়ে এই চরিত্রটি ছিল নিতান্ত গৌণ এবং উপেক্ষিত; তাই যেমন-তেমন অভিনেতাকে নামানো হোত এই ভূমিকায়। প্রতিভাবান এবং সুশিক্ষিত অভিনেতা রাধিকানন্দই মঞ্চে সর্বপ্রথম এই চরিত্রটির একটি নূতন রূপারোপ করেন। এই সময়ে মিনার্ভায় 'প্যালারামের স্বদেশিকতা' নামে একখানা চটুল প্রহসনেরও অভিনয় হয়। তাতে রাধিকানন্দ নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এক আশ্চর্য ধরণের অভিনয় করে সকলকে চমকিত করে দেন। মিনার্ভা থিয়েটার সে সময়ে অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে উপেন্দ্রবাবুকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাগিনেয়, আধুনিক যুগের বাংলা থিয়েটারের একজন যশস্বী পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "তিনি তিন বৎসর যাবৎ নূতন মঞ্চগৃহ নির্মাণের আশায় থাকিয়া মিনার্ভা সম্প্রদায়টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার অমানুষিক চেষ্টায় বিব্রত হইতেছিলেন। আমি মামাবাবুর মত এমন ধৈর্যশীল থিয়েটার প্রোপ্রাইটার কখনও দেখি নাই।"

মিনার্ভার পুরাতন বাড়ি পুড়ে যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। মনোমোহন থিয়েটারের জীবনীশক্তি তখন নিঃশেষিত প্রায়; সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হবার আগে "প্রদীপের শেষ ঔজ্জ্বল্যের মত" 'বঙ্গেবর্গী' নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কিছুকাল তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বৃদ্ধ দানিবাবুকে এখানে ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করতে হোত। ১৯২৩-এর বড়দিনে শিশিরকুমার গড়ের মাঠের প্রদর্শনীতে তাঁবু খাটিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকের অভিনয় করেন তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে। এই প্রসঙ্গে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

লিখেছেন : "বিলেতে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিশন হবার মহড়াস্বরূপ তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একজিবিশন হচ্ছিল। সেই সূত্রে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খুব বড়ো একটা প্রদর্শনী খোলা হয়। এখানকার আনন্দ-পরিবেশকের দলেরা শিশিরকে ডাকলেন তাঁদের ওখানে অভিনয় করবার জন্য। এইখানে ভাঙা মঞ্চের ওপর ভাঙা দল নিয়ে শিশির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটক অভিনয় করলে। অভিনয় খুব উঁচুদরের হোল কিন্তু সে অনুপাতে অর্থাগম কিছু হোল না।" এই অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরি, অমিতাভ বসু, প্রভা প্রভৃতি। মাত্র কয়েক রাত্রির অভিনয়, তবু সেদিনকার এই একজিবিসন-'সীতা'র স্মৃতি নাট্যামোদী দর্শকদের চিত্তে আজো অম্লান হয়ে আছে।" কথিত আছে যে, "প্রদর্শনী ফেলে লোকে ছুটতে শুরু করলো শিশির ভাদুড়ার অভিনয় দেখতে।"

এই সময় থেকেই একটা স্থায়ী মঞ্চ নিয়ে নিয়মিতভাবে অভিনয় করার জন্য শিশিরকুমার সচেষ্ট হতে থাকেন। ইডেন গার্ডেনে 'সীতা' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সেই জনপ্রিয়তার উত্তাপকে তিনি মিলিয়ে দিতে চাইলেন না—ঐ নাটক দিয়েই তিনি কোনো একটা মঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করবেন সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁর এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হবার পথে তাঁকে কি কি প্রবল বাধার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল, সে ইতিহাস পরে বলছি। তার আগে আর্ট থিয়েটারের কথা বলতে হয়। অভিনেতা ও নাট্যকার হিসাবে খ্যাত হবার পর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দশ বছরের জন্য ষ্টার থিয়েটার লীজ গ্রহণ করেন। এইখানে তাঁর স্বরচিত এই নাটকগুলির অভিনয় হয়, যথা—রাখীবন্ধন (১৯২০); ছিন্নহার, (১৯২০); অযোধ্যার বেগম (১৯২১); বাসবদত্তা, (১৯২১); অপ্সরা (১৯২২); সুদামা (১৯২২)। এইগুলির মধ্যে 'অযোধ্যার বেগম' নাটকখানি সবচেয়ে জমেছিল এবং অর্থাগমও বিশেষরূপে হয়েছিল। এর বিভিন্ন ভূমিকালিপি এই রকম ছিল : মিরকাশিম—চুনিলাল দেব; হাফেজ রহমত—অপরেশচন্দ্র; বেগম—তারা-সুন্দরী; ছায়া—কৃষ্ণভামিনী; জিন্নৎ—নীহারবালা। 'সুদামা' খুলবার

সময়েই, ১৩২৯ সালের ১৩ই আশ্বিন ৺বিজয়াদশমীর দিন (ইংরেজি ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২), 'কর্ণার্জুন' বিজ্ঞাপিত হয়েছিল মাত্র। প্রায় তিন বছর ষ্টার থিয়েটার চালিয়ে সেরূপ আর্থিক সুবিধা করতে পারলেন না অপরেশচন্দ্র। শেষটায় তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আর্ট থিয়েটার কোম্পানিকে ১৩২৯ সালের শেষভাগে থিয়েটার সাব-লীজ দেন। কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্যব্যক্তি এই লিমিটেড কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিলেন, এঁদের মধ্যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। এগ্রিমেণ্টের সর্তমত অপরেশচন্দ্রই আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারে যৌথ কোম্পানি হিসাবে থিয়েটার চালানর ব্যবসায় এই প্রথম। ঠিক এই সময়েই বাংলা থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেন আরেকজন করিৎকর্মা ব্যক্তি— প্রবোধচন্দ্র গুহ। তিনি তখন পোষ্ট য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফস্ বিভাগে খুব উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি হিসাবে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন ও এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। নাটক পরিচালনা, নাটক নির্বাচন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়োগ ব্যাপারে অপরেশচন্দ্ররই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রইল। বাংলা থিয়েটার ব্যবসায়ে ম্যাডানের আবির্ভাব দেখে আর্ট থিয়েটার নবযুগের উপযোগী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হোল। অপরেশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, তিনি নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। নাট্যশালার এই অন্যতম গঠন-কর্তা, অভিনেতা ও নাট্যকারকে পুরোভাগে রেখেই আর্ট থিয়েটারের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন। ষ্টারের বাড়ি, মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ সব আমূল সংস্কৃত ও সুসজ্জিত হোল। প্রেক্ষাগৃহে বেঞ্চির বদলে ফোল্ডিং চেয়ারের ব্যবস্থা হোল। অজস্র অর্থব্যয় করে বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে নূতন দৃশ্যপটাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা হোল। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়েই আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন হবে সাব্যস্ত হয়। এই নূতন নাটকের জন্য এঁরা যেসব শিল্পীদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে কিছু কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে নরেশ মিত্র ও রাধিকানন্দ তো ইতিপূর্বেই মিনার্ভায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এঁরা দুজন ভিন্ন আর্ট থিয়েটারে এই সময়ে আর যাঁরা এসে যোগদান করেন তাঁদের

মধ্যে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী। কথিত আছে, শিশিরকুমারেরও এখানে যোগদান করার কথা হয়েছিল, কিন্তু মতদ্বৈধতার ফলে এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। হয়ত রঙ্গনাথের অভিপ্রায় তা ছিল না।

ইডেন গার্ডেনের অধ্যায়ের পর শিশিরকুমারের জীবনে উল্লেখযোগ্য হোল আলফ্রেড অধ্যায়। নাট্যমন্দিরের সূচনা হিসাবে আর্টিস্টস থিয়েটারের পত্তন এই সময়কার ঘটনা। তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের তখনো বিলম্ব আছে। অটলবিহারী সেনকে ধরে তিনি আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিলেন। ইচ্ছা ছিল এইখানে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক দিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করবেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারের বিরোধিতার ফলে তাঁকে নিরাশ হতে হয়। বিপন্ন শিশিরকুমার তবু দমলেন না। ষ্টারে মহাসমারোহে আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন' নাটকের অভিযান শুরু হয়েছে। তখন নিরুপায় হয়ে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'বসন্তলীলা' নামে একখানি গীতিনাট্য নিয়েই অবতীর্ণ হলেন। "Out of nothing something was created—" বলতেন শিশিরকুমার এই প্রসঙ্গে। সত্যিই তাই। হোলি উৎসবের প্রাচীন ও আধুনিক গান এবং কবিতাকে আশ্রয় করেই 'বসন্তলীলা' পালা রচিত হয়েছিল। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁকে এই পালা রচনায় সাহায্য করেছিলেন। বসন্তলীলার উদ্বোধনী গানটি নেওয়া হয়েছিল মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য থেকে— "বন অতি রমিত হৈল ফুল ফোটনে।" তবে এই পালার সবচেয়ে আকর্ষণের জিনিস ছিল অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র একটি গান—"হোরি খেলত নন্দদুলাল"। এ-কালের বাংলা মঞ্চে এটি একটি অবিস্মরণীয় গান।

"বসন্তলীলা'-ই নাট্যমন্দিরের জন্ম সূচনা করে দিয়েছিল। ১৩৩০ সনের (ইং ১৯২৩) দোলপূর্ণিমার দিনে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে এর উদ্বোধন হয়। শিশিরকুমারের কাছে এই দিনটির স্মৃতি বড় মধুর ছিল। মঞ্চে থাকাকালীন প্রতি বৎসরই তিনি 'বসন্তলীলা'র বার্ষিকী পালন করতেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসেও এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইদিনেই মঞ্চে

যুগের শঙ্খ সর্বপ্রথমে স্বাধীন স্বরে বেজে উঠেছিল। "কয়েকজন তরুণ শিল্পী—তাঁদের কেউ নট, কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক ও কেউ বা রূপদক্ষ—এই দিনটিকে সফল করবার জন্য কি বিপুল উৎসাহে এক-আত্মায় পরিণত হয়েছিলেন। কলালক্ষ্মীর স্নেহ সরস আহ্বানই তাঁদের সবাইকে একত্র করেছিল। তাঁরা কেউ ধনী ছিলেন না—কিন্তু তাঁদের ছিল আদর্শের সম্পদ—ছিল গভীর রসানুভূতি। সকলেই ছিলেন কলালক্ষ্মীর একনিষ্ঠ সেবক। ভাষা, ছন্দ, সুর, রূপ, রং আর রেখা—এই দিয়ে তাঁরা সেদিন সৃষ্টি করলেন কলালক্ষ্মীর একটি নূতন মন্দির; নাম দিলেন—নাট্যমন্দির। চারিদিকের প্রবল বিপক্ষের আক্রমণের ভেতরেও নাট্যমন্দিরের জন্ম ব্যর্থ হয় নি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই ভাবে একটি নূতন নাট্যশালার জন্ম এই প্রথম। সেই কলাবিদ্‌দের কেউ ছিলেন পাদ-প্রদীপের সামনে, কেউ নেপথ্যে। শিশিরকুমারকে কেন্দ্রে স্থাপন করে কাজের আনন্দে তাঁরা কাজ করতেন। তাঁদের মস্তিষ্কে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা, চক্ষে ছিল সৌন্দর্যের স্বপ্ন, রসনায় ছিল উৎসাহের ভাষা, প্রাণে ছিল অনাহত মৈত্রীভাব এবং হাতে ছিল অজস্র কাজ।" এঁদেরই মধ্যে সেদিন শিশিরকুমার জাগিয়ে তুলেছিলেন একটা আশ্চর্য, Group feeling অর্থাৎ সবাই মিলে গড়ে তুলব—এই রকম একটা মনোভাব। বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর কোনো মঞ্চের প্রতিষ্ঠার পেছনেই আমরা ঠিক এই রকম মনোভাবের পরিচয় পাই নি। নাট্যমন্দিরের আভিজাত্য এইখানেই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' দিয়েই নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হবে ঠিক ছিল এবং অভিনয়ের তারিখও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। 'সীতা' যখন অপহৃতা হোল, শিশিরকুমার একটু বিপন্ন হলেন। নূতন বা পুরাতন কোন নাটকই মহলা দিয়ে তৈরি করবার সময় নেই। তখন ঠিক হোল যে, নাটকের অভিনয় যখন অসম্ভব তখন কৃষ্ণচন্দ্র দে-র নায়কতায় হোরির গানের আসর বসিয়ে নব-রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করা হবে। গান নির্বাচিত হোল; কৃষ্ণচন্দ্র ও গুরুদাস গানগুলিতে সুর সংযোজনা করলেন, আর নৃপেন্দ্র বসু করলেন নাচের পরিকল্পনা। এই হোল বসন্তলীলার তথ্য, নাট্যমন্দিরের জন্ম কথা—সত্যই "out of nothing something was created and created in a very artistic manner." মুমূর্ষু বাংলা

থিয়েটারকে যিনি রূপ, রস এবং আনন্দ দিয়ে সঞ্জীবিত করবেন সেই শিশির-কুমারের নিজস্ব নাট্য প্রতিষ্ঠান নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন এর চেয়ে আর ভাল ভাবে হোতে পারত না। এই গীতিনাট্যে শিশিরকুমারের কোনো ভূমিকা ছিল না।

'বসন্তলীলা' সাত-আট রাত্রির বেশি হয় নি। তারপরই তিনি এখানে 'আলমগীর' নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। এবার উদিপুরীর ভূমিকায় নবীনা অভিনেত্রী মালিনীকে দেখা গেল। উদিপুরী ভূমিকাটির শ্রেষ্ঠ রূপারোপ তাঁর দ্বারাই হয়েছিল; মালিনার অকাল মৃত্যুর পর প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভাই ছিলেন মঞ্চে অদ্বিতীয়া উদিপুরী। আলফ্রেডে আলমগীরের অভিনয়-প্রসঙ্গে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন: "এইখানেই শিশির ম্যাডান কোম্পানির অনুমতি নিয়ে আবার আলমগীর করতে শুরু করে দিলে। অভিনয় খুবই জমল। প্রেক্ষাগৃহও পূর্ণ হোতে লাগল। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারে আলমগীর অভিনয়ে যে উৎকর্ষে শিশির উঠেছিল সেখানে সে পৌছতে পারল না। এরপরেও অনেকবারই সে আলমগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে কিন্তু সে উৎকর্ষে আর কোনো দিনই পৌছুতে পারে নি।" লেখক অবশ্য এ-বিষয়ে স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করেন এবং শিশিরকুমারের অভিনয়-শৈলির বিচার-প্রসঙ্গে তিনি এর যথাযথ আলোচনা করবেন।

আলফ্রেড মঞ্চে অভিনয় করবার সময় থেকেই শিশিরকুমার একটা নিজস্ব মঞ্চ নিয়ে স্থায়ীভাবে অভিনয় করবার কথা বিশেষভাবেই চিন্তা করছিলেন। মিনার্ভা তখন আগুনে পুড়ে গেছে, ষ্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটেছে—সেখানে নবীন নট-নটী, নূতন নাটক আর আলফ্রেডে শিশিরকুমার। এই সময় মনোমোহন থিয়েটার নূতন নাটক 'ললিতাদিত্য' নিয়ে শেষ চেষ্টা করল বেঁচে ওঠার জন্য। কিন্তু তা আর সম্ভব হোল না। মনোমোহনের দরজা যখন বন্ধ হবার উপক্রম ঠিক সেই সময়ে বাংলার নাট্যজগতে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেন শিশিরকুমার এই মনোমোহন মঞ্চকেই আশ্রয় করে। এরই ভগ্নাবশেষের ওপর সেখানে গড়ে উঠল 'নাট্যমন্দির'—যেখান থেকে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের প্রকৃত শঙ্খধ্বনি প্রথম শোনা গিয়েছিল। অতঃপর আমরা সেই ইতিহাস আলোচনা করব।

॥ ৭ ॥ 'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা'—থিয়েটারে নবযুগ ॥

'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা'—বাংলা থিয়েটারে নবযুগ সূচনাকারী এই দু'খানি নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক বছরের। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের উদ্বোধন হোল অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়ে ১৩৩০ সালের ১৩ই আষাঢ় আর মনোমোহন বোর্ডে নাট্য-মন্দিরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক যোগেশচন্দ্র চৌধুরি-প্রণীত 'সীতা'র উদ্বোধন রজনীর তারিখ হোল ১৩৩১ সাল, ২১শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৪, ৬ই আগষ্ট)। এক মঞ্চে মহাভারত, অপর মঞ্চে রামায়ণ। পৌরাণিক নাটককে আশ্রয় করেই বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারে দেখা দিল নবযুগ! 'কর্ণার্জুন' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়; ভীষ্ম—সন্তোষকুমার দাস; অর্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী; দুঃশাসন—তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; শকুনি—নরেশ মিত্র; পরশুরাম—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী; দ্রৌপদী—নিভাননা; নিয়তি—নীহারবালা; কুন্তী—মনোরমা; পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী। এঁদের মধ্যে তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে শিশির-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ম্যাডানের 'আলমগীর' নাটকে কামবক্সের ভূমিকায় মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আর্ট থিয়েটার শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, অর্থের প্রচুর সঙ্গতিও ছিল তার পেছনে, আর লোকবল তো ছিলই। বেশি টাকা মাইনে দিয়ে নূতন নূতন শিল্পী সংগ্রহ করা তাই তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অপরেশচন্দ্রের মতো অভিজ্ঞ নাট্য পরিচালক আর প্রবোধচন্দ্রের মত কার্যকুশল সংগঠক সেখানে; আর্ট থিয়েটারের সাফল্য তাই গোড়া থেকেই একরকম সুনিশ্চিত ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অভিনয়

এবং সাজসজ্জায় পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক কর্ণার্জুন অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। অভিনয় আরম্ভ হোল। যবনিকা উঠল—অজন্তাগুহার খোদিত মূর্তি আর প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত প্রাচীন যুগের বেশভূষার ন্যায় কৌরব-পাণ্ডবগণের বসনভূষণের নূতনত্ব দেখে দর্শক মুগ্ধ হোয়ে পড়ল। তারপর অভিনয়ের অভিনবত্ব দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব বিবিধ বর্ণের আলোকসম্পাত—রঙ্গমঞ্চকে মায়াময় করে তুলল। সেই সঙ্গে নরেশচন্দ্রের অভিনয়। তখনকার কর্ণার্জুনের প্রধান আকর্ষণ ছিল শকুনির ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয়। কলাসম্মত ভাবপ্রধান চরিত্রাভিনয়ে ষ্টার মঞ্চে নরেশচন্দ্রের সমকক্ষ অভিনেতা তখন আর কেউ ছিলেন না।

'কর্ণার্জুন' প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "কিন্তু বাজীমাৎ করিলেন আর্ট থিয়েটার লিমিটেড ও পুরাতন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ষ্টার মঞ্চে নবযুগের অভিনবত্ব সৃষ্টি করিলেন। গিরিশ-অর্ধেন্দু শিষ্য পুরাতন অপরেশচন্দ্র অক্লান্ত কর্মী। প্রবোধ গুহের সহায়তায় পুরাতনের স্বাভাবিকতা সীমায় রক্ষা করিয়া এমনভাবে নূতনকে গড়িয়া দিলেন যে দর্শক তাঁহার রচিত কর্ণার্জুনে এক অদ্ভুত নাট্য-চাতুর্য দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন।...আর্ট থিয়েটার বহুব্যয় করিয়া গৃহ ও আসন সংস্কার করেন। প্রাচীন যুগের বেশভূষার ন্যায় কৌরব-পাণ্ডবগণের বসন-ভূষণের নূতনত্বে সকলকে মুগ্ধ করেন। অভিনেতাদের বেতনও বেশ মানানসই হয়। তিনকড়িবাবুই মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। পুরাতন ও নবীনের সংযোগ আর্ট থিয়েটারকে প্রকৃত প্রকৃষ্ট থিয়েটারে পরিণত করে এবং উহার গৌরব প্রধানতঃ অপরেশচন্দ্রের।"

কর্ণার্জুনের প্রযোজনা-প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন: "কর্ণার্জুনে বিরাট সেটিংস ব্যবহৃত হোত। কর্ণার্জুনে যে স্থাপত্য দেখা গেল তা কোনো কালেরই স্থাপত্যের পরিচয় বহন করল না।...প্রত্যেক বড় বড় সেট-সিনের অভিনয়ের অন্তে দীর্ঘকাল বিরতি দিতে হোত পরবর্তী সেট তৈরির সময় নেবার জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখবার জন্য কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মঞ্চে স্থান পেত, দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের আর অর্জুনের পাকাটির তীর বর্ষণ দেখিয়ে যুদ্ধের ইলিউসন সৃষ্টির চেষ্টা করা হোত।...অবশ্য এসব ব্যাপার

দর্শকদেরকে পীড়া দিত না। যদি পীড়া দিত, তাহলে ও-নাটক অমন চলত না। কিন্তু কর্ণার্জুন চলবার কারণ ওগুলি নয়। কর্ণার্জুনে যে বাইরের সংঘাত আছে, যে গতি আছে এবং ভাষায় সেই সংঘাতকে, সেই গতিকে দর্শকমনে সংক্রামিত করবার যে শক্তি আছে, তাই শক্তিমান অভিনেতৃদের সহায়তায় দর্শকদেরকে মায়ালোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত।"

আর্ট থিয়েটারের নূতনত্বের প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ পর্যন্ত প্রত্যেক বাংলা থিয়েটারে থিয়েটার আরম্ভ হবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকে টিকিট বিক্রী হোত; এজন্য অত্যধিক ভীড়ে দর্শকদের খুব অসুবিধা হোত। এঁরাই প্রথম অভিনয় রজনীর এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে অগ্রিম টিকিট বিক্রী ও সিট রিজার্ভ করে রাখবার বন্দোবস্ত করেন। দর্শকগণ এই প্রথম কলকাতায় একটি সুসংস্কৃত, ফোল্ডিং-চেয়ার সমেত ও যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও পাখা সমেত প্রেক্ষাগার দেখল। এতেই দর্শকদের প্রথম আনন্দ। তখন মনোমোহন উঠে গিয়েছে, মিনার্ভার বাড়ি পুড়ে গিয়েছে, নাট্যমন্দির স্থায়ী মঞ্চ পায়নি, কাজেই আর্ট থিয়েটারই নাট্যমোদীগণের একমাত্র আনন্দ নিকেতন হয়ে পড়ল। 'কর্ণার্জুন'-এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইহাই অপরেশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নাটক এবং বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে প্রথম 'শততম অভিনয়ের' গৌরব এই নাটকের। কর্ণার্জুনের দুই শততম অভিনয় রজনীতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। নাটকখানি একাদিক্রমে তিনশত রজনী অভিনয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এর জনপ্রিয়তা মঞ্চে সত্যিই একটি নূতন ঐতিহ্যের সূচনা করে দিয়েছিল। কিন্তু এর বেশি নয়।

এই বাজীমাৎ-করা নাটকের উদ্বোধন রজনীতে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিশিরকুমার বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হোয়ে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার শৌখিন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নট কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (শিশিরকুমারের 'কানাইদা')। কানাইবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় এই সম্পর্কে যে বিবরণটি আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম: "সে-রাত্রে শিশিরকুমার কিছুতেই অভিনয়

মনোযোগ সহকারে দেখিতে পারিতেছিলেন না, তিনি ক্ষণে ক্ষণে পায়চারী করিয়া, কখনও বা আসনে বসিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। কানাইবাবু তাঁর এই অস্থিরতা দর্শনে বলেন, শিশির, তুমি একটু ভাল হয়ে বসে play-টা দেখ না। শিশিরকুমার বলিলেন, কানাইদা, তুমি বুঝবে না আমার আজ কী মনের অবস্থা। কোথায় আজ আমি এখানে অভিনয় প্রদর্শন করব, না তার বদলে আমি একজন দর্শক মাত্র। তারপর হঠাৎ তিনি তাঁহার কানাইদা-কে ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, যে কোনো উপায়ে কানাইদা আমায় কিছু টাকার জোগাড় করে দাও, আমিও পাদপ্রদীপের সামনে এক রোমাঞ্চ, এক আলোড়ন সৃষ্টি করি। কানাইবাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, টাকা আমি তোমায় নিশ্চয় জোগাড় করে দেব; আমার নেই, নইলে নিজেই দিতাম। এবং এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে কানাইবাবু তাঁহার এক আত্মীয়, পটলডাঙার প্রতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সেই সময় বিশ হাজার টাকা পাওয়াইয়া দিয়া শিশিরকুমারের অগ্রগতির পথে কিছুটা সহায়তা করেন। এই উপকার নাট্যাচার্য কোনো দিনই ভোলেন নাই।" এই কানাইবাবু শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে সাধারণ মঞ্চে অভিনয়ও করেছিলেন—ষোড়শীতে ফকির সাহেব, রঘুবীরে দুলিয়া, বিবাহ বিভ্রাটে ঘটক আর সধবার একাদশীতে রামরাম বাবুর ভূমিকায় তাঁকে কয়েকবার এ্যামেচার রূপে দেখা গিয়েছিল।

ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, শিশিরকুমার যখন একটি থিয়েটার করবেন ঠিক করেন, তখন তাঁর আর্থিক সঙ্গতি কিছুই ছিল না বললেই চলে। অথচ এ ব্যবসায়ে নামতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। বিশেষ করে সঙ্গতিসম্পন্ন আর্ট থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্মক্ষেত্রে নামতে গেলে অর্থ-সামর্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেদিন। আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখানে, অর্থ-সামর্থ্যের হ্রস্বতা এবং নবীন নট ও নবীনা নটীদের সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও, উদ্যম, অধ্যবসায়, প্রতিভা, প্রয়োগপটুতা ও অসামান্য অভিনয়শক্তি নিয়ে এক সৌম্যদর্শন আত্মনির্ভর ব্রত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি

নিন্দা, তিরস্কার, বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি তুচ্ছ করে, সারা বাংলা রঙ্গালয়ের প্রকৃতি ও প্রভাবকে মহিমামণ্ডিত করেছেন, তখন স্বভাবতই শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রতি নাট্যামোদী বাঙালির শির শ্রদ্ধায় নত না হোয়ে পারে না। তাঁর সমগ্র শিল্পজীবনের অন্তরালে যে বলিষ্ঠ সংগ্রামের কাহিনী আছে, নট-জীবনের প্রারম্ভেই একটির পর একটি বাধা অতিক্রমের যে রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে, সেগুলি যদি কোনোদিন সংগৃহীত হোয়ে প্রকাশিত হয়, তা'হলে জানা যাবে শিশির-প্রতিভার অসামান্যতা কোথায়, কোথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব-প্রদীপ্ত চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য।

প্রসঙ্গতঃ বাংলার নাট্যজগতে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পটভূমিটি একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করব। শিশিরকুমার তাঁর সম্মানিত অধ্যাপকের কার্য পরিত্যাগ করে তদানীন্তন বহুনিন্দিত নটের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। নবযুগের তরুণ অভিনেতাদের মুখপাত্রস্বরূপ তিনিই সর্বপ্রথম সাহস করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টোলের আসন ছেড়ে এসে একেবারে সোজা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ বেদীর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করে বলে-ছিলেন—"I am meant for the stage—রঙ্গমঞ্চের জন্যই আমার জন্ম।' সেদিন থেকেই বাংলার মুমূর্ষু রঙ্গমঞ্চে আবার নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের যে গৌরব, যে মর্যাদা, যে সম্মান অর্ধ শতাব্দীর পরমায়ু অতিক্রম করেও এদেশের নাট্যশালাগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, শিশিরকুমারই আপনার নাট্যপ্রতিভার দীপ্তিতে, আপনার উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে আপনার সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বের বলে এ-দেশের চির উপক্ষিত, সমাজ-পরিত্যক্ত রঙ্গালয়-গুলিকে অচিরকালের মধ্যে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন, সেই মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিলেন, সেই সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশযুগের অবসান আর শিশিরযুগের আরম্ভ—এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এগার কি বারো বছরের। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই নাট্যশালা যেন তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, এ কথা পূর্বেই বলেছি। বিষয়টি আরো বিশদভাবে বলা দরকার। নাট্যজগতে শিশিরকুমারের প্রবেশের অব্যবহিতপূর্বে শহরে মঞ্চ ছিল তিনটি। পুরাতন যুগের দিকপাল

অভিনেতারা তখন একে একে গত হয়েছেন, অমৃতলাল বসু নিয়েছেন অবসর, আর একা দানিবাবু ছিলেন পুরাতন ভাবধারার একমাত্র ধারক এবং বাহক। মঞ্চে তখন চলেছে রীতিমতো অজন্মার যুগ, নূতন সৃজনী প্রতিভা তখনো পর্যন্ত দূরে অপেক্ষা করছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা তখন এক-কথায় ভয়াবহ, শোচনীয়। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগেই একসঙ্গে একাধিক প্রতিভাবান নটের আবির্ভাব, রঙ্গমঞ্চকে তার পরিণতির পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির জগতে একটা চিরন্তন নিয়ম এই যে, নূতনের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে পারলে উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকা সম্ভব নয়। গিরিশোত্তর যুগের থিয়েটারের অবনতির একটা প্রধান কারণই হচ্ছে তাই। অভিনয় ও অভিনেতার ত্রুটি, স্বল্পতা ও দৈন্য ছিল, নাট্যসাহিত্যেরও শোচনীয় অধঃপতন হয়েছিল এই সময়ে। মাইকেল, দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলকৃষ্ণ, অমৃতলাল ও ক্ষীরোদ-প্রসাদ সবাই বিগত যুগের নাট্যকার ছিলেন। নূতন যুগের যে নাট্যসাহিত্য নিয়ে রঙ্গালয় তখন চলছিল, তার হিসাব নিলে হতাশ হোতে হয়। সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য ছিল না, রুচি হিসাবেও তা উন্নত ছিল না। রঙ্গালয়ের মালিকদের দৃষ্টি দর্শকদের রুচির ওপর না গিয়ে তাদের পকেটের দিকে ছিল। তারই ফলে নাট্যসাহিত্য তথা থিয়েটার দুয়েরই অধঃপতন ক্রমে দ্রুত হয়ে উঠল। তখন পার্শী থিয়েটারে ছেলে-ভোলানো আয়োজন থাকতো প্রচুর, সেখানকার দর্শকরা ছিল সাধারণত নিম্নস্তরের, এমন কি King Lear নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হোলেও তাদের রসভঙ্গ হোত না। পার্শী রঙ্গালয়ের আদর্শের প্রভাব তখন কিছুটা এসে পড়েছিল বাংলা থিয়েটারের ওপরে। রঙ্গালয় হচ্ছে তিনটি ললিতকলার মিলনক্ষেত্র—সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র। আবার এই তিনটি কলা-ই জাতীয় সভ্যতার মাপকাঠি। তাই রঙ্গালয়ের উন্নতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দুঃখের বিষয়, প্রাক্-শিশিরযুগে কলাবিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে বহু ব্যবসাদার থিয়েটারকে নিছক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র করে তুলেছিলেন, আর্টকে তাঁরা পণ্য করে তুলেছিলেন, যেমন হয়েছে আজকের শিশির-পরবর্তী যুগের বাংলা থিয়েটারের অবস্থা। এখনকার থিয়েটারে আর্ট গৌণ, মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে

যান্ত্রিক কলাকৌশলের সমাবেশ আর মঞ্চসজ্জা ও বৈদ্যুতিক কারিগরীর বাহাদুরী। দৃশ্যপটের জাঁকজমকে আর শলমাচুমকী-বসানো পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে দর্শকদের মনে চমকদেওয়াটা যে আর্ট হিসাবে খুব উঁচুদরের কাজ নয়, সেটা এঁরা বুঝতে চাইতেন না। সেদিনের থিয়েটার যেমন ভয়াবহ, সেই থিয়েটারের দর্শকদের রুচিও ছিল তেমনি স্থূল ও কদর্য। বাঙালি দর্শকের রুচি তখন উন্নত তো ছিলই না, বরং তা ছিল খুবই নিম্নস্তরের। আলিবাবা-কিন্নরী-আবুহোসেনের ট্রাডিসনে অভ্যস্ত সেইসব দর্শকদের মঞ্চের ওপর ফুলের তোড়া নিক্ষেপ করতে এই সেদিনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। এই রুচির সংস্কার করা ব্যবসাদারীর দ্বারা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারাদের মধ্যে কলালক্ষ্মীর একনিষ্ঠ সাধক বিরল ছিল। গিরিশচন্দ্রের মত প্রতিভাধর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নট-নাট্যকার আর কেউ ছিলেন না যে, সেই গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে দর্শকের মনকে টেনে এনে যথেচ্ছভাবে চালিত করেন।

শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে একটি বড়ো সত্য হোল এই যে, প্রতিভা যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন সে তার নিজের যুগকেই অর্থাৎ যুগপ্রবণতাকেই তার দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করে থাকে। এই প্রকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে যুগপৎ তিনটি শক্তি সক্রিয় থাকে—অনুভূতি, কল্পনা আর প্রয়োজন। শিল্পীর ব্যক্তিমানসের অনুভূতি, কল্পনা এবং চিন্তা-ভাবনা যুগপৎ এই প্রকাশ-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠে ইতিহাসের একটি প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করে থাকে। ইতিহাসের প্রয়োজন এবং অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে যে প্রতিভা যতখানি গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে, সেই প্রতিভা সেই পরিমাণেই সার্থক হোয়ে ওঠে। ক্রান্তদর্শিতা এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীব্রতাই প্রতিভার পরিচায়ক। এই প্রতিভা নিয়েই বাংলার থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেছিলেন শিশিরকুমার। প্রতিভার আবির্ভাব সকল দেশেই ইতিহাসের নিগূঢ় প্রয়োজনে ঘটে থাকে, কাল তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। বাংলা দেশে তখন সর্বত্রই একটা নূতন যুগের সাড়া পড়ে গিয়েছে। রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের মধ্যে

এক অভূতপূর্ব আবেগ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন মধ্যাহ্ন গগনে সহস্র কিরণে উজ্জ্বল আলো বিস্তার করেছে, চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এনে দিয়েছে যুগান্তর, কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সৃষ্টি করেছে নব-নব বিস্ময়ের আর নজরুল ইসলামের কবিতায় দেখা দিয়েছে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাবী সুর—স্বভাবতঃ বাংলার আকাশ-বাতাসে একটা নব জাগরণের, নবীন উন্মাদনার উজ্জ্বল ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হোয়ে উঠেছে। উনিশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রেনেসাঁসের আবেগ-স্পন্দিত যে অভ্যুদয় একদিন ইতিহাসের পটে দেখা দিয়েছিল, তারই যেন পুনরাবৃত্তি বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় দশকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, সত্যই তখন কাল সুপ্রসন্ন ছিল, একটি প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চে নূতনের অভ্যুদয় ঘোষণা করে আত্মপ্রকাশ করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ধ্রুবতারকার মত তাঁর সেই অভ্যুদয় সেদিন সত্যই বাংলা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তরের বার্তা বহন করে এনেছিল। শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমার যেদিন ওল্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক উপস্থাপিত করেন ষ্টার রঙ্গমঞ্চে এবং সেই নাটকের দুইটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেন সেইদিনটি 'সীতা'র প্রথম রজনীর অভিনয়ের চেয়েও স্মরণীয় হোয়ে থাকবার কথা। সেই রাত্রির শুধু অভিনয় নয়, নাট্যানুষ্ঠানের কৃতিত্ব সকলকে করল বিস্মিত, পুলকিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে সেই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য সঙ্গে সঙ্গে যেন এক নূতন যুগের ঘোষণা করল। শিক্ষিত বাঙালি দর্শক তার বহু প্রত্যাশিত নূতন নটগুরুকে যেন বরণ করে নিলো এই বলে: "হে অসাধারণ শিল্পী, হে মোহনীয় রূপদক্ষ, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় আজ যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তুমি এগিয়ে এসো, অন্ধকারে জ্বালাও বর্তিকা।"

•

১৯২৪। মার্চ মাস। মনোমোহন পাঁড়ে দানিবাবুকে নিয়ে শেষ চেষ্টা দেখলেন 'আলেকজাণ্ডার' নাটকে। তাঁর অভিনয়ে দর্শক খুশি হোল না— না হবারই কথা। রঙ্গমঞ্চে তখন নূতন যুগ শুরু হোয়ে গিয়েছে। নূতনের

সঙ্গে দানিবাবু আর পারবেন না—মনোমোহনবাবুর এই ধারণা এখন বদ্ধমূল হোল। পুরাতন যুগের 'শ্বেতহস্তী' বলে নূতন যুগের দর্শক তাঁকে বরখাস্ত করল। ঠিক সেই সময়ে শহরের যে সড়কটির উপর মনোমোহন থিয়েটারের বাড়ি ছিল, সেই সড়কটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এসে গেল। সেণ্ট্রাল এভিন্যুর নূতন সড়ক তখন বিডন ষ্ট্রীটের মনোমোহন থিয়েটারের দরজার সামনে পর্যন্ত এসে স্তব্ধ হয়ে আছে; সেই রাস্তা এইবার শ্যামবাজার পর্যন্ত বর্ধিত হবে। কাজেই থিয়েটার বাড়ি ধূলিসাৎ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাই "সাতপাঁচ ভাবিয়া তিনি থিয়েটার চালাইবেন না স্থির করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেন।" নূতন যুগের নবীন নট শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন এমন আশা হয়ত বৃদ্ধ দানিবাবুর মনে ছিল। কিন্তু মনোমোহনের দরজা বন্ধ হওয়াতে ম্রিয়মান চিত্তে দানিবাবুকে তাঁর রঙ্গজীবনের ওপর সাময়িকভাবে যবনিকা টেনে দিতে হোল। তারপর বসন্তলীলার অবসানে শিশিরকুমার "মনোমোহন বাবুর সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ দেখা করিয়া মাসিক ৩০০৲ টাকা ভাড়ায় সেখানে 'সীতা' নাটক খুলিবেন সব স্থির করিয়া ফেলেন। কিন্তু হায়—খুলিবার পূর্বে দেখেন সীতা লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অধিকার তাঁহার নাই—কারণ আর্ট থিয়েটার ডি. এল. রায়ের 'সীতা'র স্বত্ব ইতিপূর্বেই তাঁহার পুত্র দিলীপ রায়ের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন।" সীতা যখন বেহাত হয়ে যায় তখন, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বিরোধীরা বগল বাজিয়ে বলল—হয়ে গেল শিশির ভাদুড়ীর।"

সীতাহরণের কাহিনী বেশ কৌতূহলজনক। বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। পরবর্তীকালে দিলীপকুমার রায় এই সম্পর্কে লিখেছিলেন: "শিশিরবাবু প্রদর্শনীতে তিন রাত্রির জন্য সীতা অভিনয়ের অনুমতি পেয়ে বার রাত্রি অভিনয় করেন। তিনি এজন্য যথেষ্ট লাভ করেছেন। অতএব এখন আর্ট থিয়েটার ঐ নাটকটি অভিনয় করে লাভবান হবার প্রয়াসী। তাঁরা কাল বিলম্ব না করে আমাকে royalty হিসাবে ৪৫০৲ টাকা দিয়ে এক বৎসরের জন্য 'সীতা' অভিনয়ের স্বত্ব ক্রয় করে নেন। তখন আমি জানতাম না যে, শিশিরবাবু

এই 'সীতা' নিয়েই নূতন থিয়েটারের পত্তন করতে উদ্যত। তিনিই একদিন আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি পিতৃদেবের 'সীতা' নাটক নিয়েই আসরে নামতে উদ্যত এবং এবং এজন্য তাঁর সব সাজ-সরঞ্জামই প্রস্তুত। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম এবং তাঁর কথা শোনা মাত্র সেই দিনই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে বলি যে, আমাকে দিয়ে চুক্তিপত্র সই করিয়ে নেবার সময়ে আমার কাছে সব কথা খুলে বলা হয় নি। অতএব আমাকে এ-চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক, কারণ তা' না হ'লে শিশিরবাবুর প্রতি মস্ত অবিচার করা হয়। তাঁরা তাতে অস্বীকৃত হলে শিশির-বাবু বলেন যে, বেশ দুপক্ষেই অভিনয় করার অনুমতি দেওয়া হোক। তাতেও আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অসম্মত হন। আমি royalty ফেরৎ দিতে চাইলাম—আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাতেও রাজি হন নি। সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারের মত ভদ্রলোকের ও প্রতিভাবান নটের শত্রুতাসাধনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। এজন্য দায়ী ও দোষী একা আমি। আমার দোষ প্রথমতঃ এই যে, আমি অনুসন্ধান না করেই হঠাৎ চুক্তি করে ফেলেছিলাম; দ্বিতীয়তঃ, শিশিরবাবুর কথায় বিশ্বাস করতে পারি নি যে, আর্ট থিয়েটার শুধু তাঁকে জব্দ করবার জন্যই 'সীতা' কিনে নিয়েছিলেন, অভিনয় করবার জন্য নয়।...সে সময় একক, নিঃসঙ্গ শিশির-বাবুর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য আমি যে নিমিত্তের ভাগী হয়েছিলাম, এজন্য আমি সত্যই দুঃখিত ও অনুতপ্ত।" (নাচঘর, ২২শে শ্রাবণ ১৩৩২)

কথিত আছে, সে সময় দিলীপকুমারকে শিশিরকুমার বলেছিলেন, "দিলীপ বাবু, দেখবেন আর্ট থিয়েটার 'সীতা' কেড়ে নিলেন বটে কিন্তু সে শুধু আমার উচ্ছেদ সাধন করার জন্য—নিজেরা অভিনয় করার জন্য নয়।" এই সম্পর্কে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এই সাফাই দিয়েছিলেন: "গত ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেনে যখন সরকারী একজিবিসন বসে, তখন সেখানে অভিনয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী একটি দল গঠন করেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে মাত্র তিন রাত্রির জন্য 'সীতা' নাটকের অভিনয় স্বত্ব চাহিয়া লইয়াছিলেন। বিধিবহির্ভূত হইলেও তিনি তিন রাত্রির স্থলে বার রাত্রি অভিনয় করেন এবং এই

অতিরিক্ত নয় রাত্রির জন্য আর কাহারো অনুমতি লওয়া দরকার বোধ করেন নাই। নির্মলেন্দু লাহিড়ী তখন আর্ট থিয়েটারের একজন অভিনেতা। তাঁহারই উৎসাহে আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বন্ধুর নিকট (যিনি শিশিরবাবুকে অনুমতি দেন) গমন করেন। তিনিও আর্ট থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া নিজে স্বত্ব দিতে অসম্মত হন ও থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে দিলীপবাবুর মাতুল ও অভিভাবক ব্যারিস্টার কে. এম. মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিতে বলেন।" (নাচঘর, ১৯ ভাদ্র, ১৩৩২)

সীতাহরণেও শিশিরকুমার ভগ্নোদ্যম হলেন না—গড়িয়ে নিলেন এক নূতন সীতা—সে সীতা নাটক হিসাবে পুরাতন সীতার সমতুল্য না হলেও অভিনয়ের পক্ষে ছিল বেশি উপযোগী। পৌরাণিক রামের চেয়ে শিশির-কুমারকে সবাই ভাগ্যবান বলেই মানলো, যখন এই সংবাদটা জানা গেল। নাট্যমন্দিরের প্রথম প্রাচীরপত্রে 'সীতা' নাটকেরই উল্লেখ ছিল, নাট্যকারের নাম ছিল না, কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারই বেশি বিচলিত হন। তাঁরা "এটর্নির দ্বারস্থ হলেন। নাট্যামোদীরা উৎকণ্ঠিত রইলেন। বড় একটা মামলার উত্তেজনা তাঁদেরকে উদ্বেল করে তোলে। ক্রমশঃ প্রকাশ পেল তিনি নতুন সীতা রচনা করিয়েছেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে। চৌধুরী-মশাই তখন অজ্ঞাতকুলশীল।" ষ্টারে তখন পুরাতন 'সীতার' মহলা আরম্ভ হয়েছে, শিশিরসম্প্রদায়ও ঘোষণা করেছেন মনোমোহন মঞ্চে তাঁরা আত্ম-প্রকাশ করবেন 'সীতা' নাটক নিয়ে। সীতায়-সীতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা পুরাণের কোথাও উল্লেখ নেই, তবু কলকাতার নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দ এই নাট্যযুদ্ধের পরিণাম দেখবার জন্য সেদিন বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়েই প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। প্রসঙ্গতঃ একটি কথার উল্লেখ দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের অভিনয় স্বত্ব না-পাওয়া শিশিরকুমারের পক্ষে যেন শাপে বর হয়েছিল। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র তুলনায় নিকৃষ্ট হোলেও, শিশিরকুমার এই নূতন নাটকে তাঁর অভিনয়-প্রতিভা প্রকাশের যে সুযোগ পেয়েছিলেন, পুরাতন নাটকে তিনি তা পেতেন কি না সন্দেহ।

শিশিরকুমার 'সীতা'-র জন্য অত ঝুঁকেছিলেন কেন? তাঁর মতন একজন যুগপ্রবর্তক ও প্রতিভাধর অভিনেতার পক্ষে পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য এই যে আগ্রহ, এটা বিচার করে দেখবার মতন। তাঁর সামনে ছিল মাইকেলের আদর্শ, গিরিশচন্দ্রের আদর্শ। রামায়ণকে আশ্রয় করেই মাইকেল রচনা করেন তার অমর কাব্য—মেঘনাদ বধ; রামায়ণের কাহিনীকেই উপজীব্য করে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণ বধ' (১৮৮০ খ্রীঃ) এবং পাবলিক ষ্টেজে এই নাটকেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রতাপ জহরীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁহার এই প্রথম নাটক অভিনয়ের পর হইতেই লোকে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটকের জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত।" বলতে গেলে, রামায়ণ-মহাভারতের উপাদান নিয়েই এদেশের নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের সর্বাবয়ব পুষ্ট হয়েছে। যাত্রা তো এই দুটি মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনীকে আশ্রয় করেই বিকাশ লাভ করে এসেছে। রামায়ণ মহাভারতকে ছাড়িয়ে কোনো সুরই বাংলা থিয়েটারে স্থায়িত্বলাভ করে নি, এই তথ্যটি শিশিরকুমার বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। আবার এই দুটির মধ্যে দর্শকচিত্তে সীতা-রামের কাহিনীর আবেদন সর্বকালে সর্বাধিক। তার ওপর কবি কৃত্তিবাসের কৃপায় বিগত ছয়শত বৎসর বাঙালির মন রামায়ণী ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে এসেছে। শিশিরকুমার তাঁর স্বাধীন নটজীবনের যাত্রাপথে দর্শকচিত্তে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করবার জন্য তাই রামায়ণকেই আশ্রয় করলেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শিশিরকুমারের মতো একজন বিদগ্ধ প্রতিভাবান নট যে পুরাণকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সত্যই ভাবতে কেমন লাগে। যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও সমাজ-সচেতন একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করে নাট্যশালা থেকে ভাবের স্রোতোমুখ তিনি পরিবর্তন করে দেবেন, এই তো ছিল আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেল সেই যুগেই নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার নূতন করে রামায়ণ-মহাভারতের স্রোতকে রঙ্গমঞ্চে প্রবাহিত করে নিয়ে এলেন। থিয়েটারে নবযুগ এলো সত্য, কিন্তু নাটকের দিক দিয়ে অভিনবত্ব কিছুই এলো না। শিশিরকুমার মূলতঃ রোমান্টিক অভিনেতা ছিলেন, তাই

তিনি ইমোশন দিয়ে, আবেগ দিয়ে দর্শকদের হৃদয়-মনকে অশ্রু-সজল করে তুলবার জন্য রাম-সীতার জীবনের সবচেয়ে বিয়োগান্ত অধ্যায়টি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু এমনটা হয়ত হোত না, যদি নটজীবনের প্রারম্ভে তিনি তাঁরই সমতুল্য একজন প্রতিভাবান নাট্যকারকে তাঁর সঙ্গে পেতেন। তাই আমি কতবার শিশিরকুমারকে বলতাম—আপনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন একা, তাই আপনার প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি হয় এমন নাটক আপনি এই বত্রিশ বছরের মধ্যে দু'একখানার বেশি পান নি। এই অভিযোগ তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি। ম্যাডানের চাকরিতে যখন তিনি ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন, তখন তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদকে নাট্যকার হিসাবে তাঁর সম্প্রদায়ে থাকবার জন্য কত অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তখন রঙ্গমঞ্চে নবাগত, প্রতিভা আছে, অর্থ নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদ দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন মঞ্চের বৈতনিক নাট্যকার হিসাবে কাজ করে এসেছেন, তাই শিশিরকুমারের অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। আর্থিক প্রশ্নটাই এখানে বড়ো ছিল। আর হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারের নেপথ্য প্ররোচনা কিছু ছিল এর মধ্যে। তাই অজ্ঞাতকুলশীল এক নাট্যকারের তৃতীয় শ্রেণীর একখানি পৌরাণিক নাটক নিয়েই শিশিরকুমারকে আত্মপ্রকাশ করতে হোল। নাটক দুর্বল, তিনি জানতেন—তবু রাম-সীতার এই অশ্রুসজল কাহিনী দিয়েই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন—এই দুরন্ত আশা বুকে নিয়েই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার। তা'ছাড়া, প্রতিযোগী আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুন নাটকের সাফল্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত, তার শততম রজনীর অভিনয় গৌরব শিশিরকুমারকে আরো প্রবলভাবে পৌরাণিক নাটক নিয়ে নামবার প্রেরণা দিয়ে থাকবে। একটি নাটকের একাদিক্রমে শততম অভিনয় বাংলা থিয়েটারের পক্ষে সত্যি সেদিন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। 'সীতা' নাটক নির্বাচনে শিশিরকুমার তাই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আসল কথা, বাংলা থিয়েটারে গিরিশযুগ থেকে পৌরাণিক নাটকের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেই এই নবীন অভিনেতা 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ কথাও শিশিরকুমারের অজানা ছিল না যে, আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রামায়ণাদি গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলিকে 'সিদ্ধরস' আখ্যা দিয়েছেন, কারণ

এইসব কাহিনীবর্ণিত চরিত্রগুলির রসমূর্তি দর্শকসাধারণের চিত্ত চিরস্থায়ীভাবে অধিকার করে আছে। নটজীবনের প্রারম্ভে শিশিরকুমার তাই এই সিদ্ধ-রসের আশ্রয়ে রচিত একটি নাটক নিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেন, কারণ তিনি জানতেন এ ব্রহ্মাস্ত্র ব্য . হবার নয়। 'সীতার' সাফল্য প্রমাণ করলো যে তাঁর ধারণাই ঠিক।

নাটকের বাধা দূর হোল। কথিত আছে, যোগেশচন্দ্রের লেখনীমুখে অনধিক এক পক্ষকালের মধ্যেই 'সীতা' নাটকখানি তৈরি হোয়েছিল। প্রবল উৎসাহে নাটকের মহলা শুরু হয়। নাটকের প্রধান চরিত্রই রাম। কিন্তু প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ের উৎকর্ষের ওপর শিশিরকুমার প্রখর দৃষ্টি রাখলেন —নাটকের সামগ্রিক আবেদনের scale যেন কোথাও না ঝুলে পাড়ে। কিন্তু এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। অর্থের দুশ্চিন্তাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শিশিরকুমারের বন্ধুভাগ্য ছিল অপরিসীম। পূর্বেই বলেছি, তাঁর 'কানাইদা' জোগাড় করে দিয়েছিলেন বিশ হাজার টাকা; সহপাঠী এবং তখনকার দিনের প্রথিতনামা ব্যবহারজীবী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র দিলেন দশ হাজার টাকা,—এইভাবে প্রয়োজনীয় টাকা তিনি তুলসীচরণ গোস্বামী, সুধাংশু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সীতার production-এ তিনি খরচ করেছিলেন দরাজ হাতে; সাজসজ্জা, দৃশ্যপটের প্রত্যেকটি জিনিস একেবারে প্রথম শ্রেণীর উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছিল। মনোমোহনের পুরাতন বাড়ি যতদূর সম্ভব সংস্কৃত করলেন। সংগৃহীত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, উদ্বোধন রজনী আসন্ন—এমন সময় টাকার অভাবে মঞ্চ কারিগরদের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম। সেই সময়ে তাঁর সহপাঠী এবং বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক (পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ) জে. কে. চৌধুরী একদিন 'সীতার' মহলা দেখতে এসেছেন মনোমোহন থিয়েটারে। প্রিন্সিপাল চৌধুরী ঘটনাটি আমার কাছে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন: "আমি তখন বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেলের সুপারিন-টেণ্ডেন্টও ছিলাম। বহু চেষ্টার পর শিশির থিয়েটার করবার জন্ম বাড়ি পেয়েছে, নাটক লেখান হয়েছে, শীঘ্রই নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হবে। আমরা

সবাই খুব আনন্দ এবং উদ্বেগের মধ্যে আছি। আনন্দ, মঞ্চে শিশিরকুমার স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, উদ্বেগ—সে নিতান্তই সঙ্গতিহীন। একটা বিরাট veuture করতে চলেছে সে। এর সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে তার সমগ্র জীবনের সফলতা। সেদিন (২৮শে জুলাই, ১৯২৪) রাত্রি আটটার পর হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে গেলাম মনোমোহন থিয়েটারে 'সীতা'র রিহার্সাল দেখবার জন্য। সুনীতিকুমার প্রমুখ আমাদের অনেক সহপাঠী মাঝে মাঝে আসতেন সেখানে—আমাদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল। রিহার্সাল দেখে উঠব, এমন সময়ে শিশির এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে, থিয়েটার বাড়ির পেছনের একটা নিভৃত স্থানে। সেইখানে হঠাৎ আমার হাত ধরে সে বললে—যতীন, আমার নাভিশ্বাস উঠেছে। আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? শিশির বললে, আর ৭।৮ দিন বাদেই বই নামাতে হবে, হাতে একটি পয়সা নেই, কারিগররা কাজ বন্ধ করেছে, কিছু টাকার দরকার। আমি ভাবলাম হয়ত দু'তিন শো টাকার প্রয়োজন, তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা?—অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার টাকা—আজই এক্ষুণি দরকার। দিতেই হবে।—কিন্তু এত টাকা, এই রাত্রে পাব কোথায় আমি?—কেন তোর কাছে তো অনেকের গচ্ছিত টাকা থাকে। শিশিরের এটা জানা ছিল। যাই হোক, শিশিরের পীড়াপীড়িতে আমি সম্মত হলাম—সম্মত না হয়ে পারি নি। সে আমার সঙ্গে হোষ্টেলে এলো। সেইখানে বসেই তিন হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে আমার কাছ থেকে সেই রাত্রেই সে তিন হাজার টাকা নিয়ে গেল। পরে অবশ্য 'আলমগীর' ও 'সীতা'র দু-রাত্রির বিক্রী থেকে সে এই টাকা পরিশোধ করেছিল, কিন্তু সেই হ্যাণ্ডনোট-খানা কখনো ফেরৎ চায় নি। যখন হ্যাণ্ডনোট সই করে, তখন আমি বলেছিলাম, শিশির, এতো একটা চোতা কাগজ, এর মূল্য কী? উত্তরে শিশির বলেছিল—যতীন, আমি কথা দিচ্ছি, এ-টাকা আমি শোধ দেব। সেদিনের স্মৃতি আমার আজো মনে আছে। শেষ জীবনেও যখনি অর্থাভাব হয়েছে, শিশির আমাকে নিঃসঙ্কোচে তা জানিয়েছে আর আমি সাধ্যমত বিনা দ্বিধায় দিয়েছি—সেসব কথা প্রকাশ্যে বলবার নয়।"

সারা শহর উন্মুখ হয়ে আছে 'সীতা'র জন্য।

অবশেষে সমাগত হোল সেই বহু প্রত্যাশিত উদ্বোধন রজনী।

নাট্যমন্দিরের প্রথম অর্ঘ্য—'সীতা'। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের স্বাধীন প্রযোজনার প্রথম নিদর্শন—'সীতা'। বুধবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩১ (ইং ৬ই আগস্ট, ১৯২৪), বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। যাঁর স্নেহদৃষ্টির তলে শিশিরকুমার একদা ইনস্টিট্যুটের শৌখিন অভিনেতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, সেই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু এই বৎসরের মে মাসের শেষভাগের ঘটনা—অত্যন্ত মর্মন্তুদ সেই ঘটনা। আর সেই বছরই সাধারণ রঙ্গালয়ে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন বাংলার শিল্পাদিত্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'সীতা' নাটকের প্রধান ভূমিকালিপি এই রকম ছিল : রাম—শিশিরকুমার ভাদুড়ী; লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী; ভরত—তারাকুমার ভাদুড়ী; শত্রুঘ্ন—তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বশিষ্ঠ—ললিতমোহন লাহিড়ী; বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; শম্বুক—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী; লব—জীবনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কুশ—ননীগোপাল সান্যাল (২য় রজনী থেকে রবীন্দ্রমোহন রায়); দুর্মুখ—অমিতাভ বসু (এ); বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে, ব্রাহ্মণ—নৃপেশনাথ রায়; কৌশল্যা—পান্নারাণী; সীতা—প্রভা; উর্মিলা—ঊষারাণী; তুঙ্গভদ্রা—নীরদাসুন্দরী; আত্রেয়ী—নিরুপমা।

নাটকের উপস্থাপনা-কৌশল ও অভিনয়-পদ্ধতিই শুধু দর্শককে মুগ্ধ করল না। যারা এতকাল থিয়েটারে ঐকতান বাদন শুনে এসেছে, তারা আজ নাট্যমন্দিরে এসে শুনল নহবতে রৌশন চৌকি বাজছে। নাট্যমন্দিরের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে একটা দেশীয় ভাব—যা ছিল অকল্পিত, অভাবনীয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন : "তাহার সীতা-নাটকে কেবল যে পৌরাণিক জগতের রূপোজ্জ্বল-সম্পূর্ণ পরিবেশ ও যথাযথ ভাবসমন্বিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল কেবল তাহাই নহে, সার্বভৌম, যুগনিরপেক্ষ মানবিক সুরটিও ধ্বনিত হইয়াছে। পৌরাণিক পরিবেশকে নিখুঁতভাবে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালীন মানবহৃদয়ের আর্তি-প্রকাশ-শক্তিই শিশির-প্রতিভার পরিচয়।"

অভিনয়, সেটিংস, আলোকসম্পাতের অভিনবত্ব, আবহ সংগীত---সব কিছু মিলিয়ে একটা অখণ্ড নাট্যরসপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন শিশিরকুমার। দৃশ্যপটের মধ্যে বৈসাদৃশ্য (anachronism) যে ছিল না তা নয়, তবু তারই ভেতর দিয়ে যে সূক্ষ্ম সুকুমার কলানৈপুণ্যের পরিচয় 'সীতা' নাটক বহন করে এনেছিল সেই রাত্রিতে—বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তাই-ই যথার্থ নবযুগের প্রবর্তন করল। প্রথম রজনীর দর্শকদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অমল হোম, এবং শিশিরকুমারের আরো অনেক অনুরাগী বন্ধুগণ। নাট্যমন্দির তথা সীতা-নাটকের উদ্বোধন যজ্ঞের হোতা ছিলেন দেশবন্ধু। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি এসেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বসে থেকে সমগ্র অভিনয় দেখেছিলেন। কথিত আছে, অভিনয়-শেষে তিনি রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "ইনস্টিট্যুটে শিশিরের চাণক্য দেখে দ্বিজুবাবু (দ্বিজেন্দ্রলাল) যে বলেছিলেন, শিশির এ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবে, আজ দেখলাম তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য। সত্যই শিশির এ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—নাট্যশিল্পের মূল ধরে এমনভাবে যে নাড়া দেওয়া যায়, তা আজ শিশিরের অভিনয় দেখে আমি উপলব্ধি করলাম।" এই বিবরণটি সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনা। অমল হোম দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' কাগজে 'The genius of Sisir Bhaduri'—এই শিরোণামায় একটা এককলমব্যাপী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শ্রীযুত হোমের এই প্রবন্ধটিই সংবাদপত্রে শিশিরকুমার সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা এবং শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় সেই প্রথম বিস্তারিত আলোচনা। সে-আলোচনা পড়ে খুশি হয়ে শিশিরকুমার অমল হোমকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। শিশিরকুমারের প্রত্যাশা নিষ্ফল হয় নি। তারপর লেখেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'রঙ্গনাথ' ছদ্মনামে। 'সীতা'-র অভিনয় তাঁকে এনে দিল অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা, প্রচুর অর্থ আর তাঁর নাট্যমন্দিরের দেশব্যাপী খ্যাতি। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে শিশিরকুমারের 'সীতা' যেন মহাকাব্যের সকল গরিমা নিয়ে সেদিন বাঙালির হৃদয় জয় করল।

॥ ৮ ॥ পুরাতনের নূতন রূপ ॥

শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ নটজীবনকে আমরা তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) নাট্যমন্দির; (২) নব-নাট্যমন্দির ও (৩) শ্রীরঙ্গম। এই তিন পর্য্যায়ের মধ্যেই আমরা পাই তাঁর বত্রিশ বৎসরব্যাপী বিভিন্ন নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনার ইতিহাস। এই তিন পর্যায়ে তিনি দীনবন্ধু থেকে জলধর চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত বহু নাট্যকারের নূতন ও পুরাতন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন; এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রেরও বহু উপন্যাসের নাট্য-রূপকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। সবগুলিতেই যে তিনি সমান সাফল্য লাভ করেছেন, এমন কথা নয়। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক—এই তিনটি ধারা নিয়েই তিনি বত্রিশ বছরের মধ্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানা চমকের সৃষ্টি করেছে, দিয়েছে বহু নূতনত্বের ইঙ্গিত। 'সীতা' থেকে আরম্ভ করে শ্রীরঙ্গমের সর্বশেষ নূতন নাটক পর্যন্ত শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্য সমানভাবেই সক্রিয় ছিল। এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘকাল তাঁরই প্রভাব সমান ভাবে কাজ করেছে—এ কথা অস্বীকার করবার নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি এক সুবৃহৎ অভিনেতৃগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব তাঁর পূর্বসূরী গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশি। মোট কথা, ১৯২৪ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চের ওপর শিশিরকুমারের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই আধিপত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রতিদিনের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করবেন। আমি শুধু দিগ্‌দর্শন করলাম মাত্র। এই অধ্যায়ে আমরা 'সীতা'র পর নাট্যমন্দির-পর্যায়ে শিশিরকুমারের বিভিন্ন নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে বিশেষভাবে 'জনা'র কথা আলোচনা করব।

তার আগে 'সীতা'র কথা আর একটু বলতে হবে। এতদিন শিশির-কুমারের খ্যাতি ছিল শুধু একজন অভিনেতা হিসাবে, নাট্যমন্দিরে 'সীতা'-

নাটকের শিল্পকলাসম্মত উপস্থাপনা কৌশল তাঁকে রঙ্গজগতের একজন যুগ-স্রষ্টা প্রয়োগ-শিল্পী হিসাবে পরিচিত করে তুলল নাট্যামোদী মহলে। সুতরাং দেখা যাক বাংলা থিয়েটারে গিরিশযুগ থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যত নাটক মঞ্চস্থ হয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে শিশিরকুমারের 'সীতার' তফাৎটা কোথায়? এই পার্থক্য নানা দিক দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সেদিন দর্শকদের দৃষ্টিতে। "Something must he left to the imagination of the audience"—এই কথাটা শিশিরকুমার অনেক সময়ে বলতেন এবং আরো বলতেন যে, আমার প্রত্যেকটি নাটকের production-এ সেই 'সীতার' প্রথম রজনী থেকে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে আমি এই নীতির অনুসরণ করে এসেছি। দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলার কথা শিশিরকুমারের আগে কেউই বড় একটা চিন্তা করেন নি। যে দেশে একদা থিয়েটারে canvas করে দর্শক বসিয়ে, করতালির জোরে বড় অভিনেতা বলে নাম করবার একটা রীতি প্রচলিত ছিল, সেই দেশে দর্শকের রুচিকে রাতারাতি এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়া, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটা বড়ো রকমের যুগান্তর বলেই গণ্য হবে। অভিনয় প্রতিভা, নাট্যবোধ আর সূক্ষ্ম ও সুচারু প্রয়োগপদ্ধতি—এই তিনটি জিনিসের মনোজ্ঞ সম্মেলনের ফলেই শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই যুগান্তর নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। শিশিরকুমারের অভিনয় acting নয়, howling নয়, সে-অভিনয় অভিনীত চরিত্রের ব্যাখ্যা বা interpretation এবং সে-অভিনয় শুধু বাচনিক ছিল না—ছিল নাটকের চরিত্রের অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ। দেহের সর্বাঙ্গ আর মনের সর্ব শিল্পানুভূতি দিয়ে তিনি অভিনয় করতেন বলেই সে অভিনয় সজীব, স্বাভাবিক এবং রসাঢ্য হোয়ে উঠতো। সেই সঙ্গে বলতে হয় তাঁর উদাত্ত সুকণ্ঠের কথা; তাঁর কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গি এবং তার volume, intonation ও modulation—সবই ছিল বিস্ময়করভাবে নূতন। মঞ্চ জগতে এমন দুর্লভগুণের সমাবেশ পৃথিবীতে খুব কম অভিনেতার মধ্যেই আজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে।

ম্যাডান থিয়েটারের 'আলমগীর' নাটকে আমরা শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত শক্তিরই পরিচয় পেয়েছিলাম—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এই

প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় যথার্থই লিখেছেন: “আলমগীরের আসরে অধিকাংশ অভিনেতাই শিশিরকুমারের দ্বারা শিক্ষিত না হোয়ে বিসদৃশ ভঙ্গি বা ষ্টাইলকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং সে অনুষ্ঠানের সাজপোশাক, দৃশ্যপট, নাচ ও গানের সুর প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ই প্রস্তুত হয়েছিল বহুপরিচিত ও অচল সেকেলে আদর্শ অনুসারেই।” ম্যাডানের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কারণটাই এই—“তাঁর মনীষা, উচ্চ আদর্শ ও ভাবপ্রবণতা তাঁকে সেখানে টিকে থাকতে দেয় নি।” গর্ডন ক্রেগের মতো শিশিরকুমারও বিশ্বাস করতেন যে, “একমাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হোলে ললিতকলার কোনো কাজই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয় না।” সেই মস্তিষ্কের পরিচয় তিনি দিলেন তাঁর নিজস্ব নাট্যপ্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্ঘ্য ‘সীতা’ নাটকের উপস্থাপনায়। যে যে বিষয়ে ‘সীতা’ নাট্যাভিনয় বাংলা থিয়েটারে সেদিন যুগান্তরের সূচনা করেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর ‘বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার’ গ্রন্থে। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই:—(১) “আগাগোড়া একই ভঙ্গি অনুসারে একসুরে বাঁধা নূতন আদর্শের অভিনয়; (২) পাদপ্রদীপের ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবতঃ আলো আসে ওপর থেকে এবং এপাশ-ওপাশ দিয়ে। পাদপ্রদীপের আলো নীচে থেকে ওঠে ওপরে। পাদপ্রদীপ নিবিয়ে ‘সীতা’র প্রত্যেক দৃশ্যে স্বাভাবিক আলোর ব্যবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে আধুনিক আলোকপাত কৌশলের নিদর্শন দেখানো হয়; (৩) ঐকতানবাদন বন্ধ। বাংলা রঙ্গালয়ের ঐকতান বা concert নাটকীয় ক্রিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল তার পরিপন্থী। তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা; (৪) পিছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে দেওয়া; (৫) নাট্যক্রিয়ার অনুসারী যুগোপোযোগী গানের সুর এবং নৃত্যে নূতন ধারা—প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নৃত্যভঙ্গি গ্রহণ; (৬) আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজপোশাক এই প্রথম; (৭) সংলাপে শব্দের অর্থ বুঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন; (৮) মঞ্চের উপর অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও কোন অভিনেতাই স্থির বা আড়ষ্ট-ভাবে থাকবে না—উপযোগী ভাবাভিনয় দ্বারা নাটকীয় ক্রিয়াকে সাহায্য

নরেশ মিত্র

অহীন্দ্র চৌধুরী

শিশিরকুমার ভাদুড়ী (একটি বিশেষ ভঙ্গিতে)

S. Bhaduri & Co.
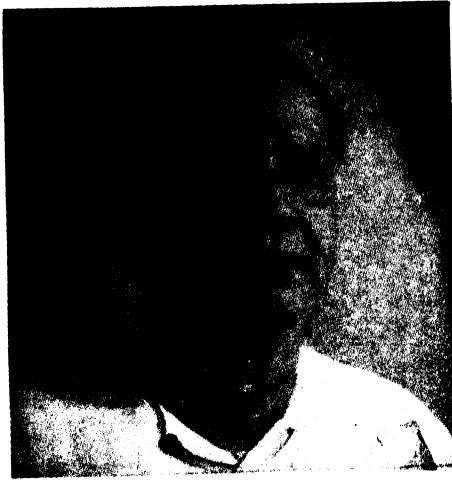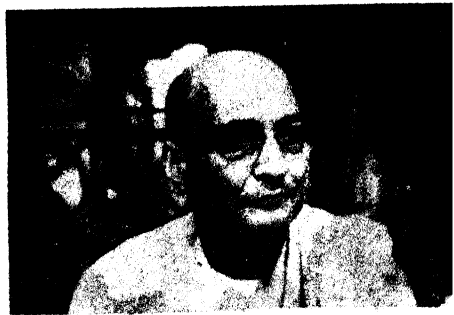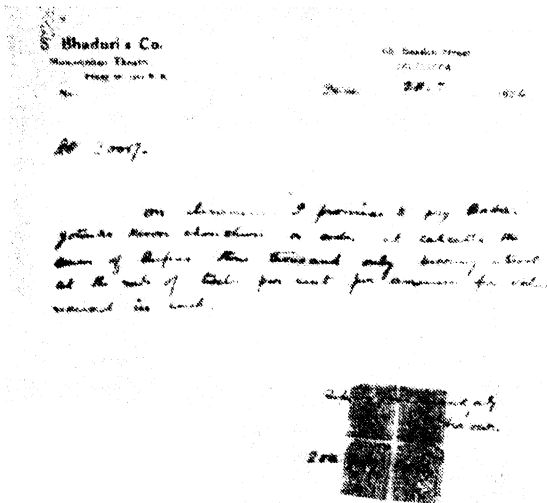
করবে। আগেকার নাট্যশিক্ষকরা এদিকে বড় দৃষ্টি দিতেন না।" এই কয়টির সঙ্গে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। সেটি হোল নাটকের সম্পাদনা বা editing ; মঞ্চস্থ করবার আগে নাটকের যে সম্পাদনা করতে হয়, এটাও বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমারই প্রথম প্রবর্তন করেন। সম্পাদনা ভিন্ন প্রয়োগশিল্প দোষমুক্ত হয় না।

মনোমোহন মঞ্চে 'সীতা'র উদ্বোধন হয় ১৩৩১-এর ২১শে শ্রাবণ। তখন নাট্যমন্দির শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং তাঁরই একক উদ্যম ছিল, তিনিই ছিলেন এর 'অধিকারী'। এর দু'বছর পরে নাট্যমন্দির একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। এই দু'বছরের মধ্যে 'সীতা' ভিন্ন আর কোনো নতুন নাটক নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয় নি—হবার দরকারও ছিল না। 'সীতা'র অভিনয়ের জনপ্রিয়তাই ছিল এর প্রধান কারণ। মনোমোহন বোর্ডে নাট্যমন্দিরের স্থিতিকাল পুরো দু'বছরও নয়। এবং এই সময়ের মধ্যে 'সীতা' ভিন্ন নাট্যমন্দিরের উল্লেখযোগ্য production পাষাণী, জনা ও পুণ্ডরীক। নাট্যমন্দিরে 'জনা'র প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ, ১৩৩২, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার (ইং ৩রা জুন, ১৯২৫)। তখন নরেশ মিত্র আর্ট থিয়েটার পরিত্যাগ করে নাট্যমন্দিরে এসে যোগদান করেছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের 'সীতা' নাটকের মত গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক নিয়েও শিশির-কুমারকেও কম বেগ পেতে হয় নি। প্রতিপক্ষরা প্রতি পদেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, দেখা যায়। এই নিয়ে আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে শিশিরকুমারের একটা বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হবার উপক্রম হয়। 'জনা' অভিনয় করার সংকল্প করে শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে দানিবাবুর নিকটেই অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করতে যান। দানিবাবু তখন আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেছেন। সেখানকার কতৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ভয়েই হোক বা প্ররোচনাতেই হোক, তিনি সে সময় তাঁকে সে অধিকার দিতে পারবার অক্ষমতা জানান। শিশিরকুমার তখন বাধ্য হয়ে আইনের সুযোগ নিয়েই 'জনা' অভিনয় করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, শিশির-কুমার 'জনা' অভিনয় করবেন, এ কথাটা প্রকাশ হবার পরই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী

আর্ট থিয়েটার উদ্যোগী হয়ে পূর্বেই সে নাটকের অভিনয় স্বত্ব জোগাড় করেছিলেন। যেমন করেই হোক, 'জনা' অভিনয় করবার জন্ত শিশির-কুমারের এই দৃঢ় সংকল্প দেখে, কথিত আছে, দানিবাবু তখন তাঁকে নিজেই অভিনয়-স্বত্ব লিখে দিতে সম্মত হলে, শিশিরকুমার আদালতের সাহায্য পরিত্যাগ করে দানিবাবুর কাছ থেকেই 'জনা'র অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করেন। প্রসঙ্গতঃ 'জনা'র প্রাচীরপত্রের কথাও উল্লেখ করতে হয়। প্রথম ঘোষণা-পত্রে এই ভাবটাই অতি সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট হয়েছিল যে, নাট্যমন্দিরে 'জনা' নাটকের অভিনয় এখনো বিষম জটিল জালের মধ্যে জড়িত হোয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় পোষ্টারে দেখা গেল—'জনা' তার সমস্ত জটিল জালের আবরণ মুক্ত হয়ে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রাচীরপত্র দেখে সকলেই শিল্পীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। ঘোষণাপত্রে চমৎকার কলানৈপুণ্যের পরিচয় বাংলা থিয়েটারে নাট্যমন্দিরের আর একটি মৌলিক কৃতিত্ব।

নাট্যমন্দিরে 'জনা'র প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল:

জনা— শ্রীমতী তারাসুন্দরী
প্রবীর— শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী
নীলধ্বজ— ,, নরেশচন্দ্র মিত্র (পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য)
শ্রীকৃষ্ণ— ,, রবীন্দ্রমোহন রায়
অর্জুন— ,, ললিতমোহন লাহিড়ী
বৃষকেতু— ,, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মদনমঞ্জরী—শ্রীমতী প্রভা
নায়িকা— ,, চারুশীলা
গঙ্গারক্ষকদ্বয়—শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য ও
,, অমিতাভ বসু (এ)

নাট্যমন্দিরের 'জনা'র অভিনয়ে প্রথমে বিদূষকের ভূমিকাটি বর্জিত হয়, পরে (অর্থাৎ ১০ম অভিনয়ের পর থেকে) তৎকালীন প্রবীণ অভিনেতা ও নৃত্যকলার যাদুকর সর্বজনপ্রিয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুকে ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ করান হয়। ইনি নাট্যমন্দিরের প্রায় গোড়া থেকেই শিশিরকুমারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন। নৃপেনবাবুর পরে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ঐ বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। নাট্যমন্দিরের দেখাদেখি আর্ট থিয়েটারও প্রতিযোগিতায় 'জনা' মঞ্চস্থ করেন এবং ষ্টারমঞ্চে প্রবীরের ভূমিকায় দানিবাবু অবতীর্ণ হন। 'প্রবীর' তাঁর নটজীবনের প্রথমভাগের একটি সুখ্যাত ভূমিকা। একই নাটক নিয়ে দুই থিয়েটারের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সেদিন শহরে নাট্যামোদীদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং প্রাচীন দর্শকদের মধ্যে অনেককেই সম্ভবতঃ পঁচিশ বছর আগের (জুন, ১৯০০ খ্রীঃ) 'সীতারাম' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে ক্লাসিক ও মিনার্ভার প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল —সে সময়ে মিনার্ভা ও ক্লাসিকে এই নাটকের নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ। ক্লাসিকের হাণ্ডবিলে লেখা হোত—"ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা—স্থবির নহে।" এই সময়ে এই দুইটি থিয়েটারে অভিনয় ব্যাপারে তুমুল প্রতিযোগিতা চলেছিল। "Howling is not acting"—গিরিশচন্দ্রের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি এই সময়েই অমর দত্তকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল।

বাংলা থিয়েটারে 'জনা' একখানি সুবিখ্যাত নাটক এবং গিরিশ-প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি এই নাটক। সুতরাং এর পূর্ব-ইতিহাস এখানে একটু বলা দরকার। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় যখন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী, তখনই গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করেন এবং মিনার্ভাতেই এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৩০০ সালের ৯ই পৌষ। মিনার্ভায় 'জনা'র প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান-ভূমিকালিপি এইরকম ছিল: বিদূষক—অর্ধেন্দুশেখর; নীলধ্বজ—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য; প্রবীর - দানিবাবু; জনা—তিনকড়ি; বসন্তকুমারী—কুসুমকুমারী। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জানা যায়, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি এই নাটকে 'জনা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেই খ্যাতি তাঁকে অভিনেত্রী হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের 'মুকুটমণি' করে রেখেছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতায় ও তত্ত্বাবধানে সেদিন 'জনা' নাটকের অপূর্ব ও সুন্দর অভিনয় পরবর্তী ত্রিশ বৎসরকাল দর্শকরা

ভুলতে পারে নি। 'জনা' নাটকের খ্যাতি তার এই অভিনয়সাফল্যের জন্য এত বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে, প্রায় প্রত্যেক নূতন রঙ্গালয়েই বার বার এর পুনরভিনয় হোয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রত্যেক পুনরভিনয়েই এই নাটকের প্রাচীন অভিনয় ধারাকেই হুবহু অনুসরণ করবার একটা অদ্ভুত চেষ্টা দেখা গিয়েছে। কোনো থিয়েটারই তখনো পর্যন্ত এই নাটকখানির অভিনয়ে নূতন কোনো নাটকীয় সৌন্দর্য বা অভিনয় সৌকর্য দেখাতে পারে নি।

তারপর বত্রিশ বছর পরে নাট্যমন্দিরে সেই বহু-বিখ্যাত নাটকের পুনরভিনয় যখন ঘোষিত হয়, তখন অনেকেই শিশিরকুমারের দুঃসাহসের প্রশংসা করেছিলেন এবং সকলেই নূতন কিছু দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীবও ছিলেন। অবশ্য ইনস্টিট্যুটে তিনি 'জনা' নাটকে বহু পূর্বেই প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। 'জনার' পুনরভিনয়ে নানা অভিনব সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখে দর্শকবৃন্দ বিস্মিত, প্রীত ও মুগ্ধ হোল। 'সীতা'র মতোই 'জনা'ও অভিনন্দিত হোল। এই নাটকের প্রযোজনাতেও শিশিরকুমারের প্রয়োগ-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছিল। নাট্যমন্দিরের 'জনা' রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাঙালি দর্শককে নূতন করে আশান্বিত করে তুললো। গিরিশচন্দ্র যখন এই নাটক রচনা করেন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্য সবে তার কৈশোর অবস্থায় পদার্পণ করেছে। তাই যাত্রার গীতাভিনয়ের প্রভাব এই নাটকের গঠনে লক্ষণীয়। অভিনয়েও তখন যাত্রার ছাপ থাকতো। নাটকের রূপ তাই বদলায় নি। ত্রিশ বছর ধরে একই ধারায় অভিনীত হয়ে এসেছে। শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম 'জনা'কে সম্পূর্ণ নূতন রূপে উপস্থাপিত করলেন নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত করে। (এইখানেই নাটক সম্পাদনা বা editing-এর প্রশ্ন আসে)। নাট্যমন্দিরের 'জনা' তাই অভিনব যৌবনদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে দর্শকমানসে নিয়ে এল নূতন অনুভূতি, নূতন স্বাদ। যুগান্তর এইখানেই।

গিরিশপ্রতিভার ঐতিহ্যপুষ্ট বাংলা থিয়েটারের বহু প্রবীণ অভিনেতা ও প্রবীণা অভিনেত্রীকে শিশিরকুমার তাঁর নাট্যপ্রতিষ্ঠানে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের শিক্ষায় সম্পূর্ণ দল তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। তারাসুন্দরীর

খ্যাতির কথা তাঁর জানা ছিল। 'জনা'র ভূমিকার জন্য তিনি পুরাতন যুগের এই সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীকেই নির্বাচিত করেছিলেন। তারাসুন্দরী তখন থিয়েটার থেকে একরকম অবসর গ্রহণ করে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেইখানেই পূজা-অর্চনায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করছিলেন। শিশিরকুমারের আহ্বানে প্রায় তিন-চার বছর পরে রঙ্গমঞ্চে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল। তিনি নাট্যমন্দিরে যোগদান করলেন। যেদিন প্রাচীরপত্রে এই দুর্লভ মণি-কাঞ্চন সংযোগের সংবাদ ঘোষিত হয়, সেদিন অনেকেই রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বত্রিশ বছর আগের লেখা এবং বহু-অভিনীত নাটক আর তারই নাম-ভূমিকায় গিরিশযুগের প্রবীণা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী (তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি)। বহু বিখ্যাত ভূমিকায় তিনি জীবনের ত্রিশ বৎসরকাল অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন সুশ্রাব্য তাঁর কণ্ঠস্বর, তেমনি নির্দোষ উচ্চারণ ভঙ্গি। কথিত আছে, নাট্যকলাপটিয়সী তারাসুন্দরীকে স্বহস্তে মানুষ করেছিলেন অমৃতলাল মিত্র। পুরাতন ষ্টারে 'চন্দ্রশেখর' নাটকে সুকণ্ঠ অমৃতলাল নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। মঞ্চের প্রথম শৈবলিনী তারাসুন্দরী। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন—সেদিন তিনিই ছিলেন—"The only greatest actress of the Bengali stage."। সেই তারাসুন্দরী আজ এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমারের পার্শ্বে। প্রাচীন ও নবীনের এই মিলনও একটি যুগান্তর।

নাট্যমন্দিরে 'জনা' নাটকে জনার ভূমিকাভিনয়ে তারাসুন্দরী উচ্চাঙ্গের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন—সেই বয়সে তাঁর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য লীলায় ও ভাবভঙ্গির অপরূপ বিকাশে যে অতুলনীয় সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ষ্টেজে তার তুলনা নেই, বলেছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। প্রাচীন যুগের দর্শকদের মধ্যে সেদিন শোনা গিয়েছিল যে, তিনকড়ির জনার অভিনয়ের খ্যাতিকে বিশেষ পেছনে ফেলে না রাখতে পারলেও তারাসুন্দরীর 'জনা' আপন মৌলিকতার অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। নাট্যমন্দিরে 'জনা' নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল এর নৃত্যগীত। নৃত্যের পরিকল্পনা ছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের। যোগ্য

রসিকজনের সহায়তা শিশিরকুমার সব সময়ই গ্রহণ করতেন। 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমার ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার পুনঃপ্রবর্তন করেন, 'জনা' নাটকেও তিনি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যপত্রিকা 'নাচঘর' মন্তব্য করে লিখেছিলেন: "এ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে আমরা যত নাচগান দেখেছি তার কোনোটাতেই সঙ্গীতের ভাষাকে সুরের অনুকূল করে নৃত্যের ছন্দের ভেতর দিয়ে তার ভাবের এমন মূর্ত বিকাশ দেখতে পাই নি। নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চের ওপর নৃত্য-গীতকে যেভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তা শুধু প্রাণবন্তই হয় নি প্রাণস্পর্শীও হয়েছে। বিশেষভাবে নায়িকার দৃশ্যটির অভিনয়ে যে অদৃষ্টপূর্ব অভিনয় কলার অপরূপ বিকাশ দেখে আসা গেল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তা এক নূতন যুগের সূচনারূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" এই নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা (যিনি নাট্যমন্দিরে যোগদানের পূর্বে মিনার্ভার ব্যালে গার্ল ছিলেন।) শিশির-কুমারের শিক্ষকতায় অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমতী প্রভা তখন নাট্যমন্দিরের নবীনা অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা—'সীতা'র ভূমিকা অভিনয় করে তিনি মঞ্চে তাঁর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'জনা'য় তিনি মদনমঞ্জরীর ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে দ্বিতীয়বার বিস্মিত করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দর সেই অভিনয়। এতদিন পর্যন্ত 'জনা' নাটকের অভিনয়ে এই ভূমিকাটি একরকম উপেক্ষিতই ছিল। শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ে সেই চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে নাটকে একটা নূতন গুরুত্ব পেল। যা ছিল পূর্ব-পূর্ববর্তী অভিনয়ে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা তাকেই তিনি তাঁর সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয়ভঙ্গির দ্বারা নূতন করে সৃষ্টি করে একটা দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য বিষয় করে তুলেছিলেন। দর্শক বুঝল পুরাতন নাটক কি ভাবে নূতন করে অভিনয় করতে হয়। প্রভার মদনমঞ্জরী দর্শকদের মনে দীর্ঘকাল ছিল – যেমন ছিল পরবর্তীকালে তাঁর অভিনীত 'রমা' প্রভৃতি প্রত্যেকটি ভূমিকা। শিশিরযুগের এবং শিশির-সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। পরবর্তীকালে শ্রীরঙ্গমে একদিন প্রভার প্রসঙ্গে (প্রভা তখন তাঁর সম্প্রদায় ছেড়ে নাট্যভারতীতে যোগদান করেছেন।) নাট্যাচার্য আমাকে বলেছিলেন—"She is the ruins of a mighty

monument—অমন অভিনেত্রী দুটি নেই”—এই উক্তির মধ্যেই প্রভার অভিনয়প্রতিভার সকল কথা বলা হয়েছে।

তারপর ‘প্রবীর’। এই ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। “তিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রবীরদের পদাঙ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েও এই বহুখ্যাত ভূমিকাটির যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুন্ন করা দূরে থাক, বরং দ্বিগুণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাঁর মাতৃসন্নিধানে এসে বীরপুত্রের দুর্জয় অভিমান প্রকাশ, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসকাশে প্রেমের অনবদ্য সহজ লীলা, তাঁর নায়িকার রূপমোহে কামাতুর ও অসহায় অবস্থা, পরিত্যক্ত শ্মশান-প্রান্তে জীবনের ধিকৃত মুহূর্তে তাঁর সেই শ্লেষাত্মক ‘কৃষ্ণার্জুন’ সম্ভাষণ—সবই অনুপম কলানৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এনেছিল বিমুগ্ধ দর্শকদের সামনে।” তুলনায় ষ্টারে দানিবাবুর ও মিত্রতে নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনীত প্রবীর দর্শকদের কাছে ম্লান মনে হোত। জনার সেই উৎসাহী মাতৃভক্ত প্রবীরের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি দানিবাবুর অভিনয়ে। ষ্টারে প্রবীরের অভিনয়, নাতনীর বয়সী মদনমঞ্জরীর কাছে, কন্যার বয়সী জনার কাছে, এবং নাতির বয়সী অর্জুনের কাছে অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। ‘নীলধ্বজ’ এই নাটকের আর একটি অবহেলিত ভূমিকা। এতদিন জনার অভিনয়ে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই নীলধ্বজের ভূমিকাটি একটু কম-বেশি অবহেলিত হয়ে আসছিল, অথচ জনার অভিনয়ে এটি একটি প্রধান চরিত্র। প্রবীর ও জনার জীবনের বহু সঙ্কটাবর্ত রাজা নীলধ্বজের অঙ্গুলি সঞ্চালনার উপরই নির্ভর করে। শিশিরকুমার এই অবহেলিত ভূমিকাটিকে যথাযথভাবে রূপ দেওয়াতে সমর্থ হন। অভিনয়ে যেমন, ‘জনা’র প্রয়োজনার ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক অভিনবত্ব দেখা গিয়েছিল। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল তা হোল—এই অভিনয়ে কৈলাস ও গোলকের দৃশ্যের পরিবর্জন। বাংলা থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে সর্বপ্রথম দৈব বা অধিদৈব ব্যাপারগুলিকে বর্জন করে একটি মানবীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেন শিশিরকুমার। পৌরাণিক নাটকে তিনিই সর্বপ্রথম চিরাচরিত বিবেক বা নিয়তির ট্রাডিসন পরিবর্জন করেন—অবশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকেই আমরা এর প্রথম সূচনা লক্ষ্য

করি। মঞ্চে পৌরাণিক নাটকের উপস্থাপনার এই টেক্‌নিক ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল। জনা নাটকের শেষে গঙ্গার আবির্ভাবকে শিশিরকুমার ভগবতী ভাগীরথী দেবী না করে গঙ্গাধরের জটাজাল-বিচ্যুতা জাহ্নবীর সহস্রধারাকেই কল্পনা করেছিলেন এবং দর্শককেও সেইমত কল্পনা করে নিতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—এই যে "Left to imagination"—প্রাক্-শিশিরযুগে এ ছিল অভাবনীয়। এই সময়ে মিত্র থিয়েটারেও 'জনা'-র অভিনয় হয়েছিল। মিত্র-তে প্রবীরের ভূমিকা করতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী আর শ্রীমতী শান্তাদেবী করতেন 'জনা-র' ভূমিকা। বাংলা মঞ্চে 'জনা'র ভূমিকা অভিনয় করে এ পর্যন্ত এই পাঁচজন অভিনেত্রী খ্যাতি অর্জন করেছেন, যথা—তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, সুশীলাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী ও শান্তাদেবী। মোটের উপর, সেকালের অপুষ্ট নাটকের সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জনের দ্বারা তাকে বর্তমান যুগসাহিত্যের ছন্দানুবর্তী করে তোলা এবং পৌরাণিক দেশ-কালোচিত বেশভূষা, অলঙ্কার দৃশ্যপট ও রঙ্গভূমি সজ্জার দিক দিয়ে ও অভিনয় উৎকর্ষতায় নাট্যমন্দির এই জনার অভিনয়ে যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা সে যুগের প্রত্যেক নাট্যশালাকেই একটা নূতন প্রেরণা দিয়েছিল—পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের একটা নূতন ধারার সন্ধান দিয়েছিল।

জনার পর পাষাণী; তারপর নূতন নাটক 'পুণ্ডরীক'। পুণ্ডরীকের প্রথম অভিনয়-রজনী, ২৭শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩২। ভিক্টর হিউগোর 'Hunchback of Notredam'-এর অনুসরণে লেখা ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসুর এই নৃত্যগীতিবহুল নূতন নাটকখানির ভূমিকালিপি এই রকম ছিল: পুণ্ডরীক—শিশিরকুমার; ভৃঙ্গার—নরেশ মিত্র; কাশীমদ—গোপালদাস ভট্টাচার্য; উষানাথ—বিশ্বনাথ; নায়ক—তারাকুমার; সাকী—তারাসুন্দরী; রুস্তানা—চারুশীলা; কমলা—সরলাবালা; অমলা—শেফালিকা। এই নাটকে তরুণী ইরাণি নর্তকীরূপে চারুশীলার রুস্তানা ও গোপালদাসের কাশীমদ দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল। কুৎসিত কুব্জ কাশীমদের ভূমিকায় গোপালদাসের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন

তাঁরা জানেন যে, যেসব শক্তিমান অভিনেতা প্রাচীনযুগের অক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাঁদের পর্যন্ত শিশিরকুমার বদলিযে দিয়েছিলেন। পুণ্ডরীকের সাজসজ্জা ভালো হয়েছিল। দৃশ্যপটের মধ্যে অবনীন্দ্র-শিষ্য তরুণ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত শীলাদেবীর মন্দিরের শেষ দৃশ্যটিই একমাত্র উল্লেখ্য ছিল।

'পুণ্ডরীক'-এর প্রথম অভিনয়-রজনীর বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়েছিল। সীতা, পাষাণী ও জনা মঞ্চস্থ করে শিশির-কুমার ইতিমধ্যেই বাংলা থিয়েটারের যাদুকর ও মায়াবী প্রয়োগশিল্পী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। পুণ্ডরীকে কিন্তু তাঁর সে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে নি, কারণ নাট্যকার স্বয়ং ছিলেন এর প্রয়োগকর্তা। ভৃঙ্গার কবির ভূমিকায় নরেশ মিত্র ও পঞ্চশরাহত সন্ন্যাসী নায়ক পুণ্ডরীকের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় অনেকের কাছেই সেই কাত্যায়ন ও চাণক্যের মতই উপভোগ্য হয়েছিল। উন্মাদিনী সাকীর ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। নাট্যমন্দিরের শ্রেষ্ঠ নট-নটীরা নাটকের প্রধান-অপ্রধান সমস্ত ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হন এবং প্রাণপণ যত্নে নিখুঁতভাবে অভিনয়ও করেন; কিন্তু আসলে নাটকখানি দুর্বল, তাই দর্শকের কাছে এর তেমন সমাদর হয় নি। এর অভিনয়ও স্থায়ী হয় নি। নাটক নির্বাচনে শিশিরকুমার ভুল করেছিলেন। পুণ্ডরীক তাই নাট্যমন্দিরের প্রথম বিফল অর্ঘ্য। এ নাটক মঞ্চস্থ করে বরং তাঁর কিছু লোকসানই হয়েছিল, শোনা যায়।

এই বৎসরের আষাঢ় মাসটি শিশিরকুমার তথা নাট্যমন্দিরের জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে দুইটি কারণে: প্রথম—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু; দ্বিতীয়—'সীতা'র শততম অভিনয়। যেদিন দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ হয় সেদিন (বুধবার) শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরের অভিনয় বন্ধ রেখেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে fund খুলেছিলেন তাতে সাহায্যের জন্য ষ্টার, নাট্য-মন্দির ও মিনার্ভা এক বিরাট সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। ষ্টার মঞ্চেই এই অভিনয় হয়। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং এর সবটাই দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষাভাণ্ডারে দান করা

হয়েছিল। এই ব্যাপারে শিশিরকুমারই ছিলেন অগ্রণী। দেশবন্ধু শুধু নাট্যমন্দিরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না—কলিকাতা শহরে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের কথা তিনিও সেদিন চিন্তা করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে হয়ত শিশিরকুমারের শেষজীবনের আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ থাকত না।

দেখতে দেখতে 'সীতা'র অভিনয় একশত রাত্রি পূর্ণ হোল। ষ্টারে কর্ণার্জুন তখন প্রায় দুইশততম অভিনয় রজনীর পথে। এই উপলক্ষে নাট্যমন্দিরে সীতার ১০১তম অভিনয়ের রাত্রিতে একটি সুন্দর উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই অভিনয়ের তারিখ ১৩৩২, ২১শে আষাঢ়, রবিবার। উৎসব ও অভিনয় একত্র হোল। বৈকাল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। 'নাচঘর' পত্রিকা (২৬শে আষাঢ়, ১৩৩২) থেকে সেই উৎসবের বিবরণের কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হোল : "গত রবিবার নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'সীতা' নাটকের একাধিক শততম রজনীর উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। সেদিন শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিচিত্র পত্রপুষ্পপতাকায় ও রঙীন বৈদ্যুতিক দীপালোকে মনোমোহন-নাট্যমন্দির সেদিন মনোহর শ্রী ধারণ করেছিল। সমাগত দর্শকবৃন্দকে পুষ্প ও মাল্যদানে এবং সুবাসিত গোলাপের নির্যাসে অভিষিক্ত করে তাঁদের সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আশীর্বাদ মস্তকে নিয়ে এবং তাঁর উপস্থিতিতে নাট্যমন্দিরে সীতার প্রথম অভিনয় রজনী আরম্ভ হয়েছিল। তিনি আশা করেন যে এই সীতা নাটকখানি আরো দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবে। শিশিরকুমার যেন এই একাধিক শততম অভিনয়ের পর 'সীতা'র বনবাস না দেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, একখানি নাটক যদি এইরূপ একাদিক্রমে শত রাত্রি বা সহস্র রাত্রি চলে তা'হলে শিশিরকুমারের ন্যায় একজন প্রতিভাবান দক্ষ নাট্যশিল্পীকে নব নব ভূমিকায় দেখবার অবকাশ আমরা খুবই কম পাব। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শকদের

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন যে, একখানি নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে হলে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং একখানি নাটকের প্রয়োগব্যয় যতদিন পর্যন্ত না উঠে আসে, ততদিন পর্যন্ত সে নাটকের অভিনয় বন্ধ করা বা অপর একখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা সম্ভবপর নয়।··বাংলা দেশ যে শিল্পীর আদর করতে শিখেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে এই নবগঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের আশাতিরিক্ত সফলতা। তিনি যেরূপ বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে পেরেছেন তা হয়তো কোনো দিনই সম্ভব হোত না, যদি না বাংলা দেশের নাট্যামোদী সুধীসজ্জনেরা এতখানি সহানুভূতি দেখাতেন এবং এতটা অনুগ্রহ করতেন। আমার স্বজাতির নামে আর যে কোনো বদনামই লোকে দিক না কেন, তারা যে শিল্পের কদর বোঝে না, শিল্পের আদর করতে জানে না, এ অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না।" উৎসবের পর অভিনয় হয়। বলা বাহুল্য, 'সীতার' অভিনয় সৌন্দর্য এই একাধিক শততম রজনীতে শুধু যে অম্লান ছিল তা নয়—সামগ্রিকভাবে সে-রাত্রির অভিনয় এক চরমসৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

কর্ণার্জুনের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিল নাট্যমন্দিরের সীতা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই নাটকের অভিনয় দেখতে এবং একদা তিনি যে অখ্যাত নটের অভিনয় দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, আজ সেই শিশিরকুমারের প্রতিভার পূর্ণবিকাশ দর্শনে কবি যারপরনাই আনন্দ লাভ করলেন। সেইদিন থেকেই শিশিরকুমার কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর নট-জীবনে এ ছিল এক দুর্লভ পুরস্কার।

॥ ৯ ॥ নাট্যমন্দির : প্রতিভার আলোকোৎসার ॥

'সীতার' শততম অভিনয় রজনীর ঠিক একমাস পরে নবনির্মিত মিনার্ভার উদ্বোধন হোল 'আত্মদর্শন' নাটক দিয়ে। 'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা' বাংলা থিয়েটারে যে নবযুগ এনে দিয়েছিল, সেই গতিপথেই 'আত্মদর্শন' আরো অভিনবত্বের ইঙ্গিত দিল। তাই আমাদের আলোচনার পক্ষে এরও উল্লেখ অপরিহার্য। শিশিরকুমারের সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারের নবযুগ অর্থাৎ অভিনয়কলার অভাবনীয় উন্নতি। গিরিশোত্তর যুগ বাংলা থিয়েটারের মধ্যযুগ—চরম দুর্দশার যুগ। তখন অভিনেতা দানিবাবু, অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। তখন দৃশ্যপট সাজসজ্জা নৃত্যগীত সবই ছিল শিল্পসুষমা-বর্জিত, এমন কি দর্শকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও তখন থিয়েটারের মালিকরা ছিলেন রীতিমত উদাসীন। সর্বরকমে হতশ্রী সেই রঙ্গালয়ে তাই অভিনয়ের নামে তখন সারারাত ধরে হোত প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য। তারপর ম্যাডান খুললেন 'আলমগী'র শিশিরকুমারকে নিয়ে। নবযুগের কিছুটা আভাস এর মধ্যে মিললেও "আলমগীরের অভিনয় ঠিক বর্তমান যুগের প্রথম অভিনয় নয়। সেটা মধ্যযুগেরই অভিনয়; কিন্তু তার মধ্যে শিশির-কুমারের অবির্ভাব হয়েছিল মধ্যযুগের নাট্যমঞ্চের উপর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-পাতের মত।" আগেই বলেছি, আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন', মধ্যযুগীয় প্রভাব সত্বেও, নবযুগের প্রথম পদক্ষেপ। অভিনয়কলা, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা সব কিছুর ভেতরেই একটা নূতনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। নাট্যামোদী জনসাধারণ যে এই নূতনকে সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিল তার প্রমাণ কর্ণার্জুনের দুই শতাধিক রজনী অভিনয়। তবে নিরপেক্ষ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়: "কর্ণার্জুনের অভিনয়ে নূতনের আবির্ভাব আছে কিন্তু পূর্ণ বিকাশ নাই। এই পূর্ণ বিকাশ সর্বপ্রথমে আমরা দেখিতে পাই ভাদুড়ী-সম্প্রদায় কর্তৃক সীতার অভিনয়ে।"

শিশিরকুমারই নবযুগের অগ্রদূত। তিনিই প্রথম বাংলার উচ্চশিক্ষিত

সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সাধারণ রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট করেন। তাঁরই সময় থেকে প্রেক্ষাগৃহে করতালিধ্বনি বন্ধ হয়। কতবার তিনি অরসিক দর্শকদের উদ্দেশে মঞ্চ থেকে বলেছেন: "আমার থিয়েটারে হাততালি নিষিদ্ধ, ওতে অভিনয়ের ব্যাঘাত হয়।" রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলার খ্যাতি-মানদের সকলেই সেদিন সীতার অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। শিশির-কুমারের নূতনত্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় অভিনয়রীতির প্রবর্তন। অভিনয়ের দৃশ্যপট, সাজসজ্জা পরিকল্পনা সবই শিল্পসম্মত এবং প্রকৃত কলাবিদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত। 'সীতা' শিশিরকুমারের প্রথম ও প্রধান কীর্তি। সীতায় নূতনত্বের পূর্ণ বিকাশ। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল মঞ্চের উপর—উদ্বুদ্ধ করল সবাইকে এক নূতন শিল্পচেতনার। 'আত্মদর্শনে' সেই শিল্প-চেতনারই অভিব্যক্তি দর্শকদের বিমুগ্ধ করল। এর প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ, শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ. ১৩৩২। স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্রের এই নাট্যপ্রয়াস বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি নূতন পদক্ষেপ। কেন না, মহাভারত ও রামায়ণকে আশ্রয় করে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে যে নবযুগের প্রবর্তন করেন, মিনার্ভা উপনিষদকে আশ্রয় করে তাই করতে চেষ্টা করেছিলেন সেদিন। এই নূতন নাটকের নাট্যকারও ছিলেন সম্পূর্ণ নবাগত—মহাতাপচন্দ্র ঘোষ। তাই মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে নাট্যকারের নাম প্রকাশ করেন নি। আত্মদর্শন বিজ্ঞাপিত হয়েছিল এই ভাবে:

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

নবগৃহে মিনার্ভার প্রথম অভিনয়

শনিবার ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩২

নবগৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত উপলক্ষে মিনার্ভা সর্বসাধারণের আশীর্বাদ, সহানুভূতি ও পদধূলি প্রার্থনা করিতেছে।

মিনার্ভা থিয়েটার

নবগৃহে ৬নং বিডন ষ্ট্রীট

শনিবার ২৩শে শ্রাবণ, রাত্রি ৭৷৷০টায়

পরদিন রবিবার বৈকাল ৫টায়

কল্পলোকের মাধুর্যমণ্ডিত নৃত্যগীতবহুল নূতন ধর্মমূলক নাটক

আত্মদর্শন

(মহাসমারোহে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়)

সেদিন মিনার্ভার উদ্বোধন করেছিলেন অমৃতলাল বসু। প্রথম রজনীর অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "আত্মদর্শনের প্রযোজনা দেখে মনে হোল যে এই মিনার্ভা পুরাতন মিনার্ভার কেউ নয়। সীতার প্রয়োগরীতির ধারা কা গভীরভাবে একে একে সব কটি রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবিত করেছে তার নিদর্শন নূতন মিনাভার নূতন উদ্যমের প্রথম প্রয়াস আত্মদর্শন। দৃশ্য পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, আসবাব আয়োজন—সর্ব বিষয়েই নূতন ছাপ। এমন পরিচ্ছন্ন শিল্পরুচি আগে ছিল না। অমন সূক্ষ্ম নাট্যরস-বোধও ছিল না।" পুরাতন নট-নটীদের নিয়ে কর্ণার্জুন ও সীতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিনার্ভার এই প্রয়াস সেদিন যে সফলতা অর্জন করেছিল তা সত্যই অপ্রত্যাশিত ছিল। আত্মদর্শনের দৃশ্যপট নির্মাণে মঞ্চশিল্পী পরেশচন্দ্র বসু তাঁর প্রতিভার নূতন পরিচয় দিয়েছিলেন আর নাচ শেখাবার ভার ছিল তৎকালীন প্রসিদ্ধ নৃত্যাচার্য সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। দু'জনেই প্রাচানপন্থী, কিন্তু শিশির-প্রতিভা এঁদেরও সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল। সত্যই এই নাটকখানি সেদিন বাংলা থিয়েটারের "ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক হিসাবে" স্বীকৃতি পেয়েছিল। বাঙালি দর্শক 'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা'র ন্যায় "আত্মদর্শনের ললাটে জয়টিকা পরাইয়া দিয়াছিলেন"। গানই ছিল এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ। আঙুরবালা প্রমুখ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়িকাদের সমাবেশে মিনার্ভা-মঞ্চে সেদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল—এ যুগের নাট্যামোদী বাঙালি তা সহজে বিস্মৃত হবে না। বলতে গেলে আত্মদর্শনের "ভাবময় অতুলনীয় গান"ই বাঙালির অন্তর জয় করেছিল সেদিন। 'সীতা'র প্রয়োগকৌশলকে আত্মদর্শনে আরো একটু উন্নত স্তরে তুলে ধরা হয়েছিল। 'আত্মদর্শন' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এই রকম : মন—মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু); বুদ্ধি—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী; ধর্ম—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়;

সুখ—রেণুবালা ; বিবেক—আঙুরবালা ; প্রবৃত্তি—মনোরমা ; নিবৃত্তি—নগেন্দ্রবালা; রতি—সুবাসিনী ; হিংসা—শরৎকুমারী ; লালসা—প্রকাশমণি ; কুমতি—শশীমুখী ; সুমতি—আশমান তারা ; ভক্তি—নবতারা এবং নিষ্ঠা—কুমুদিনী।

মনোমোহন বোর্ডে নাট্যমন্দির ১৩৩২-এর বড়দিন পর্যন্ত অভিনয় করেন। এখানে শিশিরকুমারের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে 'সীতা' ও 'জনা'ই উল্লেখযোগ্য। 'সীতা'র পর এখানকার দ্বিতীয় নাটক ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'। এর প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। এই নাটকে শিশিরকুমার ইন্দ্র ও গৌতমের পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় অভিনয় করেন। যে নাটক স্বয়ং নাট্যকার তাঁর জীবিতকালে সাধারণ থিয়েটারে মঞ্চস্থ করতে ভরসা পাননি, তাকেই মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার একটা বড় রকমের দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। দুখানা প্রহসনও নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়েছিল এ সময়ে, যথা—'পুনর্জন্ম' ও 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে'—এই দুখানির প্রথম অভিনয় তারিখ ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩২। হাস্যরসাত্মক প্রহসন বা নক্সা অভিনয়েও যে নাট্যমন্দিরের তরুণ শিল্পিরা দক্ষ, তার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছিলেন দুখানা বহু পুরাতন ক্ষুদ্রতম হাস্যরসাত্মক নক্সাকে নবভাবে সুরসাল করে ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে অভিনয় করে। 'পুনর্জন্মে'র সত্যই পুনর্জন্ম হয়েছিল—এই নাটিকার এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় এর আগে আর কোনো থিয়েটারেই হয় নি। যাদবের ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র ; সৌদামিনী—চারুশীলা আর অশ্বিনী—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। এই দুখানি প্রহসনে সাজসজ্জা দৃশ্যপট ও বেশ-ভূষার দিক দিয়ে নাট্যমন্দিরের প্রয়োগখ্যাতিও কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। এই-সব ছোট ছোট বইয়ের ছোট ছোট ব্যাপারগুলিতেও শিশিরকুমার সবিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন।

এই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুরোধে কয়েক রাত্রির জন্য 'আলমগীর' নাটককে নবসজ্জায় উপস্থাপিত করলেন শিশিরকুমার। তারা-সুন্দরী তখন নাট্যমন্দিরে, কাজেই 'উদিপুরীর' জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না। ৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৩২ মনোমোহন বোর্ডে প্রথম আলমগীর অভিনীত

হোল। এই রাত্রির অভিনয়ের ভূমিকালিপি এই রকম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ঃ আলমগীর—শিশিরকুমার; রাজসিংহ—বিশ্বনাথ; কামবক্স—মনোরঞ্জন; বিক্রমশোলাঙ্কী—শৈলেন চৌধুরী; গঙ্গাদাস—তারাকুমার ভাদুড়ী; ভীমসিংহ—রবীন্দ্রমোহন রায়; এরাদৎ খাঁ—অমিতাভ বসু; উদিপুরী—তারাসুন্দরী আর বীরাবাই—প্রভা। তারাসুন্দরী তাঁর পরিণত বয়সে এই জটিল ভূমিকার সুঅভিনয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শিশিরকুমারের আলমগীরের অতুলনীয় অভিনয় এবার দ্বিগুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। হবারই কথা, কেন না কুসুমকুমারী অপেক্ষা তারাসুন্দরী প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, তাঁর অভিনয়ের স্থাপত্যরীতি বা structure-ই আলাদা; এ কথা অনেকবার শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি তারাসুন্দরী সম্পর্কে। আলমগীর ও উদিপুরীর নাটকোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার অপূর্ব সৌন্দর্যে রঙ্গমঞ্চের ওপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এযুগের ও সেযুগের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অপরূপ কলানৈপুণ্যের গুণে। বাংলা রঙ্গমঞ্চর ছয়জন অভিনেত্রী—কুসুমকুমারী, মালিনী, তারাসুন্দরী, প্রভা, নিভাননী ও রেবা—এ পর্যন্ত উদিপুরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রেবাই সর্বশেষ উদিপুরী।

বড়দিনের ছুটিতে (১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ) নাট্যমন্দিরের প্রোগ্রামে দেখা যায় যে, এই কয়খানি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয়েছিল যথা,—জনা, সীতা, আলিবাবা, পুনর্জন্ম ও চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে। আলিবাবাতে নৃপেন বসু ও চারুশীলা যথাক্রমে আবদাল্লা ও মর্জিনার ভূমিকায় নামতেন। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, নাট্যমন্দিরের প্রথম পর্যায়ে শিশিরকুমারের প্রচেষ্টা পৌরাণিকধারা এবং পুরাতন নাটক-প্রহসনের অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর নাট্যমন্দির একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর এই কোম্পানি রেজিস্টারী হয়, নাম হয় 'নাট্যমন্দির লিমিটেড'। মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা—প্রতি শেয়ারের দাম ছিল একশত টাকা। পরিচালকগণের মধ্যে ছিলেন: (১) তুলসীচরণ গোস্বামী; (২) নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও (৩) শিশিরকুমার ভাদুড়ী—প্রতিষ্ঠায়, সম্ভ্রমে, শিক্ষায় এক ডাকে চিনতে পারে এমনই তিনটি নাম। ম্যানেজিং এজেন্টস: মেসার্স ভাদুড়ী য়্যাণ্ড কোং। অডিটরস: এম মুখার্জি য়্যাণ্ড কোং। ব্যাঙ্কার্স:

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। নাট্যমন্দিরের শেয়ার কিন্তু আশানুযায়ী বিক্রী হয়নি। না হবার কারণ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড তার অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে পারে নি। থিয়েটার যখন ব্যক্তিবিশেষের প্রয়াস ছিল তখন এই থিয়েটারের ব্যবসায় থেকেই একাধিক লোক প্রচুর লাভবান্ হয়েছিলেন। কিন্তু কি উনিশ শতকে প্রেসিডেন্সী থিয়েটার লিমিটেড, কি এই বিংশ শতকে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির লিমিটেড, —কেউ-ই লাভ করতে পারে নি, অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা।

নাট্যমন্দির একটি যৌথ কোম্পানিতে পরিণত হোল কিন্তু তার আর্থিক ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় হোল না। এই প্রসঙ্গে নাট্যমন্দির লিমিটেডের হিসাব পরীক্ষক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় (এম. মুখার্জি য়্যাণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও শিশিরকুমারের শ্রদ্ধেয় মাখনদা) আমাকে বলেছেন: "শিশিরের কথা মনে হলেই এক unfortunate genius-এর কথা মনে হয়। যখন তার নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়, আমিই তার সব কাগজপত্র তৈরি করি এবং আমি নিজে পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী করে দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। তাকে আমি হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক থেকে তিন লক্ষ টাকা ওভারড্রাফট পাইয়ে দিয়েছিলাম। যোগেন লাহিড়ী ছিলেন এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং তাঁরই এক ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে শিশিরের ছোট ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ীর বিয়ে হয়। এই ব্যাঙ্কটি ছিল স্বদেশীযুগের দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক—এর প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর আর কাশীম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এই ব্যাঙ্কেরই মতিবাবু বলে একটি কর্মচারী নাট্যমন্দিরের হিসাবের খাতাপত্র লিখতেন। কথা ছিল প্রতি সপ্তাহে টিকিট বিক্রী করে যে-টাকা পাওয়া যাবে তার প্রথম charge ব্যাঙ্কের; ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এসে রসিদ দিয়ে সেই টাকা নিয়ে যাবে ও ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় তা নাট্যমন্দিরের নামে জমা পড়বে। কিন্তু শিশির শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের এই নির্দেশ মেনে চলে নি—না চলার জন্য সে যে দায়ী ছিল, তা নয়। সে সব কথা খুলে বলবার নয়। কত রাতে শিশিরকুমার আমার গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় এসে ট্যাক্সির জন্য ভাড়া চাইতো। আমি দিতাম।

টাকা-পয়সার ওপর দরদ তার কোনো দিনই ছিল না, নিজের হাতে কিছু রাখতও না সে—এ বিষয়ে সে ছিল পরম উদাসীন। যদি এই ব্যাপারে অন্যের ওপর সে অতটা নির্ভরশীল না হোত, তা'হলে হয়তো শেষবয়সে starvation-এ সে মারা যেত না। আরো দশটা বছর বাঁচতে পারত।"

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মণিমোহন সেনের একটি কথা উল্লেখ করব। তিনি আমাকে বলেছেন: "আমি তখন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, শিশির আমার জুনিয়র ছিল, কিন্তু তখন কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে তারই খ্যাতি ছিল বেশি। আমরা যখন জানতে পারলাম যে শিশির আর কলেজে থাকবে না, প্রফেসারি ছেড়ে থিয়েটারে professional actor হিসাবে যোগদান করবে, তখন আমাদের সতীর্থদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু বিস্মিত হই নি—কারণ শিশিরের মধ্যে যে জিনিস ছিল, আমি বুঝেছিলাম, তা কলেজের লেকচার রুমে আবদ্ধ থাকবার নয়। তারপর একদিন সে আমাকে কলেজ থেকে ডেকে নিয়ে কার্জন পার্কে এলো। সময়টা বোধ হয় দুপুরবেলা ছিল। পার্কের এক জনবিরল কোণের একটা বেঞ্চিতে বসে শিশির আমাকে বললে—মণিবাবু, আমি resign করবো; ঠিক করেছি থিয়েটারে join করবো। আপনি কী advice দেন? আমি বলেছিলাম, শিশির থিয়েটারই তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে তুমি যে রকম careless, আমার অনুরোধ নিজে যখন থিয়েটার খুলবে তখন তুমি একজন পাকা accountant রেখে দিও—নইলে তাল সামলাতে পারবে না। পরে শুনেছি শিশির থিয়েটারের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিল। কিন্তু সে এক পয়সাও রাখতে পারে নি। তার শেষ জীবনের অর্থকষ্টের সংবাদে তাই আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হই।"

লিমিটেড কোম্পানি হবার পর মনোমোহনের জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে নাট্যমন্দির কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে উঠে এলো (বর্তমান শ্রী চিত্রগৃহ)। এই নূতন নাট্যসৌধে প্রবেশের প্রাক্কালে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এখানে দর্শকদের সুখসুবিধা আরাম ও স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্বপ্রকার আধুনিক সুব্যবস্থা

থাকবে আর রঙ্গালয়টি স্বয়ং নাট্যমন্দিরের 'অধিকারী' শিশিরকুমারের তত্ত্বাবধানে একেবারে আধুনিকতম অভিনয়কলা পদ্ধতি অনুযায়ী ও রঙ্গ-বিজ্ঞান সম্মত করে গড়ে তোলা হবে। হয়েও ছিল তাই। যে বিভিন্ন চারটি মঞ্চে নাট্যমন্দির, নবনাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গম স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে এই 'শ্রী' মঞ্চটিই শিশিরকুমারের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। বলতেন—"শ্রী-র opening ও depth সবচেয়ে বেশি। দিগ্বিজয়ীর মত নাটক তাই এখানে করতে পেরেছিলাম"

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে নাট্যমন্দিরের পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস সবচেয়ে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। নাট্যমন্দিরের ইতিহাস শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রকৃত ইতিহাস। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি বিজড়িত। শিশিরকুমার ও নাট্যমন্দির, এক এবং অভিন্ন, যেমন বিগত যুগের ক্লাসিক থিয়েটার ও অমর দত্ত। পরে তিনি আরো দুটো নাট্যপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু শিশিরপ্রতিভার যা কিছু রমণীয় এবং বরণীয় বিকাশ, তা নাট্যমন্দিরের এই দ্বিতীয় পর্যায়েই দেখা গিয়েছিল। হেমেন্দ্রকুমার যথার্থ ই লিখেছেন: "ঐখানেই শিশির-কুমার নিজের প্রতিভাবৈচিত্র্য দেখাবার চরম সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঐখানে নাট্যকলার নানা বিভাগে নানা রূপে তিনি এমনভাবে দেখা দিয়ে-ছিলেন যে, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন নিজের সঙ্গে নাট্যমন্দিরেরও নাম।" কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে শিশিরকুমারের স্মরণীয় নাট্য-প্রয়াসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল 'বিসর্জন', 'ষোড়শী', 'দিগ্বিজয়ী' ও 'নর-নারায়ণ' আর পুরাতন নাটকের মধ্যে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস' ও 'রঘুবীর'। অতঃপর আমরা এইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। বুধবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৩৩,—নাট্যমন্দিরের বিজয়লক্ষ্মী সীতাকে অগ্রবর্তিনী করে ভাদুড়ী-সম্প্রদায় কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে তাঁদের রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করেন।

নাট্যমন্দিরে 'বিসর্জন'-এর প্রথম অভিনয় হয় ১১ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৩। এর এক বছর আগেই (১৩৩২, শ্রাবণ) ষ্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ হয় এবং এর অপূর্ব অভিনয় রঙ্গজগতে নিয়ে আসে

তুমুল চাঞ্চল্য। বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রথম অভিনয় উনিশ শতাব্দের শেষের দিকের ঘটনা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন ষ্টার থিয়েটার সর্বপ্রথম কবির 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের অভিনয় করেন। তারো চার বছর আগে পারিবারিক মঞ্চে কবি স্বয়ং এর প্রথম অভিনয় করেন। ব্রাহ্মসমাজকে অর্থসাহায্য দান করবার জন্য ষ্টারে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের বউ-ঠাকুরানীর হাটের নাট্যরূপ 'বসন্তরায়' মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কেদারনাথ চৌধুরী। তারপর গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে কবির 'রাজা-রানী' নাটকের অভিনয় হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং একমাত্র সাধারণ পরিচিত শ্রেণীর পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকের রচনাকাল বাংলা ১২৯৬, ইং ১৮৯০। রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা সেজেছিলেন মতিলাল সুর আর রেবতীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন ক্ষেত্রমণি। অন্যান্য ভূমিকলিপি এইরকম ছিল: সুমিত্রা—গুলফম হরি; ইলা—হাড়কাটার কুসুম; কুমার—মহেন্দ্রলাল বসু এবং চন্দ্রসেন—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য। বাংলা নাটকের ও নাট্যশালার ইতিহাসে 'রাজা ও রানী'র অভিনয় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এর চল্লিশ বছর পরে রাজা ও রানীর কাহিনী নিয়ে কবি গদ্যনাট্য 'তপতী' রচনা করেন। সেই তপতী-কে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন শিশিরকুমার, সে-কথা যথাস্থানে বলব। সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্থায়ী সংযোগ হয়—এই উচ্চাশা এ-যুগে শিশিরকুমার বিশেষভাবেই পোষণ করতেন। কথিত আছে, 'সীতা'র অভিনয় দেখে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবি সর্বপ্রথমে তাঁকেই 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নিজে এর নাট্যরূপ রচনা করে দিয়েছিলেন এবং নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি তাঁরই হাতে দিয়েছিলেন। (চিরকুমার সভা যখন সর্বপ্রথমে ভারতী পত্রিকায় একটি নাটকীয় কাহিনী হিসাবে প্রকাশিত হয়, শিশিরকুমার তখনই এর অভিনয়-সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন)। চিরকুমার সভার অভিনয়ের উদ্যোগ-আয়োজনও তিনি

করেছিলেন ; কিন্তু অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এমন একটি যোগ্য অভিনেতার অভাবে তাঁর এই উদ্যম বাস্তবে রূপায়িত হতে বিলম্ব হয়। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "এই বিলম্বের সুযোগ গ্রহণ করলে আর্ট সম্প্রদায়। চিরকুমার সভাও শিশিরকুমারের হাতছাড়া হয়ে গেল।"

রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস 'রাজা ও রানী' ব্যর্থ হবার পর তাঁরা 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করেন। আধুনিক যুগে পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্র-নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করার গৌরব তাঁদের। ষ্টারে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, যথা—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুসংস্কৃত করে এবং বহু নূতন গান সংযোজনা করে নাটকখানিকে বর্তমান রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী করে গড়ে দিয়েছিলেন ; সুর-শিল্পী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকের গানে সুর-সংযোজনা করেছিলেন এবং শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর দৃশ্যপটের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন। সাধারণ থিয়েটারে এমন যোগাযোগ দুর্লভ। দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ষ্টারে চিরকুমার সভার ভূমিকালিপি এই রকম ছিল:

চন্দ্রবাবু ··· অহীন্দ্র চৌধুরী
রসিক ··· অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পূর্ণ ··· দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্ষয় ··· তিনকড়ি চক্রবর্তী
বিপিন ··· রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ ··· ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
নীরবালা ··· রাণীসুন্দরী
নৃপবালা ··· ফিরোজা
শৈলবালা ··· নীহারবালা

সমসাময়িক একখানি পত্রিকায় চিরকুমার সভার অভিনয় সম্পর্কে এই-রকম মন্তব্য করা হয়েছিল: "আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় প্রাণপণ যত্নে এই নাটকটির যেরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আয়োজন করেছিলেন তা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। বেশভূষায়, সাজ-সরঞ্জামে, আসবাবপত্রে, দৃশ্যপটে, সঙ্গীতে,

বক্তৃতায়, অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। এমন নির্দোষ নিখুঁত-ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের এত চিত্তাকর্ষক অভিনয় আর্ট রঙ্গমঞ্চে এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। প্রয়োগকৌশলও অদ্বিতীয় হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরির চন্দ্রবাবুই ছিল এই নাটকের সাফল্যের মেরুদণ্ড—তাঁর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব ও অতুলনীয়। রসিকের ভূমিকায় প্রধান ও অভিজ্ঞ নট অপরেশচন্দ্র সুন্দর সরস ও মনোজ্ঞ অভিনয় করেন। ভঙ্গিতে, বচনবিন্যাসে, পরিহাসচাতুর্যে অপূর্ব রসধারা প্রবাহিত করে দিয়ে, তিনি দর্শকদের প্রীত ও মুগ্ধ করেন। আর সঙ্গীতের হিল্লোলে, অভিমানের অপূর্ব অভিব্যক্তিতে নীহারবালার অভিনয় সেদিনের সমস্ত অভিনেত্রীকে বহু পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছিল।" 'চিরকুমার সভা' কর্ণার্জুনের মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

কাজেই পূর্বের ন্যায় এবারও রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে শিশির-কুমারকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হোতে হোল। নাট্যমন্দিরে 'বিসর্জন' এইভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ঃ

নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নব নিকেতন—১৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের

বিশ্ব-বিশ্রুত নাটক

বিসর্জন!

প্রথম অভিনয় ১১ই আষাঢ়, শনিবার ৭॥ টায়

দ্বিতীয় অভিনয় ১২ই আষাঢ়, রবিবার ৫॥ টায়

রঘুপতি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এই

বিসর্জন

অধুনা প্রচলিত বিসর্জন নাটককে ভাঙিয়া গড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আকারে প্রকারে যথেষ্ট নূতনত্ব দেওয়া হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্র-নাথের অনুগ্রহপূর্ণ আদেশে ও তাঁহার সুনিপুণ নির্দেশে নাট্য-মন্দিরে অভিনয়ার্থ এই নাটক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। দৃশ্যাবলীর সংস্থানেও অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। কাজেই এই বিসর্জনে নূতনত্বের অভাব হইবে না। কবির সুরভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগুলি সঠিকরূপে তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগী দৃশ্যপট রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন নাটক নূতন হইয়াছে।

বিসর্জন

নাটকের এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

'বিসর্জন' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল: রঘুপতি—শিশিরকুমার; রাজা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; নক্ষত্ররায়—নরেশ মিত্র; জয়সিংহ—রবীন্দ্রমোহন রায়; চাঁদপাল—অমিতাভ বসু; রাণী—চারুশীলা; অর্পণা—ঊষা। পরে নরেশ মিত্র রঘুপতি এবং শিশিরকুমার জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। চরিত্র ও ঘটনাবলীকে নিবিড় ও জমাট করবার জন্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে একত্র করা হয় এবং নাটকের অন্তর্নিহিত বেদনা যাতে ঘনীভূত হয় তার জন্য প্রথম সংস্করণ 'বিসর্জন' থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। অপর্ণা ও অন্ধ ভিক্ষুকের জন্য কবি স্বয়ং অনেক নূতন গান রচনা করে দিয়েছিলেন। এই নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রাক্কালে কবির পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য শিশিরকুমার প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যেতেন, কখনো বা জোড়াসাঁকোয়। বাংলা থিয়েটারে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভার এমন সক্রিয় সম্মেলন এই প্রথম। বিসর্জনের দৃশ্যপটের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যপট অঙ্কনে রঙের

যে বিন্যাস তিনি দেখিয়েছিলেন বাংলা ষ্টেজে তা সেদিন বিরল ছিল। গিরিশ এবং গিরিশোত্তর যুগের, এমন কি 'কর্ণার্জুন' পর্যন্ত, দৃশ্যপটই মুখ্য—দর্শকদের কাছে সেইটাই ছিল দ্রষ্টব্য। 'বিসর্জনে' শিশিরকুমার প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে, নাটকের দৃশ্যপট যদি দৃশ্যবস্তুর চেয়ে বড়ো হোয়ে ওঠে, সেটা তার বেয়াদবি। বিসর্জনের-প্রাসাদ-মন্দিরের দৃশ্যদুটিই পরিকল্পনায় ও অঙ্কনে ছিল চমৎকার। কি অভিনয়, কি প্রযোজনা সকল দিক দিয়েই 'বিসর্জন' সাফল্যমণ্ডিত হোয়েছিল। কিন্তু বাঙালি দর্শক 'বিসর্জন' নেয় নি। না নিক, —তবু শিশিরকুমারের একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হিসাবে বাংলা থিয়েটারে এর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্ধ ভিখারীরূপে সুকণ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান এই নাটকের অন্যতম সম্পদ ছিল। বাংলা থিয়েটারে আগে মুডলাইটের (mood light) ব্যবহার ছিল না। বিসর্জন নাটকের প্রথম দৃশ্যে শিশির-কুমার সর্বপ্রথম মুডলাইট ব্যবহার করে দেখালেন যে আলোকসম্পাতের সঙ্গে মঞ্চে নাটকের ক্রিয়ার ও পাত্র-পাত্রীর ভাবপ্রকাশের গভীর সম্পর্ক আছে।

'বিসর্জন'-এর পাঁচদিন পরেই শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করলেন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। পাঁচদিনের ব্যবধানে দুখানি নাটক মঞ্চস্থ করা একমাত্র তাঁর মতো অক্লান্তকর্মা ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তা'ছাড়া, তাঁর আশঙ্কা ছিল যদি বিসর্জন 'মার' খায় তা'হলে তাঁর second line of defence হবে গিরিশ-নাটক। গ্যারিক যেমন ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে শেক্সপিয়ারকে পুনর্জীবিত করেছিলেন, শিশিরকুমারও তাই করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে। 'জনা' মঞ্চস্থ করে তিনি প্রথম দেখালেন যে গিরিশচন্দ্রের নাটক কখনো পুরানো হয় না। শিশিরকুমার তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে সর্বসমেত গিরিশচন্দ্রের পাঁচখানি নাটকের পুনরভিনয় করেছিলেন, যথা—জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল ও বলিদান। বক্স অফিসের দিক দিয়ে 'জনা'র সাফল্যই ছিল সবচেয়ে বেশি। নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩। নাটকখানি এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল :

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(নব পর্যায় প্রথম অভিনয়)

ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিরোধী তিনটি ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বৃহন্নলা—রবীন্দ্রমোহন রায়; কীচক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; বিরাট—শীতলচন্দ্র পাল; যুধিষ্ঠির—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী; অভিমন্যু—ধীরেন্দ্রনাথ দাস; দ্রৌপদী—শ্রীমতি প্রভা; উত্তর—শ্রীমতি চারুশীলা এবং উত্তরা—শ্রীমতি শেফালিকা। পরে এই নাটকে বৃহন্নলার ভূমিকায় ললিতমোহন লাহিড়ী, কীচক ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অবতীর্ণ হতেন। শিশির-কুমারও বৃহন্নলার ভূমিকায় দু'একরাত্রি অভিনয় করেছিলেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রথম অভিনয় চুয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা। তখন এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র এবং বিহারীলাল প্রভৃতি। তখন এর অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল বলে সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জানা যায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে নাট্যমন্দিরে সেই নাটকের revival, স্বভাবতই নাট্যামোদী মহলে প্রবল কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। পুরাতন প্রসিদ্ধ নাটকের পুনরভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটক সম্পাদনার প্রয়োজন হয়। শিশিরকুমার তাই বলতেন, "সময়োচিত পরিবর্তন ও পরিবর্জন ছাড়া এসব নাটক মঞ্চস্থ করা যায় না। আমি তাই নাটক edit করতাম, লোকে ভুল বুঝে বলতো শিশির ভাদুড়ী নাটকে কাঁচি চালায়—কিন্তু অরসিকজন বুঝত না যে আমি যা করি তা scissoring নয়, দস্তুর মত editing; গিরিশবাবুর কোন নাটকই বিনা এডিটিং-এ এযুগে মঞ্চস্থ করা চলে না।" নাট্যমন্দিরে এই নাটক যখন তিনি উপস্থাপিত করলেন, তখন তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য ও প্রয়োগকৌশল দেখে নাট্যামোদী দর্শক প্রথম অনুভব করল যে এই দুটি বিদ্যা আয়ত্তে থাকলে পরে পুরাতন নাটকের মধ্যেও নবযুগের ভাবধারাকে সুন্দরভাবে বইয়ে দেওয়া যায়।

ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন নাটক যখন তিনশত রাত্রি চলেছে তখন একদিন প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞপ্তি থেকে শহরের নাট্যামোদীরা জানতে পারলেন যে, নাট্যমন্দিরে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নূতন পৌরাণিক নাটক, "ভারতপুরাণের মর্মমথিত অপূর্ব নাট্যলীলা" নর-নারায়ণ শীঘ্রই অভিনীত হবে। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণায় নাট্যামোদী ও নাট্যরসিক মহলে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। ইতিপূর্বে ষ্টারে অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' হয়ে গেছে এবং এই নাটকও তখন পঞ্চাশ রজনী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে নাটকের নাম রেখেছিলেন 'কর্ণ', পরে শিশিরকুমারের কথামত পরিবর্তন করে, 'নর-নারায়ণ' নাম রাখেন। এই-সময়ে শিশিরকুমার 'ষোড়শী' অভিনয়েরও আয়োজন করেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আলমগীর' নাটকেই তাঁর নটজীবনের প্রতিষ্ঠা, তাঁর পুরাতন 'রঘুবীর' নাটকেই তাঁর খ্যাতি, সুতরাং মহাভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে নিয়ে লেখা তাঁরই 'নর-নারায়ণ' নাটক জনপ্রিয় হবে, শিশিরকুমার এই প্রত্যাশাই করেছিলেন। তাঁর সেই প্রত্যাশা নিষ্ফল হয় নি। এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ (ইং ১৯২৬)। ভূমিকালিপি এইরকম ছিল :

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
ভীষ্ম—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
ভার্গব ও অর্জুন—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
ভীম—শ্রীঅমিতাভ বসু (এ)
শকুনি—শ্রীনৃপেশচন্দ্র রায়
দ্রৌপদী—শ্রীমতি চারুশীলা
পদ্মাবতী—শ্রীমতি কৃষ্ণভামিনী
গান্ধারী—শ্রীমতি হরিসুন্দরী

কৃষ্ণভামিনী তখন ষ্টার ছেড়ে নাট্যমন্দিরে যোগ দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শৈলেন চৌধুরী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রোঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী,

অমলেন্দু লাহিড়ী, গোপালদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এই নাটকের প্রযোজনায় নাট্যমন্দিরের কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশ পেয়েছিল। দৃশ্যপট অঙ্কনে প্রশংসনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হস্তিনার রাজপ্রাসাদ, পাণ্ডবশিবির, সহস্রাংশুমান সূর্যাঙ্ক-চিহ্নিত কর্ণের কক্ষ—সবই তাঁর তুলির টানে ও বর্ণের আলিম্পনে অনুপম ও বাস্তবানুগ হোয়ে রঙ্গমঞ্চে ফুটে উঠেছিল। সমস্ত কিরীটধারীর শিরোভূষণের স্ব স্ব বিশেষত্ব যত্নপূর্বক রক্ষিত হয়েছিল—এ সূক্ষ্ম জিনিস কর্ণার্জুন নাটকে দেখা যায় নি। অভিনয়ের কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। মোটের ওপর, নাট্যমন্দিরের নর-নারায়ণ নাট্যজগতে এক নূতন কীর্তি বলে সেদিন অভিনন্দিত হয়েছিল।

১৩৩৩-এর আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে চৈত্র পর্যন্ত—নাট্যমন্দিরের এই দশমাসের প্রোগ্রাম থেকে জানা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে সেখানে প্রতি সপ্তাহে ও বড়দিনের আসরে এইসব নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছে; যথা—বিসর্জন, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, সীতা, রঘুবীর, আলমগীর, রাধাকৃষ্ণ, পুনর্জন্ম, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে, নর-নারায়ণ, মুক্তার মুক্তি, পাষাণী, চন্দ্রগুপ্ত, জয়দেব ও প্রতাপাদিত্য। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শিশির-কুমার নর-নারায়ণে কর্ণের ভূমিকা ও অন্যান্য নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেন। ১৪ই ফাল্গুন তিনি অসুস্থ হন; এবং তাঁর এই আকস্মিক অসুস্থতার জন্য নর-নারায়ণ নাটকে মূল ভূমিকাটির অভিনয়ের আকর্ষণ কমে যায়—রবি রায়ের কর্ণ দর্শকদের কাছে তেমন স্বীকৃতি পেল না; ফলে বহু ব্যয়ে মঞ্চস্থ এই সুন্দর নাটকখানির অকাল মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গতঃ শিশিরকুমার তথা নাট্যমন্দিরের জীবনে এই সময়কার একটি শোকবহ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হোল শিশিরকুমারের প্রিয় বান্ধব, ওল্ড ক্লাবের বিখ্যাত অভিনেতা এবং পরে নাট্যমন্দিরের বিশিষ্ট অভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ীর অকাল মৃত্যু। ১৩৩২-এর ১৬ই আশ্বিন এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল। সে যুগে ললিতমোহনের মত আদর্শচরিত্র পুরুষ সত্যই বিরল ছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর স্থিতিকাল মাত্র দু'বছর এবং প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে তিনি যোগদান করেছিলেন শিশিরকুমারেরই সনির্বন্ধ অনুরোধে। ললিতমোহনের মৃত্যুতে

অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে এঁর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে সে সময়ে শিশিরকুমার যা লিখেছিলেন সেটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হোল। ললিতবাবুর মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবে শিশিরকুমারের জীবনে পরম ক্ষতিকর হয়েছিল।

১৩৩৪ সালে শিশির-প্রতিভার দিক্-পরিবর্তন সূচিত হোল শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের পর একখানি নূতন সামাজিক নাটকে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই বছরের আষাঢ় মাসেই নাট্যমন্দিরে একসঙ্গে তিনখানা নাটকের মহলা আরম্ভ হয়, যথা— 'ষোড়শী', 'সধবার একাদশী', ও 'শেষরক্ষা',। নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী'র প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ, শনিবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। এই সময় থেকেই নাট্যমন্দিরে প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। এতদিন পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন করে অভিনয় হোয়ে আসছিল, শনি ও রবিবার। এখন থেকে মধ্যসাপ্তাহিক অভিনয় প্রবর্তিত হয়। 'ষোড়শী'র ভূমিকালিপি এই রকম ছিল :

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
এককড়ি—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য (পরে অমিতাভ বসু)
তারাদাস—শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
জনার্দন—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সাগর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নির্মল—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী (পরে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী)
ষোড়শী—শ্রীমতি চারুশীলা

'ষোড়শী'র বিজ্ঞাপনেও বেশ অভিনবত্ব ছিল। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল :

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান
নূতন সামাজিক নাটক
ষোড়শী

ষোড়শী ভৈরবী গড়চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা সন্ন্যাসিনী। অস্ফুটন্ত কোরকটির মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, স্বামীর প্রাণের

গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোনো আঘাত দেয় নি—সেই সময়ে এক অর্ধরাত্রির স্তিমিত আলোকে তন্দ্রাতুরা চোখে সে দেখেছিল শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—সে রাত প্রভাত হোল না—তার আগেই জীবনের খরস্রোতে কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠল পঙ্কের স্পর্শ থেকে উর্ধ্বে—শুভ্র পঙ্কজের মত। দুজনে দেখা হোল। এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই 'ষোড়শী' নাটক।

বলেছি, 'ষোড়শী' বাংলা থিয়েটারে একটা মস্ত বড়ো দিক্-পরিবর্তন। পুরাণের কথকতা আর ইতিহাসের বীরত্ব, এই নিয়ে বাংলা থিয়েটার দীর্ঘদিন চালিয়ে এসেছে। গিরিশযুগে সামাজিক নাটকাভিনয়ের সবেমাত্র সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা রঙ্গমঞ্চে পুরাণ আর ইতিহাসেরই আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। শিশিরকুমার তো নিজেই সেই ধারার অনুবর্তন করেছেন এতকাল। এবার যেন তিনি অনুভব করলেন যে, নাট্যসাহিত্য তথা রঙ্গমঞ্চে বাঙালির বর্তমান সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হওয়া উচিত। সামাজিক নাটকের অভাবও ছিল এই সময়। বাংলা সাহিত্যে তখন নাম করবার মত পাঁচ-ছ'খানার বেশি সামাজিক নাটক ছিল না। যা ছিল তার মধ্যে এখনকার সমাজ-জীবনের ছবি কোথায়? রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটক ছিল তা থিয়েটারের জন্য লেখা নয়—সেগুলো নিছক নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি। এই সময়ে নাটকের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে অনেকেরই মন পুলকিত হোয়ে উঠল। তাই ষোড়শীকে দেখে এযুগের দর্শকরা যেন সেদিন সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এ যে মনের কথা—এ যে মর্মের ছবি। বিপুল জনতার মধ্যে নাট্যমন্দিরে ষোড়শীর উদ্বোধন এবং একবাক্যে তার প্রশংসা এই কথাটাই সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, নাট্যমন্দিরে এর চেয়ে ভাল নাটকের অভিনয় আর হয় নি। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রথম গৌরব যেমন আর্ট থিয়েটারের, তেমনি শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করবার সৌভাগ্য নাট্যমন্দিরের। শিশিরকুমারের আগে শরৎচন্দ্রের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করার কথা কেউ

চিন্তা করে নি, বা চিন্তা করার সাহস পায় নি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা ঔপন্যাসিক বাঙালির প্রিয়তম লেখক। মঞ্চের ওপর যদি তাঁর চিন্তার প্রভাব পড়ে তা'হলে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সুনিশ্চিত। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশিরকুমারের এই ধারণা খুবই prophetic বা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়েছিল। শরৎ-শিশির প্রতিভার সম্মেলন বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের পক্ষে যথার্থই শুভ হয়েছিল।

একদা মঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ একাধিক মঞ্চে অভিনীত হয়ে যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা গেল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। নাট্যমন্দিরে "ষোড়শী' নাটকের অভিনয় হবার পরবর্তী একযুগ তো থিয়েটারে শরৎ-নাটকের যুগ। বোধ হয় তাঁর প্রসিদ্ধ কোনো উপন্যাসই আর মঞ্চস্থ হোতে বাকী নেই; এমন কি উপন্যাসগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্পগুলিও বাদ যায় নি। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি শিশিরকুমারই মঞ্চস্থ করেছিলেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের নাটকের উপস্থাপনায় ও অভিনয়ে তিনিই অদ্বিতীয়—যেমন তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তিতে। শিশিরকুমার সর্বসমেত ছয়খানি শরৎ-নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন; সেগুলি মধ্যে তিনখানির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ, যথা—ষোড়শী, বিজয়া ও বিপ্রদাস। আবার এই তিনটির মধ্যে ষোড়শী অতুলনীয়—কি অভিনয়ে, কি প্রয়োগ-নৈপুণ্যে, কি এর সামগ্রিক আবেদনে। এর কারণ শরৎচন্দ্রের আর সব নাটক তাঁর উপন্যাসেরই নাট্যরূপ আর 'ষোড়শী' তাঁর independent drama—'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ নয়।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় শরৎচন্দ্রের আগে রবীন্দ্রনাথের নাটক এসে গিয়েছে। তাই 'ষোড়শী' নাটকখানি সম্পর্কে (তাঁর প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসাবে) শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী' নাটক সম্পর্কে একপত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন: "তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক

সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে।…ষোড়শীতে তুমি উপস্থিতকালকে খুশি করতে চেয়েছ, এবং এর দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।…যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিককালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।" এই চিঠির তারিখ ২রা ফাল্গুন ১৩৩৪, অর্থাৎ নাট্যমন্দিরে অভিনীত হবার ছ'মাস পরে। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬)।

ষোড়শী মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার প্রথমে একটু হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ এর প্রথম পনর রাত্রি দর্শক-সমাগম হয় নি বললেই চলে, অবশ্য বিরুদ্ধদলের প্রচারকার্যের কিছুটা হাত ছিল এই ব্যাপারে। কিন্তু বাঙালি দর্শকের রুচির মোড় এই ক'বছরে শিশিরকুমার যে রকম ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে করে ষোড়শীর ভবিষৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। কার্যক্ষেত্রে তাই-ই দেখা গেল। শরৎচন্দ্রের নাটক, শিশিরকুমারের অভিনয়, শরৎচন্দ্রের কথা, শিশিরকুমারের কণ্ঠে তার বাণীরূপ শতবর্ণে বিচ্ছুরিত হোত মঞ্চে—রসের এমন বিচিত্র স্বাদ মঞ্চে বাঙালি এর আগে আর কোনোদিন পায় নি। তাই পনর রাত্রির পর থেকেই দেখা গেলো মঞ্চে ষোড়শীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ষোড়শীর ৪১তম অভিনয় হয় ২রা পৌষ, ১৩৩৪। এই দিনের বিক্রীত অর্থ "সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হইবে" বলে বিজ্ঞাপিত হয়। শনিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ (ইং ২১ জানুয়ারি, ১৯২৮) ষোড়শী নাটকের অর্ধশততম মহোৎসব রজনী ঘোষিত হয়। এর চারদিন পরেই নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের প্রথম পুনরভিনয় হয়। করুণাময়ের ভূমিকায় শিশিরকুমার অবতীর্ণ হন। ষোড়শী মঞ্চস্থ করার মাসাধিক কাল পরে এর সঙ্গে 'শেষরক্ষা' জুড়ে দেওয়া হয়। ষোড়শী ও শেষরক্ষা একই দিনে একসঙ্গে অভিনীত হোত। মঞ্চে যুগপৎ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাটকের অভিনয় বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম এবং

দর্শকদের কাছে এই বিচিত্র যোগাযোগ খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সত্যই বলেছেন—"ষোড়শী ও শেষরক্ষা দর্শকবৃন্দকে একেবারে অবাক করিয়া রাখিত। শেষরক্ষায় শিশিরকুমারের চন্দ্রের ভূমিকা তাঁর নটজীবনের একটি আশ্চর্য সাবলীল অভিনয়ের নিদর্শন হয়ে আছে। কবি বিনোদের ভূমিকায় রবিরায় ও ক্ষান্তর ভূমিকায় চারুশীলার অভিনয়ও সুন্দর হোতো।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের চিরকুমারসভা, শেষরক্ষা, বৈকুণ্ঠের খাতা ইত্যাদি কৌতুকনাট্যগুলিই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর প্রধান কারণ এগুলো মোলেয়ারের ভঙ্গিতে লেখা হাল্কাধরণের সিচুয়েশনাল (situational) কমেডি এবং এই জাতীয় নাটকের অভিনয়ের মধ্যে তেমন জটিলতা বা সূক্ষ্মতা থাকে না। কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাটকগুলি পাবলিক স্টেজে তেমন সফলতা লাভ করে নি। না করার কারণ এগুলি ঠিকমত অভিনয় করতে পারে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী পেশাদার থিয়েটারে সেদিন বিরল ছিল,—আজো আছে। তাই দেখা যায় যে রবীন্দ্র-নাটককে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার ব্যর্থকাম হন।

এই বছর (১৩৩৪) নাট্যমন্দিরে নবপর্যায়ে 'প্রফুল্ল', 'সধবার একাদশী', 'সাজাহান' ও 'বলিদান' এই চারখানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন হয়। প্রফুল্ল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, সধবার একাদশী ১১ই শ্রাবণ, সাজাহান ৭ই অগ্রহায়ণ এবং বলিদান ১১ই মাঘ নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। নাট্যমন্দিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐ সময়ে ষ্টার থিয়েটারও দানিবাবুকে নিয়ে প্রফুল্ল নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করে-ছিলেন। কিন্তু তুলনায় নাট্যমন্দিরেই এই নাটকের অভিনয় বেশি জমে-ছিল। শিশিরকুমারের যোগেশ হয়েছিল অসাধারণ। নাট্যমন্দিরে 'প্রফুল্ল'র প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল: যোগেশ—শিশিরকুমার; রমেশ—অমিতাভ বসু; সুরেশ—শৈলেন চৌধুরী; যাদব—শ্রীমতি প্রমীলা; মদন ঘোষ—যোগেশ চৌধুরী; পীতাম্বর—শীতলচন্দ্র পাল; কাঙালীচরণ—হীরালাল দত্ত; শিবনাথ—ধীরেন্দ্রনাথ দাস; ভজহরি—গোপাল ভট্টাচার্য;

জ্ঞানদা—চারুশীলা ; উমাসুন্দরী—কৃষ্ণভামিনী ; প্রফুল্ল—প্রভা ; জগমণি—সুশীলা। পরবর্তীকালে নব-নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গমেও এই নাটকগুলির পুনরভিনয়ের আয়োজন শিশিরকুমার করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর swan song বা শেষ অভিনয়ও 'প্রফুল্ল'। দানিবাবুর সঙ্গেও তিনি এই নাটকে একাধিকবার অভিনয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বলতেন—"দানিবাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যতবার করেছি, understanding ছিল যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করব না।" দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের প্রতি শিশিরকুমারের দৃষ্টি এই প্রথম পড়ল। নাট্যমন্দিরে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল :—নিমচাঁদ—শিশিরকুমার ; রামমাণিক্য—মনোরঞ্জন ; কেনারাম—যোগেশচন্দ্র ; অটল—শৈলেন চৌধুরী ; কুমুদিনী—প্রভা ; সৌদামিনী—ঊষা। গিন্নি—হরিসুন্দরী আর কাঞ্চন—চারুশীলা। এ ছাড়া এই বছরেও 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের পুনরভিনয় নাট্যমন্দিরে কিছুকাল চলতে থাকে। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য সাবেক কালের একখানি খুব নাম-করা নাটক ; অনেক আশা নিয়েই এই নাটকখানির পুনরভিনয়ের আয়োজন হয় (১৩৩৩ চৈত্র) নাট্যমন্দিরে, কিন্তু দশ রাত্রির বেশি চলে নি ; না চলবার কারণ বোধ হয় এ নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমারের অনুপস্থিতি। তাঁর অসুস্থতার সময়েই এই নাটকখানি খোলা হয়েছিল। শিশিরকুমার ভিন্ন নাট্যমন্দিরের আর সকলই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলন। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকালিপি এইরকম ছিল :—বিক্রমাদিত্য—গোপাল ভট্টাচার্য ; প্রতাপ—রবি রায় ; বসন্ত রায়—অমলেন্দু লাহিড়ী ; গোবিন্দ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ; ভবানন্দ—হীরালাল দত্ত, শঙ্কর—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ; সূর্যকান্ত—শৈলেন চৌধুরী ; সুন্দর—অমিতাভ বসু ; গোবিন্দদাস—শীতল পাল ; ইসার্খা—যোগেশ চৌধুরী ; মানসিংহ—রামময় চক্রবর্তী, রডা—ভূমেন রায় ; কাত্যায়নী—সরলা ; ইন্দুমতী—শেফালিকা ; ছোটরাণী—হরিসুন্দরী ; কল্যাণী—প্রভা ও বিজয়া—কৃষ্ণভামিনী।

নাট্যমন্দিরে 'শেষরক্ষা'-র প্রথম অভিনয় এই বছরেরই ঘটনা। শিশিরকুমারের প্রয়োগ-প্রতিভার নূতন পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই নাটক-

খানিতে। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারের মধ্যে তিনি কিভাবে ব্যবধান উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেনঃ "শেষরক্ষার একটি দৃশ্যের একটি অভিনব পরিকল্পনার কথা একদিন শিশিরকুমার আমাকে বললেন। তাঁর অনুরোধ মতো আমি পাঁচ-ছয়জন গায়ক বন্ধু সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে গেলাম। শেষরক্ষার গানের রিহার্স্যাল চলছে তখন। শিক্ষক স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিশিরকুমারের নির্দেশ মতো দিনুবাবু আমাদের এই নবাগত গায়কের দলকে রবীন্দ্রনাথের 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি শিখিয়ে দিলেন। শেষরক্ষার প্রথম অভিনয়-রজনীতে রঙ্গমঞ্চের মাঝখান থেকে একটি সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে প্রেক্ষামণ্ডপের সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হয়েছে। সিঁড়িটা লাল সালু দিয়ে মোড়া এবং প্রেক্ষা-মণ্ডপের মধ্য পথটিতেও আগাগোড়া লাল সালু পাতা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কোনো সম্মাননীয় অতিথি বাইরে থেকে এই লাল সালু-পথের ওপর দিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু তা নয়। অভিনয় আরম্ভ হোল। শিশিরবাবুর পরামর্শ মতো আমরা গায়কের দলের এক-একজন বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত প্রেক্ষামণ্ডপটির নানা স্থানে এক-একটি আসনে বসে গেলাম। শেষ দৃশ্য। গদাই-এর বিবাহ-রজনী। শিশিরকুমার চন্দ্রবাবুরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। এই দৃশ্যে চন্দ্রদারূপী শিশিরকুমার একগাদা কাগজ হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সেই সালু-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রেক্ষমণ্ডপে নেমে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্যমূলক আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন। দর্শকরা যেন এই শুভবিবাহের নিমন্ত্রিত অতিথি। সেই আপ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বাণ্ডিল থেকে প্রীতি-উপহার বিতরণ করলেন দর্শকদের। প্রীতি-উপহারে ছাপা রয়েছে ঐ 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি। রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আপন-আপন অংশ অভিনয় করে চলেছেন। ক্রমে গানটি গাইবার সময় এলো। রঙ্গ-মঞ্চের নট-নটীরা গানের প্রথম লাইনটি একটিবার গাইবার পর দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তির সময় চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন আমরা সমস্বরে প্রেক্ষামণ্ডপ থেকেই যোগ দিলাম রঙ্গমঞ্চের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে। কেবল আমরাই নই—দর্শক সাধারণের ভিতর থেকেও বহুলোক কণ্ঠ সাযোগ করলেন আমাদের সঙ্গে।

সমবেত কণ্ঠে সে এক অপূর্ব কোরাস গান। শিশিরকুমার আবার নেমে এলেন প্রেক্ষামণ্ডপে। এসেই 'আসুন আসুন উপরে আসুন' বলে বেছে বেছে আমাদের এই গায়কের দলটিকে মঞ্চের উপরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। আবার আরম্ভ হোল সমবেত কণ্ঠের গান।"

নাট্যমন্দিরের প্রোগ্রাম থেকে জানা যায় যে সম্প্রদায় এই বছরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ফাল্গুন মাস (ইং ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮) থেকে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করতে চলে যান এবং ২৬শে মে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৫) কলকাতার মঞ্চে তাঁদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। ১৩৩৪ সালটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য। এই বছরের আষাঢ় মাসে তাঁর মৃত্যু হয়—মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চৌষট্টি বছরও পূর্ণ হয় নি। তাঁর মৃত্যুতে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নাট্যমন্দিরের অভিনয় একদিন বন্ধ থাকে।

গিরিশচন্দ্রের পর ক্ষীরোদপ্রসাদই একমাত্র নাট্যকার যাঁর প্রতিভার আলোয় মধ্যযুগের বাংলা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় তাঁর 'আলিবাবা' গীতিনাট্য সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। অতুলনীয় এবং চির নূতন এই গীতিনাট্যখানি। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের এম. এ. ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপকের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিদ্যামন্দিরের আচার্যের আসন ছেড়ে নাট্যশালার তন্ত্রধার হয়েছিলেন। তাঁর নাটকাবলী বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ। তাঁর চাঁদবিবি, প্রতাপাদিত্য, মহারাজা নন্দকুমার প্রভৃতি একাধিক নাটক দেশাত্মবোধ প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেছে। নাটকের মধ্যে তিনি যে ভাষার প্রচলন করে গেছেন তা কাব্যের চেয়ে মধুর, সঙ্গীতের মতোই শ্রবণ সুখকর। তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল যেটা গিরিশচন্দ্রের গৌরবের

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিশির-কুমারের একজন বিশেষ অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। শিশিরকুমারের বিশেষ অনুরোধে তিনি 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখে দিয়েছিলেন এবং ১৩৩৫ সালে এই নাটকখানি নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'দেবী চন্দ্রগুপ্তে'র পাণ্ডুলিপিখানি হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার বলতেন, "একখানা ভাল নাটক হারিয়েছি জীবনে।" এই বছরে নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পুনর-ভিনয় হয়। এই মঞ্চে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ, মঙ্গলবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার আর কৃষ্ণভামিনী পাগলিনীর অংশে। শিশিরকুমারের বিল্বমঙ্গল সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকায় এইভাবে মন্তব্য করা হয়েছিল: "বাংলা রঙ্গমঞ্চ যে যুগে ধর্মভাবের মর্ম প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে সেই যুগের একখানি নাটক। আজ পর্যন্ত বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় বাংলার অধিকাংশ বিখ্যাত নটই অভিনই করেছেন—তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল মিত্রের অভিনয়ই অতুলনীয় হয়ে আছে। শিশিরকুমার অদ্যাবধি প্রায় সকল শ্রেণীর ভূমি-কাতেই কল্পনাতীত কৃতিত্ব দেখিয়ে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে বিল্বমঙ্গলজাতীয় ধর্মভাবপ্রধান ভূমিকায় এই হোল তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ। তাঁর অভিনয় সকলকেই মোহিত করল, তাঁর সাফল্য সকলকেই বিস্মিত করল।" এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের একটি উক্তি উল্লেখ্য। কথিত আছে, প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনয়ান্তে তিনি তৎকালীন কোনো একটি পত্রিকার সম্পাদককে বলেছিলেন: "হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। তবু যে আমার অভিনয় আপনাদের এত ভাল লাগবে, আমি তা ভাবতেও পারি নি। কিন্তু আজকের অভিনয় দেখে আপনারা সমালোচনা প্রকাশ না করলেই খুশি হব। কারণ আজকে অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পাই নি। আমার মনে বিল্বমঙ্গলের যে ধ্যানমূর্তি বিরাজ আছে, এর পরের অভিনয়েই আমি তা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব বলে আশা রাখি।"

১৩৩৪ সালে পুরাতন নাটকের মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'ভ্রমর' (কৃষ্ণকান্তের

টইল)-এর পুনরভিনয় হয়। ভ্রমরে শিশিরকুমার গোবিন্দলালের ভূমিকা অভিনয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নাটক কিন্তু নবযুগে খুব বেশি চলেনি।

এই বছরের প্রথমভাগেই বাংলা রঙ্গজগতে প্রতিভাময়ী শিক্ষিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহুর আবির্ভাব ঘটে। ১৩৩৫-এর আষাঢ় মাসেই শহরের রাস্তার মোড়ে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা এক প্রাচীরপত্রে দেখা গেল—"ষ্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু, বি. এ."। এঁকে নিয়ে গোড়াতেই ষ্টার ও নাট্যমন্দিরের মধ্যে একটি মামলার সূত্রপাত হয়। শেষপর্যন্ত আপোষে মামলা মিটে যায় এবং কঙ্কাবতী নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃ-গোষ্ঠীভুক্ত হন। এই বছরে নাট্যমন্দিরের নূতন নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল 'শেষরক্ষা', ও 'দিগ্বিজয়ী'। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানির নাম পরিবর্তন করে 'শেষরক্ষা' নাম দিয়ে অভিনয় করা হয়, এ-কথা আগেই বলেছি। আমূল পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের গুণে কবির হস্তে এই নাটকখানি সম্পূর্ণ নূতন আকার লাভ করে এবং এর মধ্যে ছ'খানি নূতন গান সংযোজিত হয়। এই নাটক প্রসঙ্গে কবির সঙ্গে শিশিরকুমারের বহু আলোচনা হয়েছিল। 'শেষরক্ষা' নামটি কবিরই দেওয়া। 'শেষরক্ষা' নাট্যমন্দিরের সাফল্যমণ্ডিত নাটকগুলির অন্যতম। এই বছরের অগ্রহায়ণে শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীর নূতন ঐতিহাসিক নাটক 'দিগ্বিজয়ী' মঞ্চস্থ করেন। দিগ্বিজয়ীর প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল:

নাদিরশাহ—শিশিরকুমার
সালেবেগ—বিশ্বনাথ
আলি আকবর—যোগেশ চৌধুরী
আমেদ খাঁ—জীবন গাঙ্গুলী
রহমৎ খাঁ—রবি রায়
রেজাকুলি—শৈলেন চৌধুরী
আসফজা—রামময় চক্রবর্তী
সাদৎ আলি—শীতল পাল
মির্জা মেহেদী—অমলেন্দু লাহিড়ী

নেককদম—নৃপেশ রায়
সিতারা—কৃষ্ণভামিনী
সিরাজী বেগম—চারুশীলা

এই নাটকে সুর সংযোজনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। 'দিগ্বিজয়ী' শিশিরকুমারে অভিনয়-প্রতিভার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বাংলা থিয়েটারের নবযুগে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই নাটকের production হয়েছিল অসাধারণ। এবং এর মূলে ছিল আলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ। সীতা থেকে দিগ্বিজয়ী পর্যন্ত শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের যদি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা স্তরে স্তরে অভিনবত্বের সৃষ্টি করে চলেছে। 'নাচঘর' পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল: "দিগ্বিজয়ী নাটকের অভিনয় দেখার পর দর্শকদের এই ধারণা বদ্ধমূল হোল যে নট-নটীদের ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা নয়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নাট্যমন্দিরের ভিতরে এমন একটি সুরুচিসঙ্গত ও কলাসম্মত পারিপার্শ্বিক সৃষ্ট হয় যার তুলনা অন্য কোন রঙ্গালয়ে পাওয়া অসম্ভব।···নাট্যমন্দিরের প্রকৃত গৌরব, বিশেষত্ব ও অতুলনীয়তাই হচ্ছে এইখানে এবং এই গুণেই সে শিক্ষিত সমাজকে এত বেশি আকৃষ্ট করে। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রয়োগকর্তা ভিন্ন—যাঁর রুচি আছে, রসবোধ আছে, culture আছে—এই জিনিস সৃষ্টি করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দিগ্বিজয়ী মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার আর একবার প্রমাণ করলেন যে বাংলা থিয়েটারে প্রয়োগকর্তা হিসাবে তিনি অতুলনীয়।" সেইসঙ্গে যোগেশচন্দ্রও প্রমাণ করেন যে তিনি একজন প্রতিভাবান নাট্যকার। 'দিগ্বিজয়ীর' তুলনায় 'সীতা' দুর্বল ও অপরিণত নাটক। শ্রীমতী কঙ্কাবতী এই নাটকেই পরে (মাঘ মাস থেকে) 'ভারতনারী'র ভূমিকায় মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়ে (১৩৩৫-৩৬) নাট্যমন্দিরের চারজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সমবেশ হয়—প্রভা, কঙ্কা, কৃষ্ণভামিনী ও চারুশীলা।

এই বছরটি নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে শিশিরকুমার ও দানিবাবুর সম্মিলিত অভিনয়ের জন্য।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "১৯২৮, ৩রা অক্টোবর নাট্য-ইতিহাসের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। গিরিশ-স্মৃতি সমিতির গিরিশ মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠার জন্য টাকার প্রয়োজন হইল। গিরিশ পার্কেই মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। যুক্ত অভিনয়ে টাকা তোলা হইল। এই অভিনয়েই প্রায় চার হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। টিকিটের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কত দর্শক দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিয়াছে। দানিবাবু ও শিশিরবাবু হন যথাক্রমে যোগেশ ও রমেশ; নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভজহরি, তারাসুন্দরী মোক্ষদাসুন্দরী, জ্ঞানদা কুসুমকুমারী, প্রফুল্ল প্রভা।...সে রাত্রে দর্শক বিস্ময়ান্বিত হইয়া উভয়ের কৃতিত্ব পরীক্ষা করিল। সে রাত্রি দানিবাবু অভিনয়ে এমন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন যে রমেশের ভূমিকায় শিশির-কুমারও অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় করিলেও সকলে জয়মাল্য তাঁহারই গলে অর্পণ করিল। দুই-একস্থানে শিশিরকুমার করতালি লাভ করেন।"

দিগ্বিজয়ীর আগে নাট্যমন্দিরে এই বছরে বরদাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন গীতিনাট্য 'হাস্‌নো হানা' মঞ্চস্থ হয়। এর প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ বুধবার ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৫ (ইং ২২শে আগষ্ট, ১৯২৮)। হাস্‌নো হানার ভূমিকালিপি এইরকম ছিল: যশোবর্ধন বিশ্বনাথ, মিকাডো অমলেন্দু লাহিড়ী, নটবর চারুশীলা; হাস্‌নোহানা কৃষ্ণভামিনী; য়্যামাডো উষা (পটল)। নাট্যমন্দিরে ইহাই নূতন দ্বিতীয় গীতিনাট্য; প্রথম গীতি-নাট্য ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রাধাকৃষ্ণ'। বাংলা থিয়েটারের ট্র্যাডিসনই এই যে, সিরীয়াস নাটকের সঙ্গে সব সময়েই একটি করে গীতিনাট্যের প্রয়োজন হয়েছে। নাচ গান ভিন্ন বাঙালি দর্শক কোনো দিনই খুশি নয়। এই বছর পূজোর সময় যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকৃত 'মৃণালিনী' মঞ্চস্থ হবার কথা হয়। এই মৃণালিনীতে পশুপতির ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা, শিশিরকুমারের ইচ্ছা ছিল তিনিও ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নানা কারণে এই পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

১৩৩৫ সালের শেষভাগে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু নাট্য-মন্দির তথা শিশিরকুমারের জীবনে একটি গভীর শোকাবহ ঘটনা। প্রতি

বৎসর দোলপূর্ণিমার দিন নাট্যমন্দিরে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। দোলপূর্ণিমায় নাট্যমন্দিরের জন্ম—সে বসন্তের উপহার। এ-বছর উৎসবের আগেই মণিলালের মৃত্যু হয়। নাট্যমন্দিরের এ-বছরের উৎসবটি তাই ছিল কিঞ্চিৎ শোক-ম্লান। এই পাঁচ বছরের মধ্যে মারা গেছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী, মণিলাল, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও মালিনী। "এবার উৎসবের আনন্দ আসরে মণিলালের কথা শিশির-কুমারের বারবার মনে পড়ছিল। তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্ত আজ অশান্ত। মনের আবেগে দর্শকদের সামনে বেরিয়ে এসে তিনি মণিলালের বহুমুখী শক্তির কাহিনী বর্ণনা করলেন।' আন্তরিকতায় হৃদ্য সেই বক্তৃতা সেদিন সবাইকে অভিভূত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় ও নাট্য-শালার সম্বন্ধে শিশিরকুমার যে আলোচনা করেছিলেন তার ভেতরেও তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা, রসবোধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্ববিশ্রুতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এলেন টেরির মৃত্যু এই বৎসরের (জুলাই, ১৯২৮) রঙ্গজগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা। আশি বছর বয়সে এলেন টেরির মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডের লাইসিয়ম থিয়েটারের যা কিছু গৌরব তা এঁরই জন্য। প্রতিভা ও সৌন্দর্যের দুর্লভ সমাবেশ পৃথিবীতে আর কোনো অভিনেত্রীর জীবনে দেখা যায় নি, যেমন দেখা গিয়েছিল এলেন টেরির মধ্যে। শিশিরকুমার বলতেন, মাত্র একজন অভিনেত্রীর প্রতিভায় একটা থিয়েটার যে চলতে পারে তার দৃষ্টান্ত লাইসিয়ম থিয়েটার ও এলেন টেরি।

নূতন বাংলা বৎসর ১৩৩৬ সালও নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে 'দিগ্বিজয়ী'র ৎসর বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাঁচ-ছ মাসের মধ্যেই নাটকখানি মসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বছরের ৮ই বৈশাখ দিগ্বিজয়ীর ৪০তম াত্রির ভূমিকালিপিতে দেখা যায় ভারতনারী, সিরাজীবেগম ও সিতারার ূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন কঙ্কাবতী, প্রভা ও কৃষ্ণভামিনী—ঁরাই ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। ১৩৩৬ (ইং ১৯২৯) সালে াট্যমন্দিরের নূতন নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রবীন্দ্রনাথের

'তপতী', শরৎচন্দ্রের 'রমা', কৌতুকনাট্য 'হারানো রতন' এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খধ্বনি'। 'তপতী' নাটকের জন্য শিশিরকুমার অজস্র খরচ করেছিলেন, এই নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব, তবু এ-নাটক জমে নি। তপতী অভিনয় করে তিনি কবির খুব প্রশংসা লাভ করেছিলেন, কিন্তু টাকা পান নি ; তবু তার জন্য শিশিরকুমারের মনে কোনো দুঃখ ছিল না। তপতীর তুলনায় শরৎচন্দ্রের 'রমা' (পল্লীসমাজের নাট্যরূপ) খুব সফলতা অর্জন করেছিল। রমার ভূমিকালিপি এইরূপ ছিল :

রমেশ — শিশিরকুমার
বেণী — কুমার কনকনারায়ণ
গোবিন্দ — যোগেশ চৌধুরী
ধর্মদাস — অমলেন্দু লাহিড়ী
আকবর সর্দার — জীবন গাঙ্গুলী
রমা — শ্রীমতী প্রভা
বিশ্বেশ্বরী — শ্রীমতী কঙ্কা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্ট থিয়েটারই প্রথমে পল্লী-সমাজের অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করেন এবং ষ্টারে যখন এই নাটকের অভিনয় ব্যর্থ হোল, তখন তাঁরা সে-নাটক 'অচল' বলে শরৎচন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী বলেন,"তারপর একদিন শরৎদা' ছাতা ও খাতা বগলে নিয়ে শিশিরের কাছে এসে বললেন, শিশির, এ-বই আমি তোমাকেই দিলাম। আমি টাকা চাই না, তুমি শুধু একবার ওদের দেখিয়ে দাও যে এ-নাটক অচল নয়।" ষ্টারে রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করতেন অহীন্দ্র চৌধুরী, আকবর সর্দারের ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বরী তারাসুন্দরী আর রমা কৃষ্ণভামিনী। শিশিরকুমারের হাতে 'পল্লীসমাজ' যথার্থই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। 'রমেশ'-এর ভূমিকা অভিনয় করে শিশিরকুমার আর একবার প্রমাণ করলেন যে, শরৎচন্দ্রের নাটকের সূক্ষ্ম ভাবাবেগকে মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে তিনি অপরাজেয়। 'শঙ্খধ্বনি' স্যার হেনরি আরভিং কর্তৃক প্রযোজিত এবং অভিনীত *The Bells* নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৬ই কার্তিক, শনিবার, ১৩৩৬।

'শঙ্খধ্বনি'-তে নায়ক কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়—বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে কেতনলালের অভিনয় অবিস্মরণীয়।

এই বছরে শিশিরকুমার আর একটি পৌরাণিক নাটক—ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'ভীষ্ম' মঞ্চস্থ করেন। 'ভীষ্ম' নাট্যমন্দিরের আর একটি অসার্থক প্রয়াস। 'দিগ্বিজয়ী'-র সাফল্য দেখে শিশিরকুমার এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' মঞ্চস্থ করবার অভিপ্রায় করেছিলেন; কিন্তু প্রধান অভাব ছিল নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন এমন একজন অভিনেত্রীর। তা'ছাড়া নাট্যমন্দিরের শেষের দিকে তাঁর কিছু আর্থিক অসচ্ছলতাও দেখা দিয়েছিল। এইসব কারণে 'নূরজাহান' আর মঞ্চস্থ হয় নি। বাংলা থিয়েটারে আজ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের এই সুন্দর নাটকখানির অভিনয় হয় নি।

নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে এই সময়ে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা গিরিশ-স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান। ১৩৩৫-এর ৫ই চৈত্র, শিশিরকুমার তাঁর থিয়েটারে নটগুরুর স্মৃতিপূজার যে আয়োজন করেছিলেন তাতে বাংলার বহু মনীষি ব্যক্তি, খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট অভিনেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন; সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। সেদিন গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা, বিশেষ করে বাংলা থিয়েটারের সংগঠনে তার দান সম্পর্কে শিশিরকুমার একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন।

নাট্যমন্দিরের বিভিন্ন নাট্যপ্রয়াসের এই হোল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরপর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শিশিরকুমার 'সীতা' অভিনয়ের জন্য আমেরিকায় আমন্ত্রিত হন। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শিশিরকুমারের এই উদ্যম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। সে কাহিনী যথাস্থানে বলব। প্রসঙ্গতঃ বাংলা থিয়েটার জগতের এই সময়কার একটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে রসরাজ অমৃতলাল বসুর মৃত্যু হোল। নটকুলের এই বৃদ্ধ পিতামহ গিরিশযুগের অবসান এবং শিশিরযুগের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় গিরিশ-চন্দ্রের পর অমৃতলাল বসুর নামই উল্লেখযোগ্য। সুদক্ষ নট এবং যশস্বী নাট্যকার অমৃতলালই বলেছিলেন, "এ যুগে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

এড়ানো যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি অভিনয়ে শিশিরকুমারের প্রভাব অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিভাষানদের ইহাই বৈশিষ্ট্য।” আমরা দেখতে পেলাম যে তাঁর নটজীবনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ নাট্যমন্দিরের অবলুপ্তিকাল পর্যন্ত, শিশিরকুমার অভিনয়ের জন্য যেসব নাটক নির্বাচন করেছিলেন তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, “তিনি প্রবহমান নাট্যধারাকে খরস্রোতা করতে চেয়েছেন। নূতন খাতে তাকে বাইরে দিতে চান নি।” দেখা যায় যে তাঁর আত্মপ্রকাশের এই বর্ণবহুল যুগে তিনি নূতন কোনো নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই সময়ে তাঁর সহচরদের মধ্যে শক্তিশালী নাট্যকার অন্ততঃ আরো দুজন ছিলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এঁদের প্রতিভাকে তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্নকালে শিশিরকুমার যদি কাজে লাগাতে পারতেন, তা'হোলে তাঁর পক্ষে ভালই হোত। যখন করতে চাইলেন, তখন শিশিরকুমার জীবনসায়াহ্নে উপনীত, জাহান্দরের ভূমিকা অভিনয়ের বয়স তখন তাঁর আর ছিল না। তবু করতে হয়েছিল নিতান্ত বাধ্য হয়েই। নাট্যমন্দিরের যুগে তিনি এক মাইকেল বাদে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকই অভিনয় করেছেন। প্রহসনে যিনি আজো অপ্রতিরথ, খাঁটি বাংলা নাটকের যিনি জন্মদাতা এবং স্বয়ং শিশিরকুমার যাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পর্যন্ত দিয়েছেন, সেই মাইকেলের কোনো নাটক কেন যে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত করলেন না, এটা বিস্ময়ের বিষয়। বেলগাছিয়া থিয়েটারের বাইরে বাংলা পেশাদার থিয়েটারে মাইকেলের নাটক বা প্রহসনের অভিনয় বিরল বললেই হয়। এ বিষয়টি ভেবে দেখবার মতন। তবু শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরের প্রয়াস বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে বৃথা হয় নি। ‘ষোড়শী’ নাটকের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎ-প্রতিভার সংযোগ সাধনে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব চিরদিনই স্বীকৃত হবে। নাট্যমন্দিরের ফলশ্রুতি এই।

॥ ১০ ॥ শিশিরকুমারের সংবর্ধনা ॥

গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ নাট্যশালার অভিনেতারা এদেশে অপাঙক্তেয় হয়ে এসেছেন দেখা যয়ে। তাই বুঝি বহু দুঃখেই একদা নটগুরু বলেছিলেন: "লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন।" এর একটা কারণ ছিল। তাঁরা নটীদের সঙ্গে অভিনয় করতেন। সমাজে তখন অভিনেতাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁরা নিমন্ত্রিতও হতেন না; এমন কি শোনা যায় যে, গিরিশযুগে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে আলাপ পরিচয় রাখা অনেকেই লজ্জার ও নিন্দনীয় বলে মনে করতেন। তবু এ-কথা আজ ভাবতে গৌরব বোধ করি যে, এই সামাজিক উপেক্ষা অবহেলা ও অনাদর বহন করেই, আমাদের দেশে গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসী শিল্পী নিজেদের সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এদেশে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে গিয়েছেন। শিক্ষিত বাঙালি এঁদের প্রাপ্য মর্যাদা সেদিন দেয় নি। শিশিরযুগে নটকুলের পিতামহ হিসাবে জীবিত ছিলেন একমাত্র রসরাজ অমৃতলাল বসু। সৌভাগ্যবশতঃ তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে, নবীন যুগের নটগুরু শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে, শিক্ষিত নাট্যামোদী দর্শকগণের মনে দেখা দিয়েছে এক নতুন চেতনা। এরই একটা প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যখন ১৩৩৩ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বৃদ্ধ অমৃতলালকে অভিনন্দিত করলেন। বলা বাহুল্য, বিদগ্ধ অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম. এ. যেদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে একটা আদর্শ নিয়ে যোগদান করলেন সেদিন থেকে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে রঙ্গালয়ের যোগাযোগ সহজ হয়ে উঠল, দেশের মনীষিরা রঙ্গালয়ের প্রতি হয়ে উঠলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। নটের বৃত্তিকে তাঁরা আর নিন্দনীয় বলে মনে করলেন না। অভিনেতার গুণ-গৌরবে তাঁরা ক্রমে গর্ব অনুভব করতে শিখলেন। নাট্যামোদী দর্শক-মানসের এই পরিবর্তনের জন্য যা কিছু কৃতিত্ব তা শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য।

শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রথম, মধ্য কিম্বা শেষভাগে না কলিকাতা পৌরসভা, না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা না বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, তাঁকে অভিনন্দিত করার কথা বিবেচনা করেন নি। এ ত্রুটি অমার্জনীয়। শুধু তাই নয়। তিনি জীবিত থাকতে তাঁকে বাদ দিয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীকে 'গিরিশ লেকচারার' করা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার বলে সেদিন অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন। এমন কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাঁদের সম্মানিত ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সে-তালিকাতেও শিশিরকুমারের নাম ছিল না। তাই মনে হয় শিশিরকুমারের প্রতিভার যোগ্য সমাদর আমরা করতে পারি নি—এ-যুগের বাঙালি যেন এ কথাটি মনে রাখে। একেবারে শেষবয়সে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তাঁকে গুণী হিসাবে সংবর্ধিত করেন। কিন্তু অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, শিশিরকুমার তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দদের কছে থেকে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে এই ছিল প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা। অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে শিশির-কুমারের যেমন জনপ্রিয়তা ছিল, যুগপ্রবর্তক অভিনেতা শিশিরকুমারকেও তারা তেমনি শ্রদ্ধাই জানিয়েছিল সেদিন। তখন নাট্যমন্দিরে 'নর-নারায়ণ' নাটকের অভিনয় চলেছে। 'সীতা' নাটকের ন্যায় এই নূতন নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনায় শিশিরকুমার আবার নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। ১৩৩৩ সনের ৮ই মাঘ কলিকাতার হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ শিশিরকুমারকে সংবর্ধনা করে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেছিলেন। শিশির-কুমারের নটজীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। উচ্চশিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতার সংবর্ধনা এদেশে এই প্রথম। সেই স্মরণীয় সংবর্ধনার কথাই এখানে সংক্ষেপে বলছি।

এই সংবর্ধনা সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বাংলাসাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী; তখন তিনি 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, সুকণ্ঠ শ্রীদিলীপকুমার রায়, সুগায়ক

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি; এ ছাড়া বহু অভিনেতা ও শিল্পীরও সমাবেশ হয়েছিল। সভার অনুষ্ঠান হয় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের লাইব্রেরি হলে। হল ও হলের দু'পাশের বারান্দা জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের উপর প্রশংসনীয় ছিল অভ্যর্থনার রীতি। হোস্টেলের কৃতী ছাত্রবৃন্দ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক অভ্যাগতকে পুষ্পাঞ্জলি দানে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন। এমন সুন্দর ও আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ অনুষ্ঠান আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখি নি।

যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হোল। দিলীপকুমারের উদ্বোধনী গানের পর প্রথমেই সভাপতির আদেশ পেয়ে একটি প্রিয়দর্শন যুবক উঠে একখানি শোভন সুন্দর ও সুচিত্রিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। সেই অভিনন্দনপত্রটি এই :

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

হে নবযুগের শ্রেষ্ঠ নটবীর, বাঙলার নাট্যশিল্প সাধনাক্ষেত্রে তুমি তোমার ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার মায়াস্পর্শে যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছ, তাহার বিপুল উচ্ছ্বাস আজ আমাদের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে!

ওগো রূপদক্ষ! তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় বাঙলার কলা-সরস্বতী এক অভিনব মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছেন। তোমার সেই দিব্য প্রতিভার যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিবার সুযোগলাভে আমরা ধন্য।

ওগো নবীন! তোমার সবুজ প্রাণে শক্তিরসের অজস্র ধারা গতির উল্লাসে অতীতের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া বাঙলার নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায় পূর্ণ করিয়াছে। পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, হে নূতনের সারথি, সেই সংগ্রামে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়া একাকী সত্যের মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও গৌরব তোমারই।

নাট্যকলার স্রোতোধারাকে উজান বহাইয়া দিবার জন্য তুমি যে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলে তাহার আহ্বানে বাংলার তরুণ প্রাণ আজ সাড়া দিয়াছে,—ইহাই তোমার যাত্রাপথের সকল দুঃখ সকল বেদনার পরম সুখ ও সান্ত্বনা।

হে বরেণ্য, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হউক! তুমি আনাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ
সন ১৩৩৩, ৮ই মাঘ।

এই অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন শিশিরকুমার। রঙ্গালয়ে যোগদান করার পর প্রকাশ্যে সেই তাঁর প্রথম সুদীর্ঘ বক্তৃতা। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় এবং নাট্যশালায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি উঠে প্রথমেই বলেন যে, "অভিনেতা হিসাবে কোনো ব্যক্তিগত সম্মান গ্রহণে তিনি কোনোদিনই সম্মত হন নি। আজকের এই অভিনন্দন পাবার মতো যোগ্যতা ও উপযুক্ত সময় তাঁর হয়েছে কিনা সে বিষয়েও তিনি কৃতনিশ্চয় নন, তথাপি আজকের এই অভিনন্দন গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হতে পারেন নি, তার কারণ এ সম্মান আসছে এমন একটি বিশেষ দলের কাছ থেকে যাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতেরা যে অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে ঘৃণা বোধ করতেন, তাঁরাই আজ তাঁর মতো একজন নটব্যবসায়ীকে সমাদর করতে চেয়েছেন শুনে তিনি অভিনেতাদের 'জাতে উঠবার' এ সুযোগকে অবহেলা করতে পারেন নি। অভিনেতাদের যে চরিত্রহীন বলে লোকে ঘৃণা করে সেটা তাঁদের অত্যন্ত ভুল। অভিনেতাদের অসচ্চরিত্র হবার সম্ভাবনা, সুযোগ এবং অবকাশ সবার চেয়ে কম। তারা যদি অনিয়মে অনাচারে জীবন যাপন করে তা'হলে নটের সাধনা থেকে তাদেরকে ভ্রষ্ট হতে হবে। যে কণ্ঠস্বর তাঁদের একমাত্র সম্পদ শরীরের প্রতি ঈষৎ অত্যাচারে তা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বক্তৃতায় ম্যাডাম মেলবার একটি উক্তি উদ্ধৃত করে শিশিরকুমার বলেন যে, এই সুকণ্ঠী গায়িকা বিলাতের সমালোচকদের এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে আজ

বিশ বৎসর ধরে তিনি এই গান করছেন। এই বিশ বৎসরের মধ্যে কণ্ঠে একদিনের জন্যও একটি বেসুরো আওয়াজ নির্গত হয় নি। তাঁরা কেউ কি অমনটি পারেন?”

যতদূর স্মরণ হয়, অভিনন্দনপত্রের একটি কথার প্রতিবাদ করেছিলেন শিশিরকুমার। তিনি বলেন যে, “এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই, যা কালকের নূতন ছিল আজ তাই পুরাতন হয়েছে আর আজকের যা নূতন কাল তা পুরাতন হয়ে পড়বে। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের কোনো বিরোধ নেই। পুরাতন ছিল বলেই আজ নূতন সম্ভব হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী অভিনেতা যে এ যুগে কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং তাঁদের কাছে এদেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা যে কতখানি ঋণী সে কথারও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। নূতনের মধ্যে তিনি বলেছেন কেবল ‘প্রয়োগশিল্পই’ একমাত্র এ যুগের দান।” বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শিশিরকুমার আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন যে, “এদেশের দর্শকেরা থিয়েটার দেখতে আসা সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে রঙ্গালয়ের উন্নতি-সাধন তো দূরের কথা নাট্যশালা পরিচালনা করাই দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এইরূপ অবস্থা যদি আর কিছুদিন থাকে তা’হলে এদেশের নাট্যশালার দ্বারগুলি একে একে বন্ধ করে দিতে হবে। য়ুরোপীয় নাট্য-শালার সঙ্গে আমরা কথায় কথায় আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের তুলনা করে থাকি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক’জন নিয়মিত প্রবেশ মূল্য দিয়ে থিয়েটার দেখতে যাই? সে-দেশের দর্শকরা একই নাটকের অভিনয় প্রতি রাত্রে অর্থব্যয় করে দেখতে যায় কারণ অভিনয় দেখাটা তাদের একটা অভ্যাসের মধ্যে। আমাদের এখানে রঙ্গালয়ের অধীকারীদের বিনামূল্যে ছাড়পত্র দেবার অনুরোধে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়।”

শিশিরকুমারের বক্তৃতা শুনে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যে এমন অবলীলাক্রমে মৌখিক ভাষণ দিতে পারেন, তা তাঁদের ধারণাই ছিল না। তিনি যে একদা একজন কৃতী অধ্যাপক ছিলেন, সেই কথাটা তাঁরা যেন আর একবার নতুন করে স্মরণ করলেন, বুঝলেন অভিনেতা

শিশিরকুমার একজন পরিচ্ছন্ন বক্তা। শিশিরকুমারের বক্তৃতার পর উঠলেন নটবৃদ্ধ অমৃতলাল। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তিনি যেন কতকটা শিশিরকুমারের কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন যে, নূতন ও পুরাতনে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। পুরাতন নূতনেরই পিতামহ এবং নূতন যা তা সেই পুরাতনেরই আত্মজ ও বংশধর। দেখা গেল শিশিরকুমারের এই সংবর্ধনায় অমৃতলাল নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করলেন এবং এ কথা তিনি সেদিন মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রসরাজ আরো বলেছিলেন যে, গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির অন্তর্ধানের পর বাঙলার রঙ্গালয়ের যে দুরবস্থা এসেছিল তা দেখে তিনি নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আজ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ন্যায় প্রতিভাশালী নটের আবির্ভাবে তিনি আবার আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের হাতে গড়া এই জিনিসটি যে রক্ষা পাবে শুধু তাই নয়, দিন দিন সে যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এই দেখে তিনি এখন সুখে চক্ষু মুদিত করতে পারবেন। আজ দেশের লোকে অভিনেতাদের সম্মান ও সমাদর করতে শিখেছে দেখে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা সফল হয়েছে বলে মনে করে বিশেষ আনন্দ বোধ করছেন। অর্থে সামর্থ্যে জীবনপাত করে তাঁরা সেদিন যে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, শিশির-কুমার-প্রমুখ নবযুগের শিল্পীরা যদি আজ অভিনব কারুকার্যে খচিত করে সে মন্দিরের শোভাসৌন্দর্য পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি করে থাকেন তবে তাঁরা নটকুলের সুসন্তানের উপযুক্ত কার্যই করেছেন।

এর দু'বছর পরে শিশির-সম্প্রদায় যখন ঢাকায় কয়েক রাত্রির জন্য অভিনয় করতে যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতি থেকে শিশিরকুমারকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেই সংবর্ধনার উত্তরেও তিনি ঐ একই কথা বলেছিলেন—"আমার মনে হচ্ছে আমি যেন জাতে উঠেছি।" যে দেশে অভিনেতারা চিরকাল ব্রাত্য বলে অবহেলিত হয়ে এসেছে, সেই দেশে শিশিরকুমারের এই সংবর্ধনার বিশেষ গুরুত্ব আছে বৈকি। ঢাকাতে শিশিরকুমারকে আরো একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল; সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় নাট্যানুরাগী জমিদার ব্রজগোপাল দাস। তাঁরই 'অলকাপুরী'

ভবনে এই অনুষ্ঠান হয় এবং সংবর্ধনালিপিটি রচিত হয় কবিতায়। সেটি রচনা করেছিলেন ভূপেন্দ্রকিশোর বর্মণ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র। শিশিরকুমারের নটজীবনের শ্রীরঙ্গম অধ্যায়ে, শেষের দিকে বাগবাজারের শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅমল হোম আমাকে জানিয়েছেন : "ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে যখন তাঁর কাছে এই প্রস্তাব করা হয়, শিশির সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন তরুণকান্তির অনুরোধে আমি নিজে শ্রীরঙ্গমে গিয়ে শিশিরের সঙ্গে দেখা করি এবং অনেক কষ্টে তাকে এই ব্যাপারে রাজী করাই। তবে তার একটা সর্ত ছিল যে এই সংবর্ধনা তাকে তার থিয়েটারে এসে দিতে হবে। ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজী হন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু। যথাসময়ে রজ্যেপাল এলেন, অন্যান্য সকলেই এলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার ঠিক পনর মিনিট আগে আমার হাতে একজন একটি স্লিপ কাগজ দিয়ে গেল; সেটি শিশিরের লেখা। তাতে সে লিখে জানিয়েছে যে, এই অনুষ্ঠানে সে নিজে উপস্থিত থাকবে না, তার পুত্র শ্রীমান্ অশোক তার হয়ে অভিনন্দনলিপি গ্রহণ করবে। আমি তো রীতিমত বিস্মিত। রাজ্যপাল এসেছেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ নিয়ে। আমি তখনি শ্রীরঙ্গমের পেছনে দোতলার ঘরে গিয়ে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? শিশির বললে, দেখ আমি অনেক ভেবে দেখলাম, conscience-এর সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করতে পারলাম না। আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। তখন শিষ্টাচারের দোহাই দিলাম, তাতেও কিছু হোল না। শিশিরের এই অসৌজন্য দেখে আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলাম।" কিন্তু আমার মনে হয় অসৌজন্যের প্রশ্নটা এখানে বড়ো নয়। এই জাতীয় সস্তা অনুষ্ঠানে শিশিরকুমারের মন কোনদিনই সায় দিত না। এ তাঁর দম্ভ নয়, তাঁর প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য।

॥ ১১ ॥ সমসাময়িক বাংলা থিয়েটার ॥ (১)

নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে কলিকাতায় মাত্র দুটি রঙ্গালয় ছিল—আর্ট থিয়েটার এবং শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির। মিনার্ভা তখন অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছে এবং তার নূতন ভবনের নির্মাণ কার্য চলছে। মিনার্ভা পুড়ে যায় ১৯২২-এ। এর নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন হয় ১৯২৫-এর ৮ই আগষ্ট। গৃহদাহের পর মিনার্ভা কিছুদিন আলফ্রেড মঞ্চে অভিনয় করে। ১৩৩২ সালের শ্রাবণ মাস থেকে দেখা গেল শহরে তিনটি রঙ্গালয়—ষ্টার, নাট্যমন্দির ও মিনার্ভা। নূতন মিনার্ভার উদ্বোধন হোল 'আত্মদর্শন' নাটক দিয়ে, সে-কথা আগেই বলেছি। এই সময়ে থিয়েটারে অনেক দিক দিয়ে পরিবর্তন এসেছে দেখা যায়,—সকলেই বুঝেছেন যে কম খরচে থিয়েটার চালাবার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, প্রদর্শনীর মূল্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং এ বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন শিশিরকুমার। নাট্যমন্দিরেই প্রথম টিকিটের দাম দু'টাকা-চার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা-দশ টাকা করা হয়। এবং এই রঙ্গালয়েই সর্বপ্রথম আট আনার গ্যালারি তুলে দেওয়া হয়; শিশিরকুমারের থিয়েটারে পেছনের আসন কখনো এক টাকার কম পাওয়া যেত না। এই আভিজাত্য প্রবর্তন ভালই হয়েছিল—এর ফলে অন্ততঃ একশ্রেণীর অরসিক দর্শকের থিয়েটারে আসা বন্ধ হয়। তবু লক্ষ্য করবার বিষয়, উচ্চ মূল্যে টিকিট কিনে যাঁরা থিয়েটার দেখতে আসতেন সেইসব দর্শকরাও তখন প্রেক্ষাগারের সুখ-সুবিধা সম্পর্কে অনেকখানি সচেতন হয়ে উঠেছেন। 'সীতা'-র যখন শততম রজনীর অভিনয় অতিক্রান্ত হয়েছে, নাট্যমন্দিরের সেই সমৃদ্ধির দিনেও তখনকার দর্শকদের মনের প্রতিক্রিয়া তৎকালীন 'নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি চিঠি থেকে জানা যায়। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে: "আমি প্রায়ই মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে যাইয়া থাকি। তথায় কয়েকটি ত্রুটি দেখিলাম—তাহা এতদিন পরেও সারে নাই। (১) মহিলা ২৲ ও ১৲ টাকার সীটে পাখার অবন্দোবস্ত। (২) পুরুষদের সীট—কাঠের চেয়ার, লোহার

পেরেকে পরিপূর্ণ ; ষ্টারের বসিবার সুবিধা অনেক। নাট্যমন্দিরে পঙক্তিগুলা বড় ঘন সন্নিবিষ্ট ; কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইলে, যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদের এক মহা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। (৩) একটি ভাল রেস্তোরাঁর অভাব—ষ্টারের ব্যবস্থা এ বিষয়ে চমৎকার। (৪) প্রোগ্রাম বিক্রয় কোথায়ও নাই, প্রোগ্রাম বিক্রয়ে কত লাভ হয় জানি না, কিন্তু ইহা এক ঘোরতর অন্যায়। প্রথম, দুই পয়সা ছিল, হইল চার পয়সা। কাল 'জনা' দেখিতে গিয়া দেখি মূল্য দুই আনা মাত্র। প্রোগ্রামের চাকচিক্যে কি প্রয়োজন?"

কলিকাতার বাইরে গিয়ে অভিনয় করার রীতি সাধারণ নাট্যশালার প্রায় প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে। নবযুগেও সেই রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। ১৩৩১ সালে আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় রেঙ্গুনে অভিনয় করতে যান। সেখানে যশের মুকুট মাথায় পড়ে তাঁরা ফিরে আসেন। তাঁদের অভিনয়ের খ্যাতি বর্মার সীমা ছাড়িয়ে মালয় ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত পৌছয়। সিঙ্গাপুরেও তাঁরা নিমন্ত্রিত হন। নাট্যমন্দিরও পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরে, উত্তরবঙ্গে এবং কাশীতে নিমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে প্রাচীন যুগে ষ্টার থিয়েটারের একটা ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল। আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ষ্টার মঞ্চে ১৩৩২ সালে সেই ট্র্যাডিসনের পুনরুজ্জীবন করতে চাইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' দিয়ে। পুরাতন যুগে ষ্টারে 'চন্দ্রশেখর' একদিন দর্শকদের এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, তারপর বহুকাল পর্যন্ত যেদিনই সেখানে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হবে বলে ঘোষণা করা হোত, সেদিনই রঙ্গালয়ে দর্শকদের আর স্থান সঙ্কুলান হোত না। কিন্তু তাঁদের এ প্রয়াস সার্থক হয় নি। "No revival can revive the past just as it was in the past"—বিপিন পালের এই কথাটির সত্যতার নূতন করে প্রমাণ পাওয়া গেল যখন আর্ট থিয়েটার চন্দ্রশেখরের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। নূতন যুগের ষ্টারে 'চন্দ্রশেখর' নাটকের বিভিন্ন অংশে ছিলেন আশ্চর্যময়ী (দলনীবেগম), নীহারবালা (সুন্দরী), রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (চন্দ্রশেখর), অহীন্দ্র চৌধুরি (নবাব) প্রভৃতি। পুরাতন ষ্টারে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অমৃতলাল মিত্র—এ ভূমিকায় তিনি অদ্যাবধি অপরাজেয় হয়ে আছেন।

১৩৩০ পর্যন্ত কলিকাতায় নটগুরু গিরিশচন্দ্রের কোনো প্রকাশ্য স্মৃতি ছিল না। সেই বছর দেশবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নামে গিরিশ পার্কটির নামকরণ করেন। গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; তিনিই প্রতি বৎসর নটগুরুর স্মৃতিপূজার আয়োজন করতেন। ১৩৩২-এর ২৫শে মাঘ মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ-স্মৃতি সভার সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গিরিশচন্দ্রের একটি মর্মরমূর্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য এই সময়ে কলিকাতার রঙ্গালয়গুলি একবার একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেন। সে অভিনয়ে শিশিরকুমার অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা থিয়েটারের নিজস্ব পত্রিকার প্রবর্তক অমর দত্ত। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আর্ট থিয়েটার 'বৈকালী' নাম দিয়ে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশ করেছিলেন; এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন পরবর্তীকালের যশস্বী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পরে অপরেশচন্দ্র 'রূপ ও রঙ্গ' নাম দিয়ে একখানি কাগজ বের করেছিলেন। তখন পুরাতন যুগের দানিবাবু আর নূতন যুগের শিশিরকুমার—এই দুজন অভিনেতা সম্পর্কেই দর্শকসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল দেখা দিয়েছিল। সকলেই মনে করতো একমাত্র দানিবাবু ভিন্ন এখনকার আর কোনো অভিনেতা শিশিরকুমারের সঙ্গে সমানভাবে অভিনয় করতে পারেন না। তাই শিশির-কুমারের সঙ্গে সকলেই দানিবাবুকে সেদিন এক থিয়েটারে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। শিশিরকুমারের প্রতিভা-ই পরোক্ষভাবে সেদিন দানিবাবুর নির্বাপিত প্রতিভার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছিল—ষ্টারে 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তের ভূমিকায় তিনি তার বিস্ময়কর পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই সময়য় (১৩৩৩] কলিকাতায় চারটি থিয়েটার—ষ্টার, মিনার্ভা, নাট্যমন্দির, মিত্র থিয়েটার। কলিকাতায় নাকি চারটি থিয়েটার একসঙ্গে চলা কোনোদিন সম্ভব হয় নি। তাই সমসাময়িক একটি পত্রিকা এই প্রসঙ্গে তখন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন: "থিয়েটার এদেশে জন্মলাভ করবার পর থেকে আজ পর্যন্ত রঙ্গালয়ের যতবারই তিনটি থেকে চারটিতে উঠেছে

ততবারই দেখা গেছে এই চারিটির মধ্যে কোনো না কোনো একটির অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। তখন [১৩৩৩ আষাঢ়] নাট্যমন্দিরে চলছে 'বিসর্জন', ষ্টারে 'শ্রীকৃষ্ণ', মিনার্ভায় 'আত্মদর্শন' ও 'বাঙালী' এবং মিত্র থিয়েটারে 'শ্রীদুর্গা'। "বারবার চারটি থিয়েটার গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে, বারবার তা মরশুমী ফুলের মতই দুদিনের জন্য ফুটে উঠে আবার ঝরে পড়ে গেছে।···কোন-রকমেই চারটি থিয়েটারকে দীর্ঘায়ু করে তুলতে পারা যায় নি।" নবযুগের রুচির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে না পারলে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন—এটা সেদিন প্রত্যেক থিয়েটারই বোধ করেছিল। তখনো দেখা গিয়েছে যে থিয়েটার করবার ঝোঁকে অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবেই নাটক মঞ্চস্থ করা হোত। অনেক ক্ষেত্রেই ভাল করে মহলা না দিয়ে যাঁরা নূতন নাটক খুলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়ে যেত। অর্থাগমের আশায় অধীর হয়ে অতিমাত্র ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁরা নূতন নাটক নিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নেমে পড়তে বাধ্য হতেন। লাভের মধ্যে অর্থাগম হোত স্বল্প, সম্প্রদায়ের সুযশও সাধারণের চক্ষে ম্লান হয়ে যেত। নাট্যব্যবসায়ীরা এই সত্যটা তখনো ভাল করে শিখে উঠতে পারেন নি।

প্রাক্-শিশিরযুগের থিয়েটারের একটা বড়ো দৈন্য ছিল এর দৃশ্যপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ। এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, এ দেশের রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরা এতকাল দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে দর্শকদের ক্রমাগত ফাঁকি দিয়ে আসছিলেন, তাঁদের বরাবরই একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আমরা যখন থিয়েটারের মালিক তখন আমরা যা দেব দর্শকরা নির্বিকারে তাই গ্রহণ করবে। এই ধারাই এতকাল নির্বিচারে চলে এসেছিল। শিশির-যুগে এলো সেই ধারায় আমূল পরিবর্তন। এ যুগের দর্শকদের রুচি শিশিরকুমার এমনই বদলে দিলেন যে, মঞ্চের ওপর শল্‌মাচুমকীর কাজ-করা পোষাক দেখলেই তারা আর মুগ্ধ হোত না, অথবা একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় যা তা রং গুলে ছেড়ে দিলেই তাকে দৃশ্যপট বলে তারা নির্বিচারে গ্রহণ করত না। কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি' অভিনয়ে শিল্পী চারুচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির দিক দিয়ে

রঙ্গমঞ্চে একটা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও কলানৈপুণ্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারপর ন্যাট্যমন্দিরের 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে তিনি শুধু সাজসজ্জা অলঙ্কার প্রভৃতির নয়, দৃশ্যপটের দিক দিয়েও একটা আমূল সংস্কার করে দিয়েছেন। 'সীতা' নাটকে শিল্পী চারু রায়ের শিল্পনৈপুণ্য ও কলাকৌশল নিঃসন্দেহে থিয়েটারে যুগান্তর এনে দেয়। প্রয়োগশিল্পের দিক দিয়ে আগে যেসব কলাবিরোধী ব্যাপার দেখা যেত, যেমন পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের সজ্জায় আগাগোড়া ভেলভেটের ওপর জরি-বসানো হাস্যকর বর্মচর্ম, মুকুট ইত্যাদি, তা ক্রমশই বাস্তবানুগ হয়ে উঠতে লাগল। প্রয়োগশিল্পের সম্পূর্ণ ভার যদি দক্ষ শিল্পীর ওপর ছেড়ে না দেওয়া যায় তা'হলে প্রয়োগশিল্পের harmony বা সুসমঞ্জস ভাব ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব—এই কথা শিশিরকুমারের আগে কেউ চিন্তা করেন নি। ১৩৩১ থেকে ১৩৩৪—এই তিন বছরের মধ্যে কলিকাতার তিনটি রঙ্গালয়ের পত্তন ও পতন দেখা গেল। বোঝা গেল অল্প মূলধনে আর থিয়েটার চলবে না, কিন্তু বেশি মূলধনেও যে চলবে তেমন স্থিরতা নেই, নইলে ম্যাডানের বাংলা থিয়েটার ও মনোমোহন পাঁড়ের থিয়েটার উঠে যেত না। ১৩৩৪ সালে আর্ট থিয়েটার কোম্পানী মনোমোহন থিয়েটার লীজ নিয়ে অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক অভিনয় করেন। দেখা যাচ্ছে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি এসেও বাংলা থিয়েটারে পুরাণের ধারা শেষ হয় নি। শ্রীরামচন্দ্র নাটকে দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, ইন্দু মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী সুশীলা (ছোট ও বড়) প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ নাটক বেশি দিন চলে নি। এই সময়ে আর্ট থিয়েটার কোম্পানি তাঁদের দুই রঙ্গালয়ে দু'খানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন—ষ্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' এবং মনোমোহনে গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য'। উনিশ-কুড়ি বছর আগে কোহিনূর থিয়েটারে 'অশোক' প্রথম অভিনীত হয়; তখন নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দানিবাবু। শঙ্করাচার্যে'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল সেকালের মিনার্ভায়।

১৩৩৪-এর শ্রাবণে ষ্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই অভিনয়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায়

বরিশালের খ্যাতনামা নট-অধিকারী মুকুন্দদাস। নাট্যমন্দিরের যুগে কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের হঠাৎ খুব চাহিদা বেড়ে যায়। 'চিরকুমার সভা'র সাফল্যের পর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের ওপর। আধুনিক কালে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক উপস্থাপিত করার প্রথম গৌরব আর্ট থিয়েটারের, সে-কথা আগেই বলেছি। কবি স্বয়ং 'চিরকুমার সভা'র সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নীহারবালার গানের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। বাহুল্যকে পরিহার করেও যে রঙ্গমঞ্চকে অলঙ্কৃত ও নাট্যরসকে বিকশিত করা যায়, রবীন্দ্রনাথই এই দেশে তা সর্বপ্রথম দেখান তাঁর নিজস্ব পারিবারিক অভিনয়ে। সেই ধারাকে সাধারণ মঞ্চে এনেছিলেন শিশিরকুমার। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর নটজীবনের সাফল্যের মূলে এবং রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ে সে সময়ে অন্যান্য থিয়েটার এরই অনুসরণ করেছিলেন কতকটা। গৃহপ্রবেশের মতো অতি আধুনিক নাটকও মঞ্চস্থ করতে ষ্টার সাহসী হয়েছিল। আর্ট থিয়েটারের অধীনে এই যুগে ষ্টার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি নাটকের অভিনয় হয়েছিল, যথা—রাজা ও রাণী ; চিরকুমার সভা, প্রায়শ্চিত্ত, গৃহ-প্রবেশ ও শোধবোধ। মিত্র থিয়েটারে এই সময়ে 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হয়। কলিকাতার চারটি থিয়েটারের তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নাটকের একসঙ্গে অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন করেছিল সেদিন এবং সেই ধারা আরো কিছুকাল চলেছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের মৃত্যু ১৩৩৪ সালেরই ঘটনা, আগে বলেছি। শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে যে নাট্যকারের সম্মান আছে তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত দুইটি স্মৃতিসভায়। এর একটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা ; এই সভায় একটি কমিটি গঠন করে স্থির করা হয় যে, পরলোকগত নাট্যকারের স্মৃতিরক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় সভাটি হয় অর্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগারের উদ্যোগে আলবার্ট হলে। এই সভার তারিখ মঙ্গলবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪। সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সভায় অমৃতলাল বসু, মন্মথমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কুমা

সরকার ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। গিরিশচন্দ্র ভিন্ন বাংলার আর কোনো নাট্যকারের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি এমন সম্মান দেখান হয় নি। এ সভায় শিশিরকুমার উপস্থিত ছিলেন কি না তা জানা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে শিশিরকুমারের একটা কর্তব্য ছিল বলেই আমরা মনে করি, কেন না তাঁরই নাটককে আশ্রয় করেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁরই 'রঘুবীর' ও 'নর-নারায়ণ' নাটক তাঁর প্রতিভার উন্মেষ সাধনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এদিক দিয়ে অপরেশচন্দ্রের গুরুনিষ্ঠা প্রশংসনীয় বলতে হবে—বাংলা থিয়েটারে এ যুগে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিকে তো তিনিই জাগিয়ে রেখেছিলেন এবং নটগুরুর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের পেছনে ছিল তাঁরই অক্লান্ত উদ্যম এবং প্রয়াস।

১৩৩৫ সালে নবীন নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম নাটক 'সত্যের সন্ধান' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মিনার্ভা এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন। বলা বাহুল্য, নাটকখানি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং অনেকেই জলধরবাবুর মধ্যে নবযুগের একজন শক্তিমান নাট্যকারের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'সত্যের সন্ধান' নাটকের ভূমিকালিপি এই রকম ছিল: রাজা—মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু); অরিন্দম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পুরোহিত—প্রভাত সিংহ; কবি—কৃষ্ণচন্দ্র দে; চন্দন—ভূমেন রায়; অধীরা—শশীমুখী; পিয়ারী—আঙুরবালা; সুবদনা—রেণুবালা। এ পর্যন্ত এক যোগেশচন্দ্র ভিন্ন শিশিরকুমার কোনো নূতন নাট্যকারের সন্ধান দিতে পারেন নি। এই সময়ে রাধিকানন্দ ও সুশীলাসুন্দরী নাট্যমন্দির ত্যাগ করেন; নরেশচন্দ্র ত্যাগ করেন ষ্টার থিয়েটার আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী তারাসুন্দরীকে নিয়ে ভ্রাম্যমান অভিনয়ের একটি দল গঠন করেন। মিনার্ভায় এই সময়ে অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' নাটক মঞ্চস্থ হয়; ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় দানিবাবুকে দেখা যায়। যাজ্ঞসেনীকে নিয়ে সমালোচক মহলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পৌরাণিক নাটক রসরাজের শেষ বয়সের একটি অসার্থক রচনা এবং এই নাটকের প্রযোজনাও হয়েছিল ততোধিক অসার্থক। এই সময়ে আর একজন নূতন নাট্যকারের আবির্ভাব

ঘটে ; তিনি সুধীন্দ্রনাথ রাহা। এঁরই লেখা ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক 'মহারাষ্ট্র' নিয়ে অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে নবগঠিত বেঙ্গল থিয়েটার্স লিমিটেড-এর উদ্বোধন হয়। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের পর এ যুগে বাংলা থিয়েটারে ইহাই ছিল তৃতীয় যৌথ প্রয়াস। এ প্রয়াস কিন্তু স্থায়ী হয় নি, সার্থকও হয় নি। মিত্র এবং বেঙ্গল—দুটিরই অকালমৃত্যু ঘটেছিল। 'মহারাষ্ট্র' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :—সদাশিবরাও—নির্মলেন্দু লাহিড়ী ; আলমগীর—অমলেন্দু লাহিড়ী ; বালাজিরাও পেশোয়া—প্রবোধচন্দ্র বসু ; বিশ্বাসরাও—শরৎভূষণ মুখোপাধ্যায় ; আহম্মদ শা দুরাণি—ইন্দুকান্ত বসু; আলি গওহর—গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ; সইবাই—শ্রীমতী সেরাবালা ; গোপিকাবাই—শ্রীমতী কুসুমকুমারী (পরে হরিপ্রিয়া) ; পার্বতীবাই—শ্রীমতী সোনামুখী ; আনোয়ারা—শ্রীমতী মণিমেলা।

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'রাধিকানন্দ সম্প্রদায়'। নবযুগের অন্যতম শক্তিমান এবং সুশিক্ষিত নট রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গম্ভীর ও চটুলরসে তাঁর সমকক্ষ অভিনেতা একালের বাংলা থিয়েটারে সুলভ হয় নি। মুস্তফি সাহেবের মতো সাহেব ও ইঙ্গ-বঙ্গের ভূমিকায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রাধিকানন্দ ছিলেন যেমন পরিশ্রমী, তেমনি কতব্যে একনিষ্ঠ। কোনো মঞ্চেই স্থায়ী হতে না পেরে শেষে তিনি নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। অভিনয় শিক্ষাদানে তিনি প্রায় শিশিরকুমারের সমতুল্য দক্ষ ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। এ অভিনয়ের তারিখ পৌষ, ১৩৩৫। রাধিকানন্দ অর্জুনের ভূমিকার অভিনয় করেন। এঁদের দ্বিতীয় নাট্যপ্রয়াস 'পাণ্ডবগৌরব', এর অভিনয় তারিখ ৭ই চৈত্র, ১৩৩৫। কুমার গোপিকারমণ রায় তখন এই সম্প্রদায়ে অর্থানুকুল্য করেন। পরবর্তী বৎসরে রাধিকানন্দ নাট্যমন্দির মঞ্চে 'নিবেদিতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল, এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল। সহায়-সম্পদহীন এই অভিনেতা সেদিন দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শিশিরকুমার অধ্যাপনা ছেড়ে মঞ্চে যোগদান করেছিলেন ; রাধিকানন্দও তেমনি ভারত গভর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে আত্ম-

নিয়োগ করেছিলেন। সেদিন একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন শহরের আর কোনো থিয়েটার রাধিকানন্দকে মঞ্চ ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি। কয়েকজন শক্তিশালী নবীন অভিনেতা ও অন্যতমা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরীকে তিনি তাঁর দলে পেয়েছিলেন। এ যুগে সুশীলাসুন্দরীর মতো পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর আর কোনো অভিনেত্রীর মধ্যে দেখা যায় নি। গম্ভীর রসের অভিনয়ে তাঁর যোগ্যতার কথা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে। ঠিক এই সময়ে শহরের প্রত্যেকটি থিয়েটারেই পুরাতন নাটকের পরিচিত সমারোহ চলছিল। তাই রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের 'নিবেদিতা' দেখবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়েছিলেন। অভিনয় ও প্রযোজনায় 'নিবেদিতা' শিশিরযুগের অন্যতম সার্থক নাট্যপ্রয়াস।

এই সময়ে পুরাতন যুগের দানিবাবুও কোনো মঞ্চে স্থায়ী হতে পারেন নি। কখনো ষ্টার থেকে মিনার্ভায়, কখনো মিনার্ভা থেকে মনোমোহনে আবার মনোমোহন থেকে ষ্টারে—এই ভাবেই মঞ্চে চলছিল তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলি। অবশেষে তিনি ষ্টারেই স্থায়ী হন। ষ্টারে এসে দানিবাবু প্রথমে চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। শহরের দেয়ালে দেয়ালে প্রচুর পোষ্টার-প্লাকার্ড পড়ল। প্রথম রজনীতে তাঁর প্রাণমাতানো অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করল—তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হোল প্রেক্ষাগৃহ। টিকিট বিক্রী হয়েছিল ২২০০৲ টাকা। সবাই বললো দানিবাবুর যেন resurrection হোল। আর্ট থিয়েটারের পরিচালকরা খুশি হলেন। প্রথমে তিনকড়ি চক্রবর্তীকে এই ভূমিকায় সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি একেবারেই ব্যর্থ হন। দানিবাবু আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন—সাজাহান, বলিদান, প্রফুল্ল, সরলা প্রভৃতি নাটকে তাঁর ঔরংজেব, দুলালচন্দ্র, যোগেশ ও গদাধর—প্রত্যেকটি ভূমিকা-ই তখন অপূর্ব হোত। এই সময়কার আর একটি ঘটনা পুরাতন যুগের প্রতিভাধর অভিনেতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু। কোহিনূর থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' থেকে রূপান্তরিত নাটকে বসন্তরায়ের ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্রের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বিষবৃক্ষে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকাতেও তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কেবল অভিনয় নয়, তিনি একজন সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন।

বাংলা থিয়েটারের প্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর মৃত্যুও এইসময়কার ঘটনা। পুরাতন যুগের এই প্রতিভাবান শিল্পী নাট্যমন্দিরের অন্যতম সম্পদ ছিলেন।

বাংলা থিয়েটারের নবযুগের প্রথম ছয় বছরের এই হলো মোটামুটি পরিচয়। যদিও শিশিরকুমার এক নূতন চেতনা, নূতন প্রেরণা দিয়ে নাট্যশালাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তথাপি দেখা যায় যে মঞ্চে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ধারার বিরাম ঘটে নি; কর্ণার্জুন, সীতা, সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যাজ্ঞসেনী, নর-নারায়ণ প্রভৃতি একাধিক নূতন পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হয়েছে এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মঞ্চে। বাঙালির সমাজজীবন সবেমাত্র মঞ্চে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে শরৎচন্দ্রের নাটককে উপলক্ষ করে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে বলতে গেলে, এই নূতন যুগে মাত্র চারখানি নাটক অভাবিত সাফল্যলাভ করেছে, যথা—কর্ণার্জুন, সীতা, চিরকুমার সভা ও ষোড়শী। অর্থাৎ নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারই নবযুগের পতাকাকে মঞ্চের ওপর সগর্বে তুলে ধরেছিল এই সময়ে।

॥ ১২ ॥ নব-নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গম ॥

ছ'বছর পরে নাট্যমন্দির উঠে গেল। আর্ট থিয়েটারও এর দু'বছর পরে নাট্যমন্দিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। থিয়েটারের ব্যবসায় এই দুটি শক্তিশালী সম্প্রদায় লিমিটেড কোম্পানি হোয়েও চলে নি, অংশীদাররা লভ্যাংশ কিছুই পান নি। অথচ সীতা, ষোড়শী, কর্ণার্জুন ও চিরকুমার সভা প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে এঁরা কম পয়সা পান নি। কথিত আছে, এক 'সীতা' নাটক থেকেই শিশিরকুমার লক্ষাধিক টাকা লাভ করেছিলেন এবং 'সীতা'র উপার্জনের বাবদ নাট্যমন্দিরকে পঁচাত্তর হাজার টাকা আয়কর দিতে হয়েছিল। ছ'বছরে নাট্যমন্দিরে নূতন ও পুরাতন যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলির Production cost (অর্থাৎ নাটক মঞ্চস্থ করার খরচ)-এর যদি একটা সঠিক হিসাব পাওয়া যেত তাহলে বুঝতে পারা যেত আয়ের তুলনার ব্যয় বেশি হয়েছে, না ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়েছে, না অর্জিত অর্থের অপব্যয় হয়েছিল। জানি, থিয়েটারের টাকা থাকে না, যেমন এটর্ণির টাকা থাকে না। নাট্যমন্দিরের পূর্বে ক্লাসিক তার বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু ক্লাসিকের পুনরাবৃত্তি নাট্যমন্দিরের জীবনে ঘটবে, এটা অনেকেই আশা করেন নি সেদিন। যে আক্ষেপ তিনি শেষ জীবনে করতেন, একটি জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব, সে তো শিশিরকুমার ইচ্ছা করলে নাট্যমন্দিরের লাভের টাকা দিয়েই করতে পারতেন। অথবা নাট্যমন্দিরের দোষ নয়, বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্যই এই যে শহরে একসঙ্গে তিনটির বেশি ষ্টেজ থাকতে পারে না। ১৩৩৭-এ এসে দেখা গেল ঠিক তাই। নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার অদৃশ্য হোল—রইল সেই ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন।

১৯৩০-এর শেষভাগে শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকায় যাত্রা করেন। এরিক এলিয়ট নামক একজন ইংরেজ অভিনেতা ও প্রযোজক (এঁর একটি ভ্রাম্যমান দল ছিল এবং সেই দল প্রধানতঃ শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীই অভিনয় করত) একবার নাট্যমন্দিরে 'সীতা' দেখতে আসেন ও শিশির-কুমারের অভিনয়প্রতিভা দেখে এবং পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তিনি মুগ্ধ

হন। মিস এলিজাবেথ মারবেরী নিউইয়র্কের থিয়েটার জগতের একজন প্রসিদ্ধ মহিলা, তাঁর পরিচালনাধীনে সেখানে একাধিক থিয়েটার ছিল। নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় থিয়েটার প্রদর্শন করবার খুব ইচ্ছা তাঁর ছিল। এরিকের কাছ থেকে যখন তিনি শিশিরকুমারের কথা শুনতে পেলেন তখনই তিনি তাঁকে তাঁর নিজস্ব দলবল নিয়ে আমেরিকায় অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শিশিরকুমার ভারতীয় নাট্যশালার গৌরব ও ঐতিহ্যকে বিদেশের রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরবার এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন না। ভারতের বাইরে ভারতীয় অভিনয়রীতিকে বিদেশী দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার যোগ্যতা সেদিন একমাত্র তাঁরই ছিল। তা ছাড়া, শোনা যায়, নাট্যমন্দিরের দরজা বন্ধ হবার যখন উপক্রম হয়, তখন তাঁর চলছিল প্রবল আর্থিক অনটন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলতেন, "Calcutta was then too hot for me."—এবং তখন নিউইয়র্কে যাওয়ার প্রোগ্রাম না থাকলে পরে শিশির-কুমারকে আবার কিছু দিন ষ্টেজের বাইরে থাকতে হোত। যাই হোক, এরিক উক্ত মারবেরির অর্থসাহায্যে শিশিরকুমামারকে নিউইয়র্কে নিয়ে যান। যাবার সময়েও তাঁকে আইনগত একটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিনার্ভার যে ব্যালে গার্লকে তিনি শিখিয়ে-পড়িয়ে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই চারুশীলাই তখন অন্যের প্ররো-চনায় শিশিরকুমারের কলিকাতা ত্যাগের ওপর injunction আনতে উদ্যত হয়েছিল—দীর্ঘকালের বেতন বাকী এই অজুহাত দেখিয়ে। সুখের বিষয়, হাইকোর্টের বিচারপতি শিশিরকুমারের নিজমুখে তাঁর বক্তব্য শুনে অত্যন্ত impresed হন এবং তাঁর রায়ে তিনি এই কথাই বলেছিলেন যে, একজন প্রতিভাবান্ শিল্পীকে এইভাবে মিথ্যা ওজুহাতে বাধা দেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। প্রতিপক্ষদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়, চারুশীলা পরে নাকি এর জন্য অনুতাপ বোধ করেছিলেন।

অভিনয় প্রদর্শনের জন্য শিশিরকুমারের আমেরিকা গমন নিঃসন্দেহে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। শিশিরকুমার ভিন্ন তাঁর দলের আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কঙ্কা, বেলারাণী, ঊষা, সরলা, মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্য (সীতা নাটকে বাল্মীকির ভূমিকা অভিনয় করে ইনি মঞ্চজগতে 'মহর্ষি' নামে খ্যাত হয়েছিলেন), যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারা-কুমার ভাদুড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শিশিরকুমার যখন আমেরিকায় গিয়া পৌছান, রবীন্দ্রনাথ তখন সেই দেশে। নিউইয়র্কে প্রসিদ্ধ সিটি হলে ডেপুটি মেয়র কর্তৃক শিশিরকুমার সংবর্ধিত হয়েছিলেন। নিউইয়র্কের রাস্তায় সেদিন যে প্রাচীরপত্র প্রদর্শিত হয়েছিল তার ভাষা ছিল এই রকম ঃ

WELCOME Mr. SISIR KUMAR BHADURY
THE GREATEST ACTOR OF INDIA
THE WIZARD OF THE INDIAN STAGE
WITH A BATCH OF NIGHTINGLE GIRLS
AT BROADWAY

ব্রডওয়ে নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চ। শিশিরকুমারের আবির্ভাবে নাট্যামোদী মার্কিনবাসীদের মধ্যে যে খুব আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল, তা সেখানকার সমসাময়িক কাগজের বিবরণ থেকেই জানা যায়। কিন্তু নানা কারণে ব্রডওয়েতে অভিনয় সম্ভব হয় নি, যদিও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর প্রথম সপ্তাহের জন্য সমস্ত টিকিটই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল ; সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ছিল বারো ডলার। মিস মারবেরির সঙ্গেও তাঁর মতান্তর দেখা দেয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে ব্যালটিমুর থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয় করতে হয়। 'সীতা' নাটকই অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ের তারিখ ছিল ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩০। এই সময়েই শিশিরকুমারের সঙ্গে সতু সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই প্রতিভাবান্ যুবক তখন নিউইয়র্কের ভ্যাণ্ডার-বিল্ট (Vanderbilt) থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নাটকের প্রযোজনা, আলোকসম্পাত প্রভৃতি সম্পর্কে আধুনিকতম পদ্ধতি তিনি এইখানে শিক্ষালাভ করেন। এই সতু সেনের সাহায্যেই পরে উক্ত ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে ছ'রাত্রি 'সীতা' অভিনীত হয়। জাতীয়তাবোধ শিশিরকুমারের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য—সেই জাতীয়তাবোধই তাঁকে

আমেরিকাবাসীদের স্থূল রুচি অনুযায়ী, গ্যালারীসুলভ সস্তা অভিনয় করতে দেয় নি। তিনি তাঁর নিজস্ব ধারা বজায় রেখেই সেখানে অভিনয় করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁকে হয়ত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, ভগ্নমনোরথ হতে হয়েছে, প্রচুর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, তবু দেশের নাট্য-ঐতিহ্যকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে শিশিরকুমার দিল্লীতে 'সীতার'-র অভিনয় দেখিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন। দিল্লীতে 'সীতা' রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে ভাইসরয়ের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৩০-এর মনোমোহন প্রবোধচন্দ্র গুহের নিজস্ব প্রয়াস ছিল। এখানে প্রথমে যতীন্দ্রমোহন সিংহরায়ের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়; কিন্তু সে নাটক জমে নি। তারপরেই ১৩৩৭-এর গোড়ার দিকেই এখানে মঞ্চস্থ হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'। দেশের এক ঘোর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিনে, (সুভাষচন্দ্র তখন কারারুদ্ধ হয়ে আছেন) মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীর কাহিনীকে মঞ্চে উপস্থাপিত করে মনোমোহন সেদিন নাট্যজগতে তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। গৈরিক পতাকার নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। অপূর্ব সে অভিনয় আর ঔরংজেবের ভূমিকায় তাঁরই বিপরীতে ছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—অতি বলিষ্ঠ সে অভিনয়। এই নাটকে বিশ্বাস-ঘাতক বাজী ঘোরফোড়ের ভূমিকায় মণীন্দ্র ঘোষের অভিনয়ও মনে রাখবার মতন। জিজাবাঈয়ের ভূমিকায় সুশীলাসুন্দরী, শ্যামলীর ভূমিকায় নিরুপমা (ভুঁদি) প্রভৃতির অভিনয় সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। মোট কথা, অভিনয় ও প্রযোজনায় 'গৈরিক পতাকা' সেদিন বাংলা থিয়েটারে এক নূতন 'রেকর্ড' স্থাপন করেছিল বলা চলে এবং এই একখানি নাটকই শচীন্দ্রনাথকে নাট্যকাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল সেদিন। এই নাটকের গানগুলি রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। নাটকের গান রচনায় সেযুগে দুইজন প্রসিদ্ধ ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার ও নজরুল। গৈরিক পতাকার সাফল্যই প্রবোধচন্দ্র গুহকে থিয়েটারের স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার পথ দেখায়।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা থিয়েটারে তাঁর স্বাধীনভাবে আবির্ভাব সত্যই যুগান্তর এনে দিয়েছিল। সেই যুগান্তরের নিদর্শন—নাট্য-নিকেতন। অনেকদিন বাদে কলিকাতায় এই একটি নূতন থিয়েটার তার নিজস্ব ভবনসহ দেখা দিল। একাধিক সাফল্যমণ্ডিত নাটক মঞ্চস্থ করে, প্রয়োগের দিক দিয়ে নানা অভিনবত্বের সূচনা করে দিয়ে, নাট্যনিকেতনও এ যুগের বাংলা থিয়েটারে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করে দিয়েছিল। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কিছুকাল বাদে শিশিরকুমার আবার যখন তাঁর স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে এই নাট্যনিকেতনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নাট্যনিকেতনের কথা পড়ে বলব।

শিশিরকুমার কলিকাতায় ফিরলেন ১৯৩১-এর গোড়ার দিকেই। তখন তাঁর নিজস্ব ষ্টেজ নেই ; শহরতলীর একটি মঞ্চে হাওড়ার সালিখা নাট্য-সমাজে তিনি দু'একদিন অভিনয় করেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে সতু সেনও ফিরে এসেছিলেন। এই সময়ই কলিকাতায় কয়েকজন নাট্যশিল্পানুরাগী ব্যক্তি co-operative ভাবে একটি নূতন রঙ্গালয় স্থাপন করেন—রঙমহল। নিজস্ব বাড়িতে নূতন থিয়েটার এই সময় দুটি—রঙমহল ও নাট্যনিকেতন এবং দু'টিই প্রায় পাশাপাশি। এই রঙমহল স্থাপনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন প্রভৃতি। বাংলা থিয়েটারে রঙমহলের দানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই রঙমহলেই তখন শিশিরকুমার যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বছরে দশ হাজার টাকা বোনাস পাবেন এবং এই টাকা তিনি মাসিক কিস্তীতে নিতে পারবেন। তিনিই হলেন রঙমহলের প্রধান অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। প্রোডাকসানের দায়িত্ব রইল সতু সেনের ওপর। রঙমহলে শিশিরকুমার ও সতু সেনের এই সম্মেলন সেদিন কলিকাতার নাট্যমোদী মহলে তুমুল আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু যে কোন নূতন থিয়েটারের পক্ষে বড় সমস্যা হোল নাটকের সমস্যা। নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকেও নেওয়া হোল সেই সমস্যা সমাধানের জন্য। রঙমহলের সামনে আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির ও মিনার্ভার দৃষ্টান্ত ছিল—এঁরা তাই একেবারে স্বতন্ত্র বিষয়

নির্বাচন করলেন—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী। বৈষ্ণবকাব্যের উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করে নাটকখানি রচিত হয় এবং এই 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়েই রঙমহলের উদ্বোধন হয় ৮ই আগস্ট, ১৯৩১। শিশিরকুমার, প্রভা এবং কঙ্কাবতী যথাক্রমে নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রযোজনায় অভিনবত্ব ছিল, বিশেষ করে এর আলোকসম্পাতের নৈপুণ্য দেখে সেদিন দর্শকরা বিস্মিতচিত্তে সতু সেনকে বাংলার মঞ্চে স্বাগত জানাল। কিন্তু শিশিরকুমারের স্বাধীন প্রকৃতি তাঁকে এখানেও বেশি দিন টিকতে দিল না; শীঘ্রই রঙমহলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তিন একটি নূতন ষ্টেজ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর এই সময়কার অবস্থা, তাঁর নিজের কথায় কতকটা "ভাড়াটে কেষ্টর মতো"—সম্মিলিত অভিনয়ে তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন মঞ্চে দর্শন দিতেন।

১৯৩১-৩২ বিশেষ করে দানিবাবু ও আর্ট থিয়েটারের বছর বলা চলে। মনোমোহনে 'পথের শেষে' নাটকে হঠাৎ গিরিশ-পুত্র বৃদ্ধ দানিবাবুর প্রতিভা যেন আবার নূতন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অমনি আর্ট থিয়েটার তাঁকে নিয়ে এলেন ষ্টারে। ষ্টার তখন খ্যাতি ও উন্নতির তুঙ্গশীর্ষে। অপরেশচন্দ্র অনুরূপাদেবীর প্রতিভাকে কাজে লাগালেন। 'মন্ত্রশক্তির'-র নাট্যরূপ ও তার অভিনয় বাঙালি দর্শককে চমৎকৃত করল। প্রহসনের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুলও' হিট্ করল। সেই সময়ে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দানিবাবুকে নিয়ে এলেন ষ্টারে। কলিকাতায় তখন চারটি থিয়েটার—ষ্টার, মিনার্ভা নাট্যনিকেতন, রঙমহল। ষ্টারে দানিবাবু 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তের ভূমিকায় এবং অপরেশচন্দ্রের শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে চাপাল-গোপালের ভূমিকায় "নাট্যজগতকে একেবারে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া দিলেন।" পোষ্যপুত্রের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ১২ই মার্চ, ১৯৩২। কিন্তু প্রতিভার সেই উদ্ভাসন ছিল ক্ষণস্থায়ী মাত্র—নিভবার আগে প্রদীপ যেমন একবার জ্বলে ওঠে অনেকটা সেই ধরণের। তখন দানিবাবুর বয়স ৬৫ চলছে। সেই বয়সেও দানিবাবু প্রমাণ করে গেলেন যে, সিংহ স্থবির হলেও সিংহ।

২৯শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯৩২ (বাংলা ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) দানিবাবুর মৃত্যু হোল। রঙ্গমঞ্চে 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তের ভূমিকাই তাঁর শেষ অভিনয়। ২৬শে মার্চ-এর রাত্রে অভিনয়ের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কলিকাতার বাইরে যাবার কথা হয়। নাট্যনিকেতন সেই সময় দানিবাবুকে তাঁদের মঞ্চে আনবার জন্য চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর অন্যতম পুত্র এবং তৎকালীন নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র গুহ আমার কাছে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই : "তখন শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারে যোগদান করেছেন। আমাদের মনে হোল এই সময়ে দানিবাবুকে যদি পাওয়া যায়, তা'হলে খুব ভাল হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একদিন দানিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছেন। আমি সঙ্গে করে হাজার টাকা (একটাকা নোটের দশখানা বাণ্ডিল) নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে অগ্রিম দেবার জন্য। সেই বাণ্ডিলগুলি তাঁর সামনে রেখে প্রস্তাব উত্থাপন করি। তখন দানিবাবু আমাকে বলেন, 'বাবা, আমি এখন অসুস্থ, সুস্থ হয়ে ফিরে এসে তোমাদের থিয়েটারে join করব, কথা দিচ্ছি'। আমি বললাম, 'তা'হলে বায়না হিসাবে এই টাকা-গুলো আপনি রেখে দিন'। তিনি বললেন, 'যদি মারা যাই, তা হোলে আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব, তা হবে না, বায়না আমি কিছুতেই নেব না। ও টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বাবা'। দানিবাবুর এই নির্লোভতা দেখে আমি সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে এই কথা যখন বাবাকে বলি, তিনি আমাকে বলেন, হঁ্যা, গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র বটে।"

দানিবাবুর মৃত্যুতে সেই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। তাতে বলা হয়: "নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র, নটচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সর্বজনপরিচিত দানিবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বিভিন্ন নাটকের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম নটের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তিনি রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই স্বদেশীযুগে যখন জাতীয়ভাবের দ্যোতনা রঙ্গমঞ্চে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল প্রভৃতির নাটকের ভিতর দিয়া নবযুগের নবভাব শতধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে দানিবাবু তাঁহার খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়ে ছিল পৈত্রিক আভিজাত্য।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দানিবাবুর মৃত্যুতে সেই সময়ে নাট্যনিকেতন মঞ্চে যে মহতী শোকসভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, উনিশ বছর আগে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিরাট শোকসভা ভিন্ন আর কোনো নটের মৃত্যুতে এমন সভা কলিকাতায় হয় নি। দানিবাবুর শোকসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্র তখন অসুস্থ হয়ে কলিকাতার বাইরে ছিলেন, তিনি একটি লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রেক্ষাগারে সেদিন অগণিত দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী সেই সভায় শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। শিশিরকুমার ছিলেন সর্বশেষ বক্তা এবং আধঘণ্টাকাল ধরে তিনি বক্তৃতা করেন। সেদিনের সভায় তাঁরই বক্তৃতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দানিবাবুর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিশ্লেষণে তাঁর সে-বক্তৃতা ছিল যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি মর্মস্পর্শী। দু'একটি কথা আমার আজো মনে আছে। শিশিরকুমার বলেছিলেন: "দানিবাবুর গলা ছিল অপূর্ব—উদারা-মুদারা-তারা তিন গ্রামেই গলা চলত। বিয়োগান্ত ভূমিকায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, তবে কমেডিই তিনি সবচেয়ে ভাল করতেন। হাস্যরস সৃষ্টি করতে তিনি দক্ষ ছিলেন— 'সরলা' নাটকে তাঁর 'গদাধর' অবিস্মরণীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল প্রখর।" শেষ বয়সে আমরা দানিবাবুর প্রতিভার যে চরম বিকাশ লক্ষ্য করি, বলা বাহুল্য, এ শুধু সম্ভব হয়েছিল প্রতিভাবান প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ নট শিশিরকুমারের জন্যই, এ কথা আগেই বলেছি।

দানিবাবুর মৃত্যুর পরবর্তী বৎসরে তাঁর সমসাময়িককালের আরেকজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার মৃত্যু হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের শ্যালকপুত্র চুনিলাল দেব। একদা নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে 'দানি-চুনি'—এই নাম দুটি বিশেষ

আকর্ষণের বিষয় ছিল। চুনিবাবুর অধ্যক্ষতায় বাংলার একাধিক রঙ্গালয় উন্নতিলাভ করেছিল। অভিনয় শিক্ষাদানেও তাঁর শক্তি ছিল। নাট্য-সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার কিছু ছাপ আছে। তাঁর লেখা অন্যতম কৌতুক-নাটিকা 'কুঞ্জ ও দরজী' নাট্যমন্দিরে নূতন করে খোলা হয়েছিল।

এই সময়ে দানিবাবু ভিন্ন নবযুগের অন্যতমা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে আর একটি মর্মন্তুদ ঘটনা। এরপর ১৯৩৩ সালে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। দানিবাবু নেই, কৃষ্ণভামিনী নেই, অপরেশচন্দ্র অসুস্থ, "ষ্টারের ভরাহাট একেবারে ভাঙিয়া গেল"। শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর 'নব নাট্যমন্দির'। এই নূতন মঞ্চে শিশিরকুমারের উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' ও 'বিজয়া', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'দশের দাবী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' ও 'শ্যামা'। তিনি রাম-চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন, রাবণ-চরিত্রটিকে রূপ দেবার জন্য তিনি 'সরমা' নামে একখানা নূতন পৌরাণিক নাটকও মঞ্চস্থ করেছিলেন এখানে। সেই সময়ে হঠাৎ রামায়ণের রাবণ-চরিত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে—নব নাট্যমন্দিরে যখন 'সরমা' অভিনীত হয়, তখনই আর একটি মঞ্চে (সম্ভবতঃ রঙমহল) 'রাবণ' নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। এ ছাড়া তারাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি কয়েক রাত্রির জন্য পুরাতন 'রিজিয়া' নাটকের পুনরভিনয়ও করেছিলেন। 'রিজিয়াতে' শিশিরকুমার বক্তিয়ার ও ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পুরাতনের মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সীতা', 'শেষরক্ষা', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি নাটকেরও অভিনয় এখানে হয়। নবনাট্য-মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল জনৈক খাস্তগীর-রচিত 'অভিমানিনী' নাটক দিয়ে। সে নাটক চলেনি। তার প্রযোজনাও উল্লেখযোগ্য ছিল না। ষ্টার বোর্ডে নব নাট্যমন্দিরের স্থিতিকাল মাত্র চার বছর। তারপর স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে ফৌজদারী ও উচ্ছেদের মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে শিশির-কুমারকে ঐ মঞ্চ ত্যাগ করতে হয়। অতঃপর প্রায় চার-পাঁচ বছর তাঁর জীবন মঞ্চের বাইরেই অতিবাহিত হয়। তারপর তাঁর নটজীবনের শেষ পর্যায় শ্রীরঙ্গমের আরম্ভ। শ্রীরঙ্গমের কথা পরে হবে, আপাততঃ নবনাট্য-

মন্দির-প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয়।

গতযুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু এই বছরের (১৩৪০) আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। সেই সময়ে 'নাচঘর' পত্রিকা উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন : "গতযুগের আর কোন অভিনেতাই বোধ হয় তাঁর চেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নি। বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের সূত্রপাত হবার অনেক আগেই তিনি নটচর্যা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই মত এই যে—উপেন্দ্রনাথের মতন উচ্চশ্রেণীর নাট্যকলাবিদ্ পৃথিবীর যে কোন দেশেই দুর্লভ, কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের যশ ও সম্মান লাভ করেন নি। তিনি অত্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করতেন, নবযুগেরও কোন অভিনেতা বাস্তবতায় তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনি হাস্য ও করুণ দুই রসেই ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁর 'মীরজাফর' (পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত) অতুলনীয় হয়ে আছে।"

•

ষ্টারের পুরাতন বাড়ি আর্ট থিয়েটারের হাতে আসার পর সুসংস্কৃত হয়েছিল। তারই ওপর কিছু রং করে প্লাষ্টার লাগিয়ে নিলেন শিশিরকুমার। নবনাট্যমন্দিরের যাত্রাপথে প্রতিপক্ষ থিয়েটার হিসাবে তখন নাট্যনিকেতন আর রঙমহলের খ্যাতিই সমধিক। দানিবাবুর মৃত্যুসময়ে শিশিরকুমার কিছুকাল নাট্যনিকেতনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তখন তিনি এখানে পুরাতন নাটক 'গৈরিক পতাকা'য় শিবাজী আর নূতন পৌরাণিক নাটক 'মহাপ্রস্থানের পথে' শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৩৪১ সালে (ইং ১৯৩৪) নবনাট্যমন্দিরে তিনখানি নূতন নাটক মঞ্চস্থ হয়, যথা 'বিরাজ বৌ', 'সরমা' ও 'বিজয়া'। 'বিরাজ বৌ'-র নাট্যরূপ শিশিরকুমার স্বয়ং দিয়েছিলেন। এর প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ : ২৮শে জুলাই, ১৯৩৪। এই নাটকের ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : নীলাম্বর—শিশিরকুমার ; পীতাম্বর অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (আদলবাবু) ; বিরাজবৌ—কঙ্কা। 'সরমা'র ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : রাবণ—শিশিরকুমার ; রামচন্দ্র—বিশ্বনাথ ; লক্ষ্মণ—সত্যেন গোস্বামী ; তরণীসেন—মানিক বন্দোপাধ্যায় (নবাগত) ; বিভীষণ—শৈলেন চৌধুরী ; মন্দোদরী—কঙ্কা ; সীতা—প্রভা এবং সরমা—রাণীবালা।

২২শে ডিসেম্বর, শনিবার, (বাংলা ৬ই পৌষ, ১৩৪১) শরৎচন্দ্র-রচিত উপন্যাস 'দত্তা'-র নাট্যরূপ 'বিজয়া'র উদ্বোধন হোল। এই নাটকখানি এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল—"মঙ্গলঘট স্থাপিত। অভিনেতৃগণ শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত।" বিজয়ার অভিনয় ও প্রযোজনা দুই-ই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জনা করে। এই নাটকের ভূমিকালিপি এইরকম ছিলঃ রাসবিহারী—শিশিরকুমার; নরেন—বিশ্বনাথ; বিলাসবিহারী—শৈলেন চৌধুরী; পরেশ—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (নবাগত); দয়াল—শীতল পাল; বিজয়া—শ্রীমতী কঙ্কা; নলিনী—রাণীবালা। এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল দুটি চরিত্র—রাসবিহারী এবং বিজয়া, আর এই দুটি ভূমিকাতেই যথাক্রমে শিশিরকুমার ও কঙ্কাবতী অসাধারণ অভিনয় করেন। নব নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'অচলা' মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ নাটকখানি কিন্তু আশানুযায়ী সফলতা অর্জন করেনি।

এই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)। ইনি একাধারে নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য। থিয়েটার পরিচালনা করবার ক্ষমতা এঁর অসাধারণ ছিল। গিরিশচন্দ্রের সাহচর্যে নাট্যজীবন গঠিত করার সুযোগ ইনি পেয়েছিলেন এবং গুরুর ভাবধারার অনুসরণে নাটক রচনা করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় যখন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়, সেই নাটকে অপরেশচন্দ্র মল্লজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই তাঁর নটজীবনের প্রকৃত আরম্ভ। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক একখানি অসমাপ্ত গ্রন্থে অপরেশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনের অভিজ্ঞতা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন।

পরের বছরের বড়দিনে মঞ্চস্থ হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'দশের দাবী'—হরিজন আন্দোলন নিয়ে লেখা একখানি সুন্দর সরস কিন্তু স্থানে স্থানে নিতান্ত দুর্বল নাটক। এর ভূমিকালিপি এইরকম ছিলঃ দয়াল—শিশিরকুমার; নিশানাথ—বিশ্বনাথ; প্রফুল্ল—শৈলেন চৌধুরী; মহিম—কনকনারায়ণ রায়;

অমরেশ—সুবোধ মজুমদার ; সুজাতা—কঙ্কা এবং নলিনী—প্রভা। 'দশের দাবী'র পর মঞ্চস্থ হয় 'শ্যামা'। কিন্তু এই বছরে নব নাট্যমন্দিরের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাট্যপ্রয়াস হোল জলধর চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'রীতিমত নাটক'। ১৩৪২-এর ২৫শে অগ্রহায়ণ এটি মঞ্চস্থ হয়। এর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল :

প্রফেসর দিগম্বর—শিশিরকুমার ভাদুড়ী
দীননাথ—শীতলচন্দ্র পাল
দিব্যেন্দু—শৈলেন চৌধুরী
বসন্ত—অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (নবাগত)
গণপতি—কার্তিকচন্দ্র দে
রঞ্জন—সত্যেন্দ্র গোস্বামী
সুহৃৎ ডাক্তার—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
নবকৃষ্ণ—শান্তশীল গোস্বামী
স্বাগতা—প্রভা
শান্তা—রাণীবালা
সান্ত্বনা—বেলারাণী

এই নাটকে প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার এক সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় দিয়েছিলেন—যা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই নাটকের ঘষা-মাজায় ও গঠনে শিশিরকুমারের অনেকখানি হাত ছিল বলে প্রাচীরপত্রে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে তাঁর নামও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল অন্যতম নাট্যকার হিসাবে। এই প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন: "'বিরাজ বৌ' আর 'রীতিমত নাটকে'র প্রয়াস দেখে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, তিনি (এই সময়ে) বাংলা নাটকের নূতন রূপের সন্ধান করেছিলেন।" নব নাট্যমন্দিরে শেষ নূতন নাটক রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। নাট্যরূপ কবি স্বয়ং করে দিয়েছিলেন এবং এই নাটকে মধুসূদনের ভূমিকায় শিশিরকুমার অবতীর্ণ হন। তাঁর এই 'মধুসূদন', অনেকের মতে, আশানুযায়ী হয় নি। মনে আছে, কবি যেদিন 'যোগাযোগে'র অভিনয় দেখতে আসেন, সেদিন দর্শকসংখ্যা একশোও পূর্ণ ছিল না।

নব নাট্যমন্দিরের একটি স্মরণীয় সম্মিলিত অভিনয়ের উল্লেখ করতে হয়। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'। সে রাত্রিতে এই নাটকে নবযুগের তিনজন প্রসিদ্ধ নট—শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও রাধিকানন্দ—যথাক্রমে করুণাময়, রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অসম্ভব দর্শক সমাগমে 'বলিদানে'র এই অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল, কিন্তু দর্শকচিত্তকে মুগ্ধ করেছিলেন মাত্র একজন—তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য রাধিকানন্দ। সে রাত্রিতে 'বলিদান' নাটকের সঙ্গে ছিল 'শেষরক্ষা'। 'শেষরক্ষা'র অভিনয়ের সময় দেখা যায় যে শিশিরকুমার কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ। দর্শকদের মধ্য থেকে আমি তাই বলে উঠেছিলাম—"Sentiments and thoughts are not always the same on both sides of the footlight—" আমার এই মন্তব্য শুনে, অভিনয়ের মাঝখানে শিশিরকুমার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন এবং পাদপ্রদীপের দিকে একটু এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশে বলেন—"beg your pardon"। আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঐ কথাটির পুনরুক্তি করি এবং শেষে বলি "to quote Shaw"—এই যেই বলা, অমনি ঈষৎ হেসে শিশিরকুমার উত্তর দিলেন—Sorry, I belong to the country of Tagore." তাঁর এই মন্তব্যটি মনে রাখার মতন বলেই ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হোল।

নবনাট্যমন্দির উঠে যাবার চার-পাঁচ বছর পরে রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের পুনরাবির্ভাব ঘটল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সদ্য বিলুপ্ত নাট্য-নিকেতন মঞ্চেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর নটজীবনের শেষ কীর্তি শ্রীরঙ্গম। জীবনে এই তাঁর নিজস্ব সর্বশেষ মঞ্চ এবং এইখানেই তাঁর নটজীবনের সর্বাধিক-কাল—প্রায় চৌদ্দ-পনর বছর—একাদিক্রমে অতিবাহিত হয়েছিল।

১৯৪২-এর ১০ই জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হোল তারাকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত 'জীবনরঙ্গ' নাটক দিয়ে। নাটকের নামকরণ শিশির-কুমারের। দীর্ঘকাল পরে মঞ্চে একটি বিশেষ ভূমিকায় (যে ভূমিকা অনেকটা autobiographical) শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ সেদিন নাট্যা-মোদী দর্শকমহলে যে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল তা প্রথম রজনীর দর্শক সমাগম দেখেই বোঝা গিয়েছিল। শিশিরকুমারের জনপ্রিয়তা,

তাঁর প্রতিষ্ঠার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন। নাট্যাচার্য অমরেশের ভূমিকায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর জীবনের কথাই সেদিন বলেছিলেন। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই নাটকখানি সেদিন তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। বোঝা গেল শিশিরকুমার আর পুরাণের যুগে ফিরে যাবেন না। কিন্তু বাঙালি দর্শক 'জীবনরঙ্গ' নিতে পারে নি। এই নাটকেও তিনি একজন নবাগতকে (শচীন মিত্র) দিয়ে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়েছিলেন আর সাবেক কালের প্রভা-কঙ্কাকে বাদ দিয়ে দুজন নবীনা অভিনেত্রীকে দিয়ে নাটকের নায়িকা ও প্রতিনায়িকার ভূমিকার অভিনয় করান। নবাগতা বন্দনা নায়িকা নিভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরে শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি—"জীবনরঙ্গে নিভার ভূমিকা করেছিল বন্দনা, বড়ো ভাল করেছিল।" প্রথম দুই রজনীর অভিনয়ের পরে একদিন সকালে জীবনরঙ্গের একটা দীর্ঘ সমালোচনা ইংরেজিতে লিখে শিশিরকুমারকে দেখাই। আমার সেই সমালোচনায় একটা লাইন আমার মনে আছে। আমি লিখেছিলাম—"Even though original in conception and powerful in construction and above all, perfect in production, this new drama is destined to be a flop." আমার এই মন্তব্য দেখে শিশিরকুমার সেদিন বলেছিলেন, "মনের কথাই লিখেছ। এ নাটক চলবে না, জানি। তবু একটা experiment করতে দোষ কি ?"

শ্রীরঙ্গমের পরবর্তী ইতিহাস একাধিক সার্থক নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনার ইতিহাস। একে একে তিনি উপহার দিলেন 'উড়োচিঠি', 'মায়া', 'মাইকেল', 'পরিচয়', 'বিপ্রদাস', 'দুঃখীর ইমান', 'বন্দনার বিয়ে', *'বিন্দুর ছেলে', 'দেশবন্ধু', 'প্রশ্ন', 'তখ্‌তে তাউস'* প্রভৃতি। এইগুলির মধ্যে 'মাইকেল', 'পরিচয়', 'প্রশ্ন' 'তখ্‌তে তাউস'-এ শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার নূতন পরিচয় পেয়ে নাট্যামোদী দর্শকরা বিস্মিত হয়। 'বিপ্রদাস' যখন মঞ্চস্থ হয় তখন তিনি তাঁর অনুজ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হাতে শ্রীরঙ্গম পরিচালনার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

শ্রীরঙ্গমে 'মাইকেল' যখন বিজ্ঞাপিত হয় তখন তার কিছু আগেই রঙমহল মহাকবির জীবনচরিত নিয়ে লেখা একখানি নাটক মঞ্চস্থ করে এবং

সেখানে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। কথিত আছে, রঙমহলে 'মাইকেল', দেখে এসে একজন যখন শিশিরকুমারকে বলে, "বড়-বাবু, দেখলাম ওরা মাইকেলের ব্যবহৃত টেবিল-চেয়ার দেখিয়েছে।"—তখন এই কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, "আমি টেবিল-চেয়ার দেখাব না, অভিনয় দেখাব।" তাই তিনি দেখিয়েছিলেন। এইখানে প্রসঙ্গতঃ শ্রীরঙ্গমে মাইকেল-নাটকের জন্মকথা একটু বিবৃত করা দরকার। শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হবার আগে শিশিরকুমার নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। তখন তাঁর বাসা ছিল গড়পাড় অঞ্চলে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে গুরুপ্রসাদ দাসের বাড়িতে—বাড়িটার নাম 'গোল্ড কটেজ'। সেইখান থেকে, আমি দেখেছি, অনেক সময় তিনি বাদুড় বাগান দিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ধরে হেঁটে চলেছেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি একটা মেসে। সেই মেসে তখন থাকতেন তাঁর পরম স্নেহভাজন নিতাই ভট্টাচার্য। নিতাইবাবুকে দিয়ে তখন থেকেই তিনি মাইকেলের জীবনী নিয়ে নাটক লেখান শুরু করেছিলেন। প্রায় প্রতিদিন সকাল ন'টায় যেতেন, ফিরতেন বেলা একটা কি দুটোয়—তেমনি ভাবে পদব্রজেই। তখন একদিন ট্র্যামে আমাকে বলেছিলেন—"আমি মাইকেলের যে conception দেব তাই হবে real মাইকেল"। উত্তরে আমি বলেছিলাম, "যদি নাটক strong হয়।"—"That is what I am after and Netai is doing his best", বলেছিলেন শিশিরকুমার। এইভাবেই 'মাইকেল' নাটক তৈরি হয়েছিল।

'দেশবন্ধু' নাটকখানি মৌলিক নাটক নয়। এরও একটু নেপথ্য ইতিহাস আছে। শ্রীরঙ্গম-এর গোড়ার দিকে আমি কিছুকাল শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলাম। তখন নানা সময়ে তাঁর সঙ্গে নাটক নিয়ে আমার আলোচনা হোত। লণ্ডনের ভিক্টর গোলানজ্ প্রকাশিত Famous Plays *of Today* বইখানি একদিন তাঁকে পড়তে দিয়ে বললাম, "এর মধ্যে তিনখানা নাটক আমার খুব ভালো লেগেছে, শেরিফের *Journey's End*; বার্কলের *The Lady with A Lamp* (কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনী নিয়ে লেখা নাটক) আর এ্যাসলে ডিউকস-এর *Such Men Are Dangerous* (মূল নাট্যকার য়্যালফ্রেড ন্যুম্যান এবং নাটকের মূল নাম

The Patriot)। দেখবেন শেষের দু'খানা বাংলায় adapt করার খুব scope আছে।" বলা বাহুল্য, তিনি খুব আগ্রহ সহকারেই এই নাট্যসংকলন গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং শেষে একদিন আমাকে বললেন, "খুব ভালো বই। শেষের নাটকটি আমি বাংলায় করতে চেষ্টা করব। কিন্তু কাকে দিয়ে লেখাই?" তখন আমি বলেছিলাম, "মনোরঞ্জনবাবুকেই এই ভারটা দিন।" নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে দৃশ্য-সংস্থান ও পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। দুঃখের বিষয় এ নাটকখানি জমেনি, প্রধান ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সত্ত্বেও জমেনি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা 'তখ্‌তে তাউস' নাটকখানি শিশিরকুমারের হেফাজতে ছিল সেই নাট্য-মন্দিরের সময় থেকে। এই নাটকখানি যখন তিনি মঞ্চস্থ করেন তখন শ্রীরঙ্গমের দৈন্য অবস্থা—তাই একমাত্র জাহান্দর শা-র চরিত্রটির অভিনয় ভিন্ন এই নাটকের আকর্ষণীয় আর কিছুই ছিল না; এমন কি লাল কুঁয়ারের চরিত্রটিতে অভিনয় করবার জন্য তিনি একটি সুশ্রী নবীনা অভিনেত্রীর সন্ধান পর্যন্ত করেন নি। শ্রীরঙ্গমে তাঁর আর একটি কীর্তি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের পুনরভিনয়। অপরেশচন্দ্র তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন: "সিরাজদ্দৌলা পুলিশ হইতে পাশ করাইবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাণ্ডুলিপির বহু স্থানে গিরিশচন্দ্র অদল-বদল করিতে বাধ্য হন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পুলিশ অফিসে ধরণা দিতে হয়। সেই দিন অদল-বদলের মধ্যস্থ হয়েন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত জলধর সেন ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।" এই নাটক সেদিন পিতাপুত্র এক সঙ্গে মিনার্ভার মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন; গিরিশচন্দ্র করিমচাচা আর দানিবাবু সিরাজ। কথিত আছে, সে অভিনয়ের অন্যতম দর্শক ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। মিনার্ভায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ছিল ১৩১২, ২৪শে ভাদ্র। তখন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ছিলেন মনোমোহন পাঁড়ে। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন এই নিষিদ্ধ নাটকখানি রাহুমুক্ত হয়ে শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হোল তখন শিশিরকুমার ছিলেন নেপথ্যে। সিরাজদ্দৌলা ও করিমচাচার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে তাঁর দুই অনুজ—মুরারি ভাদুড়ী ও

ভবানী ভাদুড়ী। করিমচাচার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র। ভবানীকিশোর সেই কঠিন ভূমিকাটি শিশিরকুমারের শিক্ষা-নৈপুণ্যে মঞ্চে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছিলেন। আর আলিবর্দি বেগমের কঠিন ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা আশ্চর্য অভিনয় করে 'লেডি আলমগীর' বলে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীরঙ্গমে 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় হয় ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে। সিরাজের ভূমিকায় মুরারিবাবুর অভিনয়ও ভালো হয়েছিল। পরে শিশিরকুমার স্বয়ং সিরাজ-চরিত্রের রূপদান করেছিলেন। তবে এ নাটকও চলে নি।

শ্রীরঙ্গমে 'বিপ্রদাসের' উদ্বোধন হয় ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ সালে। সে-বছর 'বিপ্রদাস'ই সবচেয়ে বেশি দর্শক আকর্ষণ করেছিল, অথচ এ নাটকে শিশির-কুমার পাদপ্রদীপের সামনে অনুপস্থিত ছিলেন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসকে নাটকে রূপায়িত করেন বিধায়ক ভটাচার্য এবং তাকে মঞ্চোপযোগী করে দেন স্বয়ং শিশিরকুমার। শুধু তাই নয়। উদ্বোধন বাসরে এবং পরবর্তী দুইটি অভিনয়ের প্রাক্কালে তিনি তাঁর থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর অনুজ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হাতে শ্রীরঙ্গমের ভার ন্যস্ত করে নাট্যজগৎ থেকে তিনি সাময়িক অবসর গ্রহণ করেন। সে-বছর 'বিপ্রদাসে' যে জনসমাগম এবং শ্রীরঙ্গমে যেরূপ অর্থাগম হয়েছিল, তা নাট্যমন্দিরের প্রথম অর্ঘ্য 'সীতা'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাটকের বিপ্রদাস, রায়সাহেব, দ্বিজদাস ও বন্দনার ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য ও মলিনা দেবী। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার দু'একবার বিপ্রদাসের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন এবং বন্দনার ভূমিকায় কয়েক রাত্রির জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এযুগের সবচেয়ে প্রিয়দর্শনা ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সীতা দেবী। তুলনায় সীতাদেবী অভিনীত বন্দনাই উল্লেখযোগ্য।

'পরিচয়' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'পরিচয়'ও শিশিরকুমারের একটি দুঃসাহসিক নাট্যপ্রয়াস, কারণ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এই

নাটকখানি গতানুগতিক সামাজিক নাটক নয়। এই নাটকে রায়বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুজ্যের ভূমিকা শিশিরকুমারের নটজীবনের বহু অবিস্মরণীয় ভূমিকার মধ্যে একটি। অনুজ ভবানীকিশোরও এই নাটকে ডাঃ আলির চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ অভিনেতা কমল মিত্রের অভিনয়ও নিখুঁত হয়েছিল। এই নাটকের প্রযোজনাও ছিল অদ্ভুত। তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রশ্ন' নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি। শ্রীরঙ্গমে ইহাই শেষ নূতন নাটক এবং এই নাটকের নীতীনের ভূমিকাই নূতন নাটকে শিশিরকুমারের শেষ ভূমিকা গ্রহণ। এই নাটকের নূতনত্বের মধ্যে ছিল এই যে, নাটকখানি অভিনীত হোতে সময় নিত মাত্র একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট। নীতীনের ভূমিকায় শিশির-কুমার ও মণিকার ভূমিকায় সরযূবালা অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই নাটকে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মুরারি ভাদুড়ী, রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল ঘোষ, বিনয় বোস, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুধীর দে, রেবা ও লীলা। শ্রীরঙ্গমের তখন যে অত্যন্ত দৈন্য অবস্থা চলছে তা বোঝা গেল সংবাদপত্রে এই নূতন নাটকের বিজ্ঞাপন দেখে। মাত্র ২ ইঞ্চি এক কলমের মধ্যে নাটকখানি বিজ্ঞাপিত হয় কাগজে। এই নাটকের প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, "আধুনিক কালে আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে পুরাতন নাট্যরীতিকে অনুসরণ না করে আধুনিক নাটক কি করে অভিনীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এতে।"

এইসব বিভিন্ন নূতন নাটক মঞ্চস্থ করা ভিন্ন শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার যেসব পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন এই চৌদ্দ-পনর বছরের মধ্যে সেগুলির তালিকার মধ্যে আছে, সীতা, আলমগীর, প্রফুল্ল, চন্দ্রগুপ্ত, সধবার একাদশী, জনা, খাসদখল প্রভৃতি। নাট্যমন্দির ও নব নাট্য-মন্দিরে শিশিরকুমার কখনো অমৃতলালের কোনো নাটক মঞ্চস্থ করেন নি। শ্রীরঙ্গমেই প্রথম তিনি রসরাজের প্রসিদ্ধ কৌতুকনাট্য 'খাসদখলে'র পুনর-ভিনয় করেন। নিতাই-এর ভূমিকায় শিশিরকুমার অপূর্ব অভিনয় করে-ছিলেন। বিগতযুগে এই ভূমিকার অভিনয়ে অমর দত্তের খুব সুখ্যাতি ছিল। শ্রীরঙ্গমের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা 'আলমগীর'

নাটকের ত্রিংশ বর্ষব্যাপী অভিনয়ের উৎসব। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর। আবার ঐ তারিখেই মঞ্চে শিশিরকুমারের ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়। মঞ্চে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ায় নাট্যাচার্য তাঁর সহকর্মী, সুহৃদ ও অনুরাগীদের আমন্ত্রণ করে 'আলমগীর' নাটকাভিনয় দ্বারা তাঁদের আপ্যায়িত করেন এবং অভিনয়ের আরম্ভে শিশিরকুমার মঞ্চে তাঁর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তিনি এটাকে বিবৃতি না বলে বলেন 'কৈফিয়ৎ' (এটি পরিশিষ্টে দেওয়া হোল)। সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জীবনের এই ত্রিশ বছর তিনি এই একটি চরিত্র সমানে অভিনয় করে এসেছেন, এ-কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। এমন দৃষ্টান্ত বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই প্রথম। শিশিরকুমার তাই বলতেন—"আলমগীর অভিনয়ে আমার ক্লান্তি আসে না—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এর অভিনয় করে যাব।" করেছিলেনও তাই।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি। শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমকে কেন্দ্র করে বাংলার নাট্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক বেদনার ইতিবৃত্ত রচনা করে রাখলো এই দিনটি। ২২শে জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমে 'মিশরকুমারী' অভিনীত হোল। আবন—শিশিরকুমার; সামন্দেশ—ছবি বিশ্বাস। সোমবার, ২৩শে জানুয়ারি—শিশিরকুমারের জীবনে একটি প্রিয় তারিখ। প্রতি বৎসরই তিনি সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি পালন করতেন থিয়েটারে। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হোল না। সেদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথমোহন বসু, পূর্ণচন্দ্র রায়। সাধারণ মঞ্চে শিশিরকুমারের সেই শেষ বক্তৃতা। সেদিন 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হোল; চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার। পরদিন মঙ্গলবার, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫৬ (বাংলা ৭ই মাঘ, ১৩৬৩) শ্রীরঙ্গমের বিশেষ অভিনয় 'প্রফুল্ল'। বিভিন্ন ভূমিকায় শিশিরকুমার, ছবি বিশ্বাস, নিভাননী, রাণীবালা, রেবা, শেফালিকা প্রভৃতি। এই তিনদিনের অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তির নীচে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" হিসাবে বলা হয়েছিল: "এই কয়দিন অভিনয়ের পর কিছুকালের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকিবে।" জনসাধারণ এর অর্থ বুঝতে পারে নি। সেই 'কিছুকাল' সাধারণ

মঞ্চে 'চিরকাল' হোয়ে রইল। অভিনয়ের শেষ যবনিকা নেমে এলো—সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের নট-জীবনের যবনিকাপতনও দর্শকগণ যেন বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারকে আর দেখা গেল না। সাধারণ নাট্যশালায় শিশিরকুমারের সেই শেষ অভিনয়। এবং শেষ অভিনয় হিসাবে তিনি যে নাটকখানি নির্বাচন করেছিলেন, তার চেয়ে ভালো আর কোনো নাটক নির্বাচিত হোতে পারত না। সেদিন মঞ্চে শিশিরকুমারের সাজান বাগান সত্যই শুকিয়ে গেছে। ২৭শে জানুয়ারি তাঁকে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে আসতে হয়। নাট্যশালায় যাঁর জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে নাট্যশালার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, বাংলার রঙ্গমঞ্চকে যিনি এক নূতন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, জীবন-সায়াহ্নে এসে শ্রীরঙ্গম থেকে শিশিরকুমারের এইভাবে বিদায় গ্রহণ খুবই দুর্ভাগ্যের কথা নয় কি? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, শ্রীরঙ্গমে শেষ অভিনয় রজনী ঘোষণা করা হয় নি, কারণ শিশিরকুমারের ধারণা ছিল—ওটা ভিক্ষারই নামান্তর। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র, দিগ্বিজয়ী নাদির শা আর ভূ-বিজয়ী আলমগীর আর যাই হোন, ভিক্ষুক হতে পারেন না।

॥ ১৩ ॥ সমসাময়িক বাংলা থিয়েটার ॥ (২)

বিংশ শতকের তৃতীয় দশককে আমরা বাংলা থিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় পর্ব বলতে পারি। এই পর্বেই আমরা নাট্যশালার যে উন্নতি লক্ষ্য করি তার স্থিতিকাল এই শতকের পঞ্চদশক পর্যন্ত—অর্থাৎ একটানা বিশ বছর। এই দ্বিতীয় পর্বেই আমরা যেমন একাধিক রঙ্গালয় পেয়েছি, তেমনি একটি-দুটি করে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও পেয়েছি, দুই-একজন নাট্যকার পেয়েছি, কিছু ভাল নাটক (সাহিত্য হিসাবে না হোক, মঞ্চ-সফলতার উপযোগী নাটক) পেয়েছি। ষ্টেজ টেকনিকের ক্ষেত্রেও এই সময়েই আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করি বাংলা থিয়েটারে। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, রাণীবালা, সরযূবালা, রেবা, বন্দনা, অপর্ণা, শান্তি গুপ্তা, প্রভৃতি এই দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেই পড়েন। নাট্যনিকেতন, নবনাট্যমন্দির, রঙমহল প্রভৃতি রঙ্গালয়ের প্রত্যেকেই এই সময়ে কিছু না কিছু নূতন মুখ মঞ্চে আমদানী করেছেন। এই পর্বে নায়ক হিসাবে, কি চেহারা, কি অভিনয় সকল দিক দিয়েই আদর্শ ছিলেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙমহলে 'মহানিশা' নাটকেই এঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে সাধারণ থিয়েটারে। আবার এই দ্বিতীয় পর্বে নাট্যপ্রয়াসও কম বৈচিত্র্য-মণ্ডিত নয়। শহরে দুটি নূতন রঙ্গালয়ের নূতন ভবন এই সময়কার ঘটনা। চিৎপুরে দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রঙ্গমহল থিয়েটার ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটে চীপ থিয়েটার সেদিন সত্যই থিয়েটার জগতে নূতন ধরণের প্রয়াস ছিল। ভূতপূর্ব এ্যালফ্রেড মঞ্চে নাট্যভারতীও এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসাবে পরিগণিত হবে। পুরাতন ষ্টার ও মিনার্ভা ত ছিলই। অপরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক বৎসর ষ্টার থিয়েটারের ইতিহাস বিশেষ গৌরবজনক নয়, অন্ততঃ প্রগতিমূলক নাট্যপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে ত নয়ই। বিষয়বস্তুর নূতনত্বের দিক দিয়ে এই সময়কার ষ্টারের উল্লেখযোগ্য দান চারটি, 'মহারাজা নন্দকুমার', 'রাণী ভবানী', 'টিপু সুলতান' আর 'রণজিৎ সিংহ'। এই

চারখানি নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল, সবচেয়ে ভাল হয়েছিল 'নন্দকুমার'। মোটের ওপর নবযুগের এই দ্বিতীয় পর্বের কেন্দ্রে শিশির-প্রতিভা ছিল বলেই সমসাময়িক নাট্যচেতনা ও নাট্যপ্রয়াস এমন প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা সেই ইতিহাসই সংক্ষেপে বলব।

বাংলা নাট্যশালার নবযুগের দ্বিতীয় পর্ব রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। সেই যে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন, সেই ধারা অর্থাৎ রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের নাটকের ধারা বিশ শতকের পঞ্চ দশক পর্যন্ত চলে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতন বোধহয় শরৎ-চন্দ্রের আর কোন উপন্যাসই অভিনীত হতে বাকী নেই। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলার নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে লিখেছেন: 'আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের যত নাটক অভিনীত হয়েছে, নাট্যাচার্যের নাট্য-মন্দিরেও তত নাটকই অভিনীত হয়েছে। নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছে 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'তপতী'। আর আর্ট থিয়েটারে হয়েছে 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ'। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে নাট্যাচার্য যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্র-নাটকে সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে তিনি আর্ট থিয়েটারের অভিনয়কে ম্লান করে দিতে পারেন নি। আর্ট থিয়েটারের তিনখানি রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ই নিরুপম হয়েছিল। আবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও নাট্যাচার্যই তাদের অভিনয়কে অনুপম করে তোলেন। 'পল্লীসমাজ' ষ্টারে যা অভিনীত হয়, 'রমা' রূপ নিয়ে নাট্যমন্দিরে তার তুলনায় অনেক ভালো অভিনীত হয়।" বাংলা থিয়েটারে একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিগত যুগের গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্ধেন্দু, অমর দত্ত প্রভৃতি শক্তিমান অভিনেতা, এ যুগে তেমনি একা শিশিরকুমারই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের সংযোগকে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁর সেই আদর্শ এই দ্বিতীয়পর্বে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে একাধিক নাট্যমঞ্চে। মঞ্চে শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্ভাব্যতা শিশিরকুমারই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন

এবং সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপকে অবলম্বন করে যে নূতন উদ্দীপনা দুই যুগ ধরে চলেছিল, সে ইতিহাস মনে রাখবার মতন। শিশিরকুমার পথ না দেখালে মঞ্চে তারাশঙ্করের আবির্ভাব সহজ হোত না।

নবযুগের দ্বিতীয় পর্বের একটু আগে বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে নজরুল-প্রতিভার সংযোগ সাধনের গৌরব তখনকার নবীন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরই প্রাপ্য। যদিও নজরুল-প্রতিভার প্রতি শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তথাপি তিনি তার কোন সুযোগই গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অনাদি বসু যখন সাময়িকভাবে মনোমোহন থিয়েটার গ্রহণ করেন, তখন তিনি শচীনবাবুর 'রক্তকমল' মঞ্চস্থ করেন। 'রক্তকমল' শচীনবাবুর প্রথম নাটক এবং সে-নাটকে অভিনবত্ব ছিল অনেক, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তো বটেই, আঙ্গিকের দিক দিয়েও সে-নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা ষ্টেজে দু' ঘণ্টা পনর মিনিটের নাটক সেই প্রথম ; এর অনেক পরে শ্রীরঙ্গমের 'প্রশ্ন' নাটক। 'রক্তকমলে'র চারখানি গানই নজরুলের লেখা এবং এই গানই ছিল নাটকের প্রধান আকর্ষণ। ইন্দুবালার কণ্ঠে নজরুলের গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেদিন। তারপর থেকে বাংলা থিয়েটারের একাধিক নাটকে নজরুলের গান পরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবেই সেদিন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ নাট্যশালার যোগাযোগ হওয়ার ফলে থিয়েটারের অগ্রগতি হয়েছিল বিস্ময়কর।

নবযুগের দ্বিতীপর্বের আর একটা স্মরণীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় প্রয়োগব্যবস্থার ক্ষেত্রে। অভিনয়রীতি ও প্রয়োগপদ্ধতিতে যে যুগান্তর শিশির-প্রতিভা এনে দিয়েছিল, সেই ধারাকে আরো উন্নততর, আরো আধুনিক করে তুললেন সতু সেন। বাংলা থিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দশ-বারো বৎসর (১৯৩০ থেকে ১৯৪২) নাটকের প্রযোজনা ক্ষেত্রে সতু সেনের প্রতিভা-ই সমধিক সক্রিয় ছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হোল ঘূর্ণায়মান বা revolving ষ্টেজ। রঙমহলে 'মহানিশা' নাটকে বাঙালি দর্শক সেই প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ চাক্ষুষ করল।

এই নূতন ধরণের ষ্টেজ দৃশ্য-পরিবর্তনে অনেকখানি সহায়তা করল এবং সমগ্র অভিনয়কে অভূতপূর্ব গতিবেগে সমৃদ্ধ করল। সামাজিক নাটকের সেট-সেটিংসের ক্ষেত্রেও সতু সেন বাস্তবতা এনে দিয়েছিলেন, যেমন তিনি এনে দিয়েছিলেন মুড-লাইটের ব্যবহারে। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন—"সমগ্রভাবে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে আলোর ব্যবহার অভিনয়কে এবং নাটককে কত বেশি মর্মস্পর্শী করে, সতু সেন তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন···সতু সেনের কৃতিত্ব আরো স্বীকার করতে হয় এই কারণে যে, আলো কি করতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন থিয়েটারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একান্ত অভাব সত্ত্বেও।"

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকৃতপক্ষে দুটি থিয়েটার—মিনার্ভা ও ষ্টার। এই বছরের শেষভাগে দেখা গেল অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টারের ম্যানেজার। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশের ডাক' তখন মিনার্ভার আকর্ষণ। চারুশীলা তখন এইখানে। সেই বছর অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' মঞ্চস্থ করে আর্ট থিয়েটার নাট্যামোদী মহলে তুমুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন। অপরেশ-চন্দ্রই এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এই নাটকের বাণী, অম্বর ও মথ্‌রো—এই তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুভূষণ ও তিনকড়ি চক্রবর্তীর অভিনয়ই ছিল পরম উপভোগ্য। ষ্টারে 'মন্ত্রশক্তি' 'কর্ণার্জুনে'র জনপ্রিয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেদিন। তারপর ১৯৩১-এর অক্টোবরে অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটকে চাপাল-গোপালের ভূমিকায় দানিবাবুর অভিনয়ই ছিল প্রধান আকর্ষণ। পুরাতন নাটকের মধ্যে এখানে তখন পূজার আসরে 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'প্রফুল্ল'র অভিনয় হোত। দানিবাবুর শেষ বয়সে তাঁর লুপ্ত প্রতিভার বিকাশের সুযোগ দিয়ে আর্ট থিয়েটার সেদিন একটা বড়ো কাজ করেছিলেন। ১৯৩৩ (বাংলা ১৩৪০) খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তিনটি থিয়েটার রঙমহল, মিনার্ভা ও নাট্যনিকেতন। এই সময়টা বাংলা থিয়েটারে অনুরূপা দেবীর সময় বলা চলে—'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা'—প্রায় একসঙ্গে শহরের তিনটি রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে দর্শকসমাজে বেশ একটা সাড়া এনে দিয়েছিল। 'মন্ত্রশক্তি' ও 'মহানিশার' সাফল্য তো

প্রবাদবাক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রঙমহল এই একখানি নাটক মঞ্চস্থ করেই খ্যাতিলাভ করে। 'মহানিশা'র বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, ভূমেন রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, চারুবালা, শেফালিকা, রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রভৃতি। নাট্যরূপ ছিল যোগেশচন্দ্রের আর প্রযোজনা সতু সেনের। নাট্যনিকেতন 'ঝড়ের রাতে', 'জননী' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে যখন আসর জমাতে পারলেন না, তখন তাঁরা কিছুকাল 'সাজাহান', 'চন্দ্রশেখর', 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি পুরাতন নাটক দিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। তারপর 'মহানিশা'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবোধচন্দ্র গুহ অনুরূপা দেবীর 'মা' নিয়ে (১৩৪০, পৌষ) আত্মপ্রকাশ করলেন। 'জননী' নাটকে নাট্যনিকেতনে সর্বপ্রথম ওয়াগন ষ্টেজ (wagon stage) ব্যবহৃত হয়। তখন নাট্যনিকেতনের অভিনেতৃসংঘের মধ্যে ছিলেন অহীন্দ্র, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ, মনোরঞ্জন, চারুশীলা, সুশীলাবালা, নীহারবালা, শৈলেন চৌধুরী, কুসুমকুমারী, রাণীবালা প্রভৃতি। 'মা' নাটকও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রঙমহলে এই সময় (ডিসেম্বর, ১৯৩৩) মন্মথ রায়ের 'অশোক' মঞ্চস্থ হয়। সেদিনের রঙমহলে 'অশোক' একটি বিফল প্রয়াস হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। এরপর 'বাঙলার মেয়ে' রঙমহলের একটি সার্থক দান। মিনার্ভায় তখন পৌরাণিক ধারায় পুরাতনের রোমন্থন চলছে—'বামনাবতার'।

১৯৩৩-এর কলিকাতায় নাট্যনিকেতনের একটি প্রয়াস 'চক্রব্যূহ' নাটক। পৌরাণিক নাটক, এর রচয়িতা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। 'চক্রব্যূহের' প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩ (বাংলা ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১)। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নির্মলেন্দু, অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, সন্তোষ সিংহ, সন্তোষ দাস, গণেশ গোস্বামী, ললিত মিত্র, চারুশীলা, সরযূবালা, নিরুপমা, তারাসুন্দরী, ঊষাবতী, দুর্গারাণী, নীহারবালা প্রভৃতি। দৃশ্য-পরিকল্পনায় ছিলেন চারু রায়; গান ও সুর নজরুল আর নৃত্য-পরিকল্পনায় নীহারবালা। 'চক্রব্যূহ' নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল 'শকুনি'। এই ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়, 'কর্ণার্জ্জুনে' শকুনির 'ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয়কেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। 'ম্যাস-

পুটিন' চিত্রে লায়নেল ব্যারিমুর নাম-ভূমিকায় যেরকম অভিনয় করেছিলেন, অহীন্দ্রবাবুর শকুনি ঠিক সেই height-এ উঠেছিল বলা চলে। 'শকুনি'-ই এই নাটকের প্রধান চরিত্র এবং রঙ্গমঞ্চে শকুনির প্রাধান্যই ফুটে উঠেছিল অবলীলাক্রমে তাঁর অভিনয়ে। নাট্যকার-পরিকল্পিত শকুনি-চরিত্রটিকে তিনি রঙ্গমঞ্চের ওপর বিচিত্রভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন। হাস্যরসের আবরণে কুরুকুল বিদ্বেষ, পিতৃঅস্থি-নির্মিত পাশাকে বক্ষে ধারণ করে প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সম্পাদনের গোপন চেষ্টা—অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি। বাংলা থিয়েটারের নবযুগে বহু স্মরণীয় ভূমিকাভিনয়ে মধ্যে অহীন্দ্রবাবুর শকুনি একটি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ রঙ্গমঞ্চের আর একটি শকুনির উল্লেখ করতে হয়—তিনি নৃপেশচন্দ্র রায়। নাট্যমন্দিরে 'নর-নারায়ণ' নাটকে শকুনির ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। তবে শকুনির চরিত্র-চিত্রণে ক্ষীরোদপ্রসাদ বা মনোরঞ্জন অপেক্ষা অপরেশচন্দ্রই সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন তাঁর 'কর্ণার্জুন' নাটকে এবং সেই ভূমিকায় অভিনয় করেই নরেশ মিত্র তাঁর নটজীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

নাট্যনিকেতনের যিনি অধিকারী ছিলেন সেই প্রবোধচন্দ্র গুহ বাংলা থিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবান প্রযোজকই ছিলেন না, আর্ট থিয়েটারের অভিজ্ঞতাকেও তিনি নাট্যনিকেতনের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন; এঁর থিয়েটারেও বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজনের সমাগম হোতে দেখেছি। থিয়েটারের ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন সত্য, কিন্তু শিল্পকে হত্যা করে তিনি ব্যবসা করেন নি। প্রত্যেক নাটকেই তিনি অজস্র খরচ করতেন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। থিয়েটারে showmanship জিনিসটি তিনি খুব ভাল বুঝতেন এবং নাট্যনিকেতনে অভিনীত প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকেই তিনি এর পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটকই তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। নূতন নাট্যকার, নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্ধানেও তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ছবি বিশ্বাস ও জহর গাঙ্গুলী

তো নাট্যনিকেতনেরই আবিষ্কার। নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে নাট্যনিকেতনের স্মরণীয় নাট্যপ্রয়াস হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গোরা' নবনাট্যমন্দিরে 'যোগাযোগে'র সমসাময়িক। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের নাটক করছেন শুনে প্রবোধ গুহও নিশ্চিন্ত রইলেন না। এই প্রসঙ্গে সুধীর গুহ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন আমার কাছে। সুধীরবাবু বলেছেন:" আমরা যখন 'গোরা' করব ঠিক করেছি সেই সময়ে একদিন সকালে শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। তিনিও তখন 'যোগাযোগ' মহলায় ফেলেছেন। ষ্টারের বারান্দা থেকেই তিনি আমাকে বললেন—'সুধীর, তোমরা নাকি 'গোরা' করছ?' আমি বললাম, হ্যাঁ।—'কে ডাইরেক্ট করবে, dramatise করল কে?' আমি বললাম, 'গোরা'র নাট্যরূপ নরেশদা' দিয়েছেন, তবে কবি দেখে দিয়েছেন। আর ডাইরেকশান আমাদের দুজনার, আমার ও নরেশদা'র। শিশিরবাবু, বললেন, 'তোমাদের সাহস তো বড় কম নয়। জানো, রবিবাবুর নাটক করা মানেই লোকসান দেওয়া; তবে প্রবোধবাবু আমার মতনই দুঃসাহসী।' শিশিরবাবুর কথাই ঠিক হয়েছিল। 'গোরা' মঞ্চস্থ করে আমরা নাম করেছিলাম, কিন্তু খুব জোর 'মার' খেয়েছিলাম। 'কেদার রায়ে'র saleও গোরার চেয়ে বেশি ছিল।" 'গোরা'র বিফলতার কারণ, আমার মতে, এর নাট্যরূপের দুর্বলতা, নাটক compact হয়নি, আর নাম-ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয়ও আশানুযায়ী হয়নি।

নাট্যনিকেতনের আর একটি স্মরণীয় দান 'সিরাজদ্দৌলা'। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই ঐতিহাসিক নাটকখানি নামভূমিকায় বাণী-বিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মর্মস্পর্শী অভিনয়ের গুণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই নাটকে লুৎফার ভূমিকায় অভিনয় করে সরযূবালা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৯শে জুন, ১৯৩৮। পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্মলেন্দু। ভূমিকালিপি এইরকম ছিল: সিরাজ—নির্মলেন্দু; গোলাম হোসেন—রবি রায়; রাজবল্লভ—মণি ঘোষ; মীরজাফর—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; জগৎশেঠ—কুঞ্জলাল সেন; মিরণ—

নরেন চক্রবর্তী ; ওয়াটশ—ভূপেন চক্রবর্তী ; ফাদার লঙ—নরেন চক্রবর্তী ; আলেয়া—নীহারবালা ; লুৎফা—সরযূবালা এবং ঘসেটি—নিরুপমা।

এর পর নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয় মন্মথ রায়ের "মীরকাশিম" ; নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু এ-নাটক বেশিদিন চলেনি।

বাংলা থিয়েটারে গিরিশযুগ থেকে আরম্ভ করে শিশিরযুগ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অনুরূপাদেবী, তারাশঙ্কর প্রভৃতি লেখক-লেখিকার একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছে ; কিন্তু সবক্ষেত্রেই সমান সফলতা অর্জন করেনি। এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা এখানে বলব। উপন্যাসের নাট্যরূপ বিষয়টা অনেকে ঠিকমত বোঝেন না। নাটকে অনেক সময় নূতন ঘটনা বা situation তৈরি করে নিতে হয় যা হয়ত মূল উপন্যাসে থাকে না। তা করা হয় নাটকেরই প্রয়োজনে। উপন্যাসের ধারা যে পথ ধরে সহজে চলতে পারে, নাটকের ধারা ঠিক সে পথ ধরে চলে না। উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে নাটক দেখতে বসলে তাই কেবলই মনে প্রশ্ন উঠবে উপন্যাসে তো এ ঘটনা নেই। কিন্তু উপন্যাসে যেখানে যে ঘটনা থাকে, নাটকে সেখানে হয়ত অন্য ঘটনার প্রয়োজন হয়। উপন্যাসের নাট্যরূপ উপন্যাসের সংলাপ-সমন্বিত রূপ নয়। নাটক একসঙ্গে গল্প এবং সেই গল্প কেমন করে কাদের নিয়ে গড়ে উঠল তারই প্রকাশ। উপন্যাসের চেয়ে নাটকের কাজ বেশি, বাহন বেশি অথচ সময় কম। Reproduction নয়, interpretationই হচ্ছে নাটকের কাজ। নাটকে উপন্যাসের পরিবর্তন তাই অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসে পাঠকদের মনে যে-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, নাটকের ছকে পড়ে দর্শকদের সম্মুখে তা ম্লান হয়ে গেছে। এর বড় দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ' ও 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'ষোড়শী' ও 'রমা' গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত নূতন নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ নয়। তাই এ দুখানি নাটকের অভিনয় দেখে দর্শকরা তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু নাটকাকারে রূপান্তরিত, 'বিরাজবৌ', 'বিজয়া', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেবদাস' তাদের হতাশ করেছে। উপন্যাসের কিরণময়ী নাটকে উপেন-

সতীশের দীপ্তির সম্মুখে নিষ্প্রভ হয়। 'পথের দাবী'র সকল দাবীই নাট্য রূপের ত্রুটির জন্ত নিস্ফল হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটক; 'রাজা ও রাণী' নাট্যকাব্য, কিন্তু 'তপতী' অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক। উপন্যাস কখনো পোষাক বদল করে নাটক হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ সে যুগের দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল—তখন উপন্যাসও ছিল নূতন, নাটকাভিনয়ও নূতন। উপন্যাসের চরিত্রকে নাটকের চরিত্রে দাঁড় করান খুবই কঠিন; শিশিরকুমারকে তাই 'বিজয়া' নাটকে রাসবিহারী চরিত্রটির মুড (mood) বদলাতে হয়েছিল নাটকখানিকে দাঁড় করাবার জন্য।

নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে রঙমহল এক নবীন নাট্যকারকে আবিষ্কার করেন। তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্য। সাধারণ মঞ্চে তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক 'মেঘমুক্তি'। বিধা‹কের 'রক্তের ডাক' ও 'বিশ বছর পরে' রঙমহলের আর দুখানি উল্লেখযোগ্য production—'রক্তের ডাক' নাটকে দুর্গাদাসের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। দুর্গাদাস ভিন্ন বিধায়কের নাটক আর কেউ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে তখন অভিনয় করতে পারতেন না। 'নন্দরাণীর সংসার', 'পতিব্রতা', 'চরিত্রহীন', 'মাইকেল', 'ভোলামাষ্টার' প্রভৃতি রঙমহলের উল্লেখযোগ্য দান। শেষের তিনখানি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিল। রঙমহলে 'চরিত্রহীনে'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় কলিকাতার পাঁচটি রঙ্গমঞ্চে এই নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল: শ্রীরঙ্গমে: জীবনরঙ্গ, উড়োচিঠি, মাইকেল, দেশবন্ধু; রঙমহলে: মাইকেল, ভোলামাষ্টার; মিনার্ভায়: মাটির মায়া, চিরন্তনী, খুনী; নাট্যভারতীতে: দুইপুরুষ ও পথের ডাক এবং ষ্টারে মহারাজা নন্দকুমার। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নূতনত্ব পরিবেশন করতে প্রত্যেকটি রঙ্গালয় এই সময় সচেষ্ট ছিলেন। রঙমহলে 'মাকড়সার জাল' ও মিনার্ভায় 'চিরন্তনী' নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে বোধ হয় প্রথম ক্রাইম ড্রামা। রঙমহলে 'মাইকেলে'র নাম ভূমিকায় ছিলেন অহীন্দ্রচৌধুরী, আর শ্রীরঙ্গমে ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার। রঙমহলের মাইকেল সর্ব-

শ্রেণীর দর্শককে খুশি করেছিল, আর শ্রীরঙ্গমের মাইকেল কেবল এক শ্রেণীর দর্শককে আকর্ষণ করেছিল। শ্রীরঙ্গমের মাইকেল নাটকের যা কিছু ত্রুটি তা হলো পঞ্চকোটের নাচের দৃশ্য আর প্রথম অঙ্কের অতি দীর্ঘতা। রঙমহলে অহীন্দ্র চৌধুরীর মাইকেল প্রায় প্রতি দৃশ্যেই প্রেক্ষাগৃহের করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল। তাঁর এই সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য—emotion। এই প্রসঙ্গে শচীন বাবু সত্যই মন্তব্য করেছেন: "তিনি নাটকের ইমোশানকে অন্তরে আকর্ষণ করে ঝড়ের গতি দিয়ে তা মন থেকে মনান্তরে ছুটিয়ে দেন। সমগ্র প্রেক্ষাগার আন্দোলিত হয়ে ওঠে। ইমোশন বড় সংক্রামক। সংক্রমণ কৌশল শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কৌশল। এই কৌশল আয়ত্ত করেই অহীন্দ্র চৌধুরী বহু নাটকে জয়মাল্য নিয়ে তাকে সফল করে তুলেছেন।" পুরাতন যুগের 'রিজিয়া' নাটকের পুনরভিনয় রঙমহলেও হয়েছিল ১৯৪৯—৫০শে; রিজিয়ার কঠিন ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন রাণীবালা আর বক্তিয়ারের ভূমিকা অহীন্দ্র চৌধুরী।

নাট্যনিকেতনের শেষ পর্যায়ে (১৯৩৭) যশোদানারায়ণ ঘোষের স্বত্বাধিকারিত্বে এখানে ক্যালকাটা থিয়েটার্স স্থাপিত হয়। ক্যালকাটা থিয়েটার্সের প্রথম নাটক সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'মোগল-মসনদ'। এর বছর দুই পরে নাট্যনিকেতনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং তারই ধ্বংসাবশেষের ওপর স্থাপিত হয় শিশিরকুমারের সর্বশেষ নাট্যপ্রয়াস—শ্রীরঙ্গম। নাট্যনিকেতন উঠে যাবার পর শ্রীরঙ্গম ও নাট্যভারতীর আবির্ভাব। আগে শ্রীরঙ্গম, পরে নাট্যভারতী। নাট্যভারতীর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র এবং গোড়ার দিকে পরিচালনার ভার ছিল সতু সেনের ওপর। একসময়ে অর্থাৎ মেট্রোপলিটানে অধ্যাপক থাকা কালীন শিশিরকুমার শিশির মল্লিকের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে মল্লিক মশাই ইংরেজি পড়তেন। নাট্যভারতীর উদ্বোধনী নাটক তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' তখন অভিনয় ও প্রযোজনার গুণে অসম্ভব সফলতা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, প্রভা, অঞ্জলি, ছায়া প্রভৃতি। নাট্যভারতীর পরবর্তী production-গুলির মধ্যে 'পথের ডাক', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও মুক্তি',

'ধাত্রীপান্না' ও 'দেবদাস' উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের 'পথের ডাক' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৩ এবং এই নাটকে একটি অধ্যাপকের ভূমিকায় (ডাঃ চ্যাটার্জি) বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনাথ তখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে নাট্যভারতীতে যোগদান করেছেন এবং শিশিরকুমারের আওতার বাইরে এই তাঁর প্রথম অভিনয়। শেষের চারখানি শচীন্দ্র সেনগুপ্তের নাটক; শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'র নাট্যরূপ তিনিই দিয়েছিলেন। 'ধাত্রীপান্না' নাট্যভারতীর শেষ নিবেদন। এই নাটকখানিও বেশ জনপ্রিয় হয়। নাট্যভারতীতে দশটি অভিনয়ের পর, এর দরজা বন্ধ হয় (১৯৪৪)। পরে মিনার্ভায় নাটকখানির পুনরভিনয় হয়েছিল। এই নাটকের বিশেষত্ব ছিল এই যে, নাটকে কোন অঙ্কিত দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় নি, অথবা নাচগান দিয়ে নাটকের গতিকে ব্যাহত করা হয় নি। অভিনয়ই যে নাটকের সবচেয়ে বড় বিষয় তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল এই নাটকে। দেবদাসের নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, বসন্তের ভূমিকায় নির্মলেন্দু, চুনিলালের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্বতীর ভূমিকায় সরযূবালার অভিনয় সেদিনের সর্বোত্তম অভিনয় ছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া যে বইখানির চিত্ররূপ দিয়ে চিত্রজগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন এবং নাম-ভূমিকায় পর্দায় অভিনয় করে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, শচীন বাবুর দেবদাসের নাট্যরূপ বা ছবি বিশ্বাসের দেবদাস সেই তুঙ্গতাকে স্পর্শ করতে পারে নি কিন্তু।

১৯৪৩-৪৪ সালে রঙমহলে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' (যার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত) এই সময়কার আর একটি সুখ্যাত নাটক। এর অভিনয় ও প্রযোজনা দুই-ই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই সময়টা (১৯৫০-৫১) ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। কলিকাতার প্রায় সকল থিয়েটারের আর্থিক অবস্থার তখন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে লিপ্ত থাকার দরুণ লোকের হাতে পয়সার সচ্ছলতা আর amusement-প্রীতি—প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে রঙ্গালয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে নাট্যভারতী এই সময় উঠে গেল কেন? প্রগতিশীল থিয়েটার বলেই নাট্য-ভারতী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ব্যর্থতা বা ব্যবসায়ের অসাফল্য এই

নূতন রঙ্গালয়ের উঠে যাবার কারণ নয়। সিনেমার প্রতিযোগিতাই ছিল এর প্রত্যক্ষ কারণ। এই সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারকে এই যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং মঞ্চের ওপরও ধীরে ধীরে সিনেমার প্রভাব এসে পড়ে। তাই পরবর্তীকালে মঞ্চের নাটকে সিনেমার কৌশল দেখা গেল। এই সময়কার থিয়েটারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল: (১) "অভিনয় থেকে আতিশয্য বর্জন করবার একটা প্রয়াস; (২) নাটককে কেন্দ্রানুগ করবার চেষ্টা; (৩) দৃশ্যপট ও আবহকে (আলো ও সঙ্গীতের সাহায্যে) নাটকের মূল রসানুযায়ী করে নাটককে রসঘন করার ইচ্ছা, আর (৪) সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা।" এই সময়ে বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন নারী-চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে যেসব অভিনেত্রী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'দেবদাস', 'ধাত্রীপান্না' ও 'রাষ্ট্রবিপ্লব' (মিনার্ভা) নাটকে পার্বতী, পান্না ও রৌশনআরার ভূমিকায় সরযূবালা, 'ধাত্রীপান্না'র শীতলসেনির ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা, 'বিপ্রদাসে' বন্দনার ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা, 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় রাণীবালা, 'রামের সুমতি'তে নারায়ণীর ভূমিকায় সুহাসিনী আর 'টিপুসুলতান' নাটকে কৃষ্ণাবাঈ-এর ভূমিকায় অপর্ণার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা থিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৫ই আষাঢ়, ১৩৫০) একটি বিশেষ শোকাবহ ঘটনা। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মঞ্চে তিনি যে তারুণ্যের পরিচয় দিতেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। 'হিরো' হয়েই যেন দুর্গাদাস পৃথিবীতে এসেছিলেন। মঞ্চে তিনি যে পৌরুষের পরিচয় দিতেন, আজকার তরুণ অভিনেতৃদের মধ্যেও তা বিরল।" রঙমহলে 'অভিষেক' নাটকে তাঁর 'ভরত' এ-যুগের একটি স্মরণীয় ভূমিকাভিনয়। এই দুর্গাদাসকে পুরোভাগে রেখে নাট্যনিকেতনের কয়েকজন অভিনেতা সমবায়ের ভিত্তিতে চিৎপুরে রঙ্গমহল নামে একটি থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। রঙ্গমহলের উদ্বোধন হয় শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল-হাসান' নাটক দিয়ে। এ-প্রয়াসও স্থায়ী হয়নি।

নবযুগের দ্বিতীয় পর্বের পঞ্চ দশকের তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৩) কলিকাতায় থিয়েটার চারটি—শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, ষ্টার ও মিনার্ভা। সেই সময়ে রঙমহলে চলছে 'রক্তের ডাক', 'সেই তিমিরে'; এখানে তখন বিভিন্ন ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, ভানু, হরিধন, উষা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রভৃতি অভিনয় করতেন, ষ্টারে চলেছে পুরাতনের রোমন্থন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস'; তখন এখানে অহীন্দ্র, ভূমেন, মিহির, মহেন্দ্র গুপ্ত, রাণীবালা, পূর্ণিমা, ফিরোজা, বন্দনা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল। মহেন্দ্র গুপ্তই ছিলেন ষ্টারের পরিচালক ও নাট্যকার; পরে ইনি নির্মলেন্দু লাহিড়ীর শিক্ষকতায় অভিনয়বিদ্যাও আয়ত্ত করেন। এঁর পরিচালনাধীনে এঁরই লেখা 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি মাত্র দু'তিনখানি নাটক ব্যতীত ষ্টারে আর কোন নাটক সাফল্য লাভ করেনি এবং নাট্যকার-পরিচালক হিসাবে ইনি কোন মৌলিকতার পরিচয়ও দিতে পারেন নি। মিনার্ভা সেই সময় 'চরিত্রহীন' ও পুরাতন 'বঙ্গে বর্গী' নিয়ে কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল; তখন মিনার্ভার ষ্টাফের মধ্যে ছিলেন নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, রঞ্জিৎ রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, রমাদেবী, উষাবতী, মলিনাদেবী প্রভৃতি। মোটের ওপর দেখা যায় যে, নবযুগের দ্বিতীয় পর্বের এই সময়টায় বাংলা থিয়েটারে একটা অবনতির অবস্থাই দেখা যায়। শিশিরযুগের নাট্যকার হিসাবে আমরা তুলসীদাস লাহিড়ী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ নাথ রায় (ইনিই বাংলা নাট্যসাহিত্যে একাঙ্কিকার স্রষ্টা), নিতাই ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা রঙ্গমঞ্চ এঁদের স্ব স্ব প্রতিভার দানে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট হয়েছে। তুলসীদাস প্রগতিশীল নট ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর 'দুঃখীর ইমান' শ্রীরঙ্গমের একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। এর প্রযোজনায় শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার নূতন পরিচয় দিয়েছিলেন। নাট্যাচার্যের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তুলসীবাবুর মৃত্যু হয়।

বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতি এই পর্যন্ত এসে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। 'প্রশ্ন' নাটকের পরবর্তী দু'বছর শ্রীরঙ্গমের কোনো নূতন নাট্যপ্রয়াস ছিল না।

নবযুগপ্রবর্তকের এই নিশ্চেষ্টতা স্বভাবতঃই কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সমসাময়িক রঙ্গালয়গুলির ওপর। কিছুকাল পরে অন্যান্য রঙ্গালয়গুলির অবস্থা যখন হতশ্রী, তখন ষ্টার থিয়েটার 'শ্যামলী' নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলা থিয়েটারে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করে। 'শ্যামলী' একটি দিক্-পরিবর্তন—যদিও উপন্যাসের নাট্যরূপ, তথাপি অভিনয়ে, প্রযোজনায়, অভিনয়ের সামগ্রিক আবেদনে, সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিচালনায় 'শ্যামলী'ই সর্বপ্রথম একাদিক্রমে পাঁচশত রজনী অভিনীত হবার গৌরব লাভ করে। 'সিনেমা' ষ্টারদের নিয়ে মঞ্চে ষ্টার থিয়েটার নূতন পরীক্ষা করে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন, অন্ততঃ ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ত বটেই। উপন্যাস ভেঙে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করার ট্র্যাডিসন এ-কালের ষ্টার থিয়েটারই প্রথম স্থাপন করেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আবেদন বাঙালি দর্শকের কাছে যে আজও আকর্ষণীয় তার প্রমাণ এ-যুগের ষ্টারে 'পরিণীতা' ও 'শ্রীকান্তের' অভিনয়। এ যুগে আঙ্গিক বিকৃতি ও বীভৎস রসের নাটক বাংলা মঞ্চে সর্বপ্রথম দেখা দেয় রঙমহলে 'উল্কা' ও মিনার্ভায় 'এরাও মানুষ' নাটকে।

শিশিরকুমার যখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে আসেন তার পূর্বেই বাংলা থিয়েটারের ভরা হাট ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে—একের পর এক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মৃত্যু ঘটতে থাকে। রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী (যাঁদের সম্পর্কে শিশিরকুমার বলতেন, "বিশু ও শৈলেন আমার দুই সিংহ ও ব্যাঘ্র"), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, প্রভাত সিংহ, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেশ রায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, প্রভা, কঙ্কা, চারুশীলা, রাণীবালা প্রভৃতির মৃত্যুতে রঙ্গালয়ে একটা বিপুল শূন্যতা দেখা দেয়। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিভার দানে শিশিরযুগের বাংলা থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়েছিল। তারপর সেই শূন্যতা আরো মর্মন্তুদ হয়ে উঠল শিশিরকুমারের জীবনে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে স্নেহের পাত্র ভবানীকিশোরের অকাল মৃত্যুতে।

॥ ১৪ ॥ শিশিরকুমারের শিল্পসৃষ্টি ॥

শিশিরকুমার একজন প্রতিভাবান অভিনেতা মাত্র ছিলেন না। একটি সুমহৎ শিল্পী-মানসের নির্মিতিতে যতগুলি গুণের প্রয়োজন, তার সবগুলির সমাবেশ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে আর্ভিং-এর কথা মনে পড়ে। ১৯০৫-এর ১৪ই অক্টোবর আটষট্টি বছর বয়সে স্যর হেনরি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর আর্ভিং-প্রতিভা বিচারপ্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ব্র্যাম ষ্টোকার লিখেছিলেন :

"He had a mind to conceive and relentless purpose to carry thought into effect. Henry Irving never shunned toil of any kind in connection with his work as a player or a producer. From the moment when he made up his mind to undertake a certain play, his life became devoted to the work in hand. Day and night he studied, thought, learned, rehearsed, sought for suitable equipment of his play, ransacked old storehouses of historic information, read all works obtainable on the various character if such had any basis in history...He had been noted among his comrades for his completeness in all ways. Not only was he for nearly forty years one of the best known and respected actors of his time, but for fully twenty-five out of the forty nine years of his acting he was the undoubted and unchallenged head of his profession and his art. To him was given by his comrades a veritable kingship in his craft...Truly of him it might be well and truly said, 'Great men build their own monuments."

শিশিরকুমার সম্পর্কেও এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নাট্যরস-

পিপাসু দর্শকচিত্তে শিশিরকুমারের যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল, তার মূলে ছিল তিনটি জিনিস—প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব। আর্ভিং সম্পর্কে বার্ণার্ড শ-র দুটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—"singularity of personality" আর "dignified bearing"—শিশিরকুমারের পক্ষেও এই বিশেষণ দুটি প্রযোজ্য। এমন আভিজাত্যমণ্ডিত কমনীয় আকৃতি নিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্বে আর কোনো নটের আবির্ভাব ঘটেনি। আর্ভিং-এর মতই শিশিরকুমারের নাট্যানুরাগ ছিল সহজাত; ছেলেবেলা থেকেই তিনি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে নাট্যপ্রসঙ্গে আলোচনায় বেশি আনন্দ পেতেন, আমি তার মাতুল ফণীন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি। শিশিরকুমার ছিলেন অধ্যাপক আর আর্ভিং ছিলেন "a hard worked young London clerk"; কিন্তু নট হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন—এই উচ্চাভিলাষ দুজনের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই ছিল। আর্ভিং-এর প্রেরণা ছিল শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক আর শিশিরকুমারকে প্রেরণা জুগিয়েছিল শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক, গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা আর রবীন্দ্রনাথের কাব্য। আর্ভিং-এর উচ্চাভিলাষের সঙ্গে ছিল তিনটি জিনিস—"patient and continuous effort, unflagging perseverance and indomitable purpose";—শিশিরকুমারের উচ্চাভিলাষের সাফল্যের মূলেও সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, সেই নিরলস অধ্যবসায় আর সেই অপরাজেয় অভীপ্সা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব থাকলেই জীবনে সফলতা অর্জন করা যায় না; সেই সঙ্গে প্রয়োজন পরিশ্রম। শিল্পীর জীবন আরামের জীবন নয়, কঠোর সাধনার জীবন, এ কথা শিশিরকুমার বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। মনে পড়ে একদিন শ্রীরঙ্গমে এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"লোকে বলে শিশির ভাদুড়ী একটা জিনিয়াস, কিন্তু পরিশ্রমের কথা, সাধনার কথাটা তারা ভুলে যায়। বড়ো হোতে হোলে তার দাম দিতে হয়, হঠাৎ বড়ো হওয়া যায় না; কবি, নট, চিত্রকর, সকল জীবনশিল্পীর পক্ষেই এই কথাটা সত্য, জেনো। ইংরেজ কবি তাই তো বলেছেন:

The heights by great men reached and kept

were not attained by sudden flight,
But they while their companions slept
were toiling unwearied in the night.

অনেক নাটক আমি মঞ্চস্থ করেছি, কিন্তু তার প্রত্যেকখানার পেছনে থাকতো study—study of a play ছাড়া কোনো নাটক ঠিকভাবে মঞ্চস্থ করা চলে না ; মনে রেখো— acting in its highest sense is not merely an effort of the individual ; it is an effort organised and purposed, and comprehends not merely the action of one, but the interdependence of many.—আর এইখানেই ওঠে কঠিন পরিশ্রমের কথা। Supreme stage knowledge আর all-embracing imagination—এই দুটো জিনিস স্যর হেনরি আর্ভিং-এর যেমন ছিল, ইংলণ্ডে আর কোনো অভিনেতার তেমন ছিল না। আর্ভিং খুব পরিশ্রম করতে পারতেন ; পরিশ্রম আমিও কম করি নি ; কিন্তু সে-বিচার ক'জন করে ? কম-বেশি ছ'শো বিভিন্ন রকমের চরিত্রকে মঞ্চে রূপায়িত করেছিলেন আর্ভিং—এই কাজটাই কি কম পরিশ্রম সাপেক্ষ ?"

শিশিরকুমারের শিল্পসৃষ্টি আলোচনা করবার সময়ে আমাদের এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

শিশিরকুমার একজন মহৎ শিল্পী। পৃথিবীর মহৎ শিল্পীদের নামের তালিকায় 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী'—এই নামটিও স্থান পাবার যোগ্য। কেন, তাই বলি। মহাকবি মিলটন যখন তাঁর অমর কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করেন তখন তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হোল : "to pierce the surface of things to their real and abiding significance...to create works of art which should take note of all that was most important in the world"—নিঃসন্দেহে এ হোল মহৎ প্রতিভার মহৎ সংকল্প। মিলটনের এই মহৎ সংকল্পই তাঁর নিজের ভাষায় অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে দেখতে পাই এই কথাটির মধ্যে :

Things unattempted yet in Prose or Rhime.

—*Paradise Lost, 1, 16.*

এবং এই মহৎ সংকল্প নিয়ে কাব্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই না মহাকবি হোমর ও ভার্জিলের পর কাব্যের ক্ষেত্রে মিলটন এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাব্যের মাধ্যমে তিনি মানবজীবনের একটা মহিমময় রূপকে তুলে ধরেছেন—নিছক কাব্যসৃষ্টির আনন্দ তাঁর কাছে ছিল গৌণ। মহৎপ্রতিভা মহৎসৃষ্টির মধ্যেই সার্থকতা লাভ করে। শিশিরকুমারের শিল্পসৃষ্টির আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথা আমাদের মনের মধ্যে না জেগেই পারে না। নিছক অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন সেই মহৎ শিল্পীর কাছে কোনোদিনই যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। অভিনয়ের মাধ্যমে শিশিরকুমার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন জীবনের শিল্পময় ভাষ্য—তাই তো তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিধিদত্ত প্রতিভার গুণে অভিনয়শিল্পের মূল ধরে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন—লক্ষ দর্শকের প্রাণে তাই তো জেগেছিল এমন সাড়া। সত্যিই মিলটনের মতন শিশিরকুমারও "sought something more serious and closer to life" এবং তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে অভিনীত শতাধিক চরিত্রের ভেতর দিয়ে আমরা প্রতি রাত্রি প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর এই প্রোজ্জ্বল শিল্প-চেতনা—যা ছিল জীবনানুসারী, যা ছিল সিরীয়াস। মঞ্চের ওপর তাঁর শিল্পসৃষ্টির সূক্ষ্মতা যাঁরাই হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে শিশিরকুমার একজন প্রতিভাবান অভিনেতামাত্র ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন সত্যকার epic actor—যেমন মাইকেল ছিলেন epic poet—এ আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলতে পারি। "I call him an actor who is capable of re-creating from the depths within, a new and strangely variable personality ; who can render the whole gamout of emotions without effort"—বার্ণার্ড শ-র এই উক্তির কষ্টিপাথরে শিশিরপ্রতিভা অনায়াসেই যাচাই করা চলে। মঞ্চে তাঁর প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টি নিছক অভিনয় ছিল না, তা সর্বতোভাবেই ছিল 're-creation from the depths within', এবং বাংলা থিয়েটারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এইখানেই।

নাট্যমন্দিরের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ীর মৃত্যুতে শিশিরকুমার লিখেছিলেন: "আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে নাটকের সাধারণ দর্শক এখনও যথার্থ অভিনয় সমালোচন করতে শেখেনি।" তাঁর এই ধারণা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। শিশির-কুমার-স্মৃতি প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী এই সম্পর্কে নাট্যাচার্যের একটি অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'আমাদের দেশে নাট্য সমালোচনা সাহিত্যের পর্যায়ে তোলা দরকার। ইংরেজি কাগজে তো নাটক বর্জন করাই হয়েছে। নাটক সমালোচনা, বিশেষ শিক্ষিত ভিন্ন, সাহিত্য হবে কি করে? বিলেতে নাটক সমালোচনা করে উচ্চাঙ্গের সমালোচনা সাহিত্য বানিয়েছে, আমাদের দেশে তেমন হোল কৈ?" শিশিরকুমারের এ প্রশ্ন আজো রয়ে গেছে। শিশিরকুমার নাট্যকার তৈরি করতে পারেন নি, নাট্যসমালোচকও তৈরি করতে পারেন নি। অথচ তিনি পারতেন, কারণ এ যুগে তাঁর মতন নাট্যরসবেত্তা অভিনেতা আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। মুখে যা তিনি বলে গেছেন আজীবন, সেইসব জিনিস যদি তাঁর কলমের ডগা দিয়ে বেরুতো, আমার বিশ্বাস, বাংলা থিয়েটারের সমালোচনার দিকটা সমৃদ্ধিশালী হোত। সে প্রতিভা তাঁর ছিল। গিরিশযুগেও এই বিষয়ে কোন সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। শিশিরযুগে একমাত্র 'নাচঘর' পত্রিকা এ-বিষয়ে কিছুটা প্রয়াস পেয়েছেন, নাচঘরের নাট্যসমালোচনার মান আজকের দিনেও বিরল। শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিমণ্ডলের মধ্যে এই পত্রিকার সংশ্লিষ্ট লেখকগণ এসেছিলেন বলেই না নাটকের অভিনয়ের সমালোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁরা দিতে পেরেছিলেন। নাট্যমন্দিরের প্রথম যুগে অভিনীত প্রায় প্রত্যেকটি নাটক সম্পর্কে এই পত্রিকায় যেসব বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হোত তা যুগপৎ সমালোচনা এবং সাহিত্য। তবে তা ছিল শিশিরপ্রতিভার অনুরাগী কয়েকজন সাহিত্যিকের সীমাবদ্ধ প্রয়াস মাত্র। তাই বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে—একটি school of dramatic criticism গড়ে উঠবে—তা অচরিতার্থই রয়ে গেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কথাসাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে যে অমন গতিসম্পন্ন হোয়ে উঠেছিল, তার কারণ তিনি যুগপৎ ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যসমালোচক ছিলেন। শিশিরযুগে সেই রকম একজন নাট্যসমালোচক যদি থাকতেন তা'হোলে বাংলা থিয়েটার উপকৃত হোত সন্দেহ নেই, শিশিরপ্রতিভার মূল্যায়ণও সহজ হোত।

নাট্যকার নাটক রচনা করেন, অভিনেতা সেই নাটক অভিনয় করেন আর দর্শক প্রেক্ষাগৃহে বসে তাই উপভোগ করেন। নাট্যসমালোচকের কাজ এই তিনজনকেই নিয়ে। প্রতিভাবান অভিনেতা বা শক্তিমান নাট্যকারের ওপর রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অগ্রগতি যেমন অনেকখানি নির্ভর করে, তেমন নাট্যসমালোচকের ওপরও থিয়েটারের উন্নতি বা অগ্রগতি পরোক্ষভাবে যথেষ্ট নির্ভর করে। এর বড়ো দৃষ্টান্ত জর্জ বার্নার্ড শ। স্যাটারডে রিভিয়ুতে তাঁর নাট্যসমালোচনা ইংলণ্ডের থিয়েটার জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিল বলা চলে। উনিশ শতকের শেষভাগে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফরবেস রবার্টসন যখন লাইসিয়ম থিয়েটারে 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের পুনরভিনয় করেন, সেই অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ লিখেছিলেন :

"How we lavish our money and our worship on Shakespeare without in the least knowing why! From time to time we ripen for a new act of language. Great, preparations are made, high hopes are raised, every one concerned is full of earnest belief that the splendour of the Swan will be revealed at last, like the Holy Grail. And yet the point of the whole thing is missed every time with ludicrous ineptitude....Every revival helps to exhaust the number of possible ways of altering Shakspeare's plays unsuccessfully."

—*Plays and Players*

আমাদের দেশে নূতন যুগে পুরাতন যুগের বহু প্রসিদ্ধ নাটকের পুনরভিনয় হয়েছে, কিন্তু পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় ঠিক কি ভাবে হওয়া উচিত, শিশিরকুমারের পূর্বে তা কেউ চিন্তা করে দেখেন নি। এর বড়ো উদাহরণ তাঁর 'জনা' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। ফরবেস রবার্টসনের মতন শিশিরযুগে

একাধিক মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকের অসার্থক অভিনয় দেখা গিয়েছিল। প্রকৃত নাট্যসমালোচক যদি কেউ থাকতেন সেদিন তা'হোলে পুরাতন নাটকের অভিনয়ে শিশিরপ্রতিভা form-এর দিক দিয়ে মঞ্চে কী যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম। তা পারি নি বলেই আমরা বলেছি, গিরিশচন্দ্র কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে শিশিরকুমার কাঁচি চালিয়েছেন। আসলে তিনি কোনো নাটকই edit না করে মঞ্চস্থ করতেন না। বলতেন—"অভিনয়সৌকর্যের জন্ত নাটকের ওলট-পালট দরকার। নাটকের ভাষারও অদল-বদল দরকার হয়। মঞ্চের একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে, সেটা না জেনেই অজ্ঞজন বিজ্ঞের মতন বলেন, শিশির ভাতুড়ী নিজের খুশিমতো acting করে। এ তাদের নিতান্তই ভুল ধারণা।" একটা দৃষ্টান্ত দিই। যখন 'বিরাজ বৌ' মঞ্চস্থ হয়, শুনেছি শরৎচন্দ্র নাকি নীলম্বরকে মারতে রাজী ছিলেন না; শিশিরকুমারই তাঁকে বুঝিয়ে দেবার পর তিনি ঐ পরিবর্তনটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের শিল্পসৃষ্টি বুঝতে হলে, অভিনেতা শিশিরকুমার ও ক্রিটিক শিশিরকুমার উভয়কেই বুঝতে হয়।

আলমগীর, রাম ও জীবানন্দ—এই তিনটি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক চরিত্রের অভিনয়ের মধ্যেই আমরা শিশির-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই—যদিও তাঁর বত্রিশ বৎসরব্যাপী নটজীবনে অভিনীত ভূমিকার সংখ্যা বড়ো কম নয়। নাটকের কোনো চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেতার ভূমিকা কি? এই বিষয়ে শিশিরকুমারের অভিমত এখানে উল্লেখ্য: "নাট্যকার যেভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অভিনেতা ঠিক তা অনুসরণ করবে না, সে চরিত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা দেবে। নাট্যকারের কল্পিত সীমা প্রতিভাবান অভিনেতা অতিক্রম করে যেতে পারে, সে অধিকার তার আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অভিনেতার জন্যই নাটক সফল হয়েছে বেশি, শুধু লেখার জন্য নয়। নাটক উচ্চ সাহিত্য না হোলেও নাটক হওয়া সম্ভব একমাত্র উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের গুণে।" শিশিরকুমারের অভিনয় ছিল এই ধরণের অভিনয়। অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ

করে তিনি যা করতেন তা নিছক acting হোয়ে উঠত না, তা হোতো সেই চরিত্রের ব্যাখ্যা—হোত একটি নিরুপম শিল্পসৃষ্টি। সমকালীন যুগে এ প্রতিভা একমাত্র তাঁরই ছিল। তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটি ভূমিকাভিনয়ের বিচার বা সমালোচনা ঠিক সেইভাবেই করতে হবে। শিশিরকুমার একাধারে ছিলেন ভাবুক, কাব্যরসিক ও নাট্যরসিক—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাটক, নাট্যকার ও নাটমঞ্চের পরিচয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। অতীতের ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। শিশিরকুমারের অভিনয়ে তাই একটি বিদগ্ধ মনের পরিচয় থাকত। নটের কল্পনা যে সামান্য নয় তা তাঁর অভিনীত বহু ভূমিকায় তিনি বুঝিয়ে দিতেন। অভিনয় শুধুই যে স্বভাবের ছবি নয় বা ভাবসন্ধি নয়, তা যে দিগন্ত উদ্ভাসিত একটি বিদ্যুৎচমক; অভিনয় যে শুধুই দর্শকের মনোরঞ্জন নয়, তারই মুখরিত মর্মে প্রতিফলিত এক শিল্পসৃষ্টি—এই কথা অভিনেতা শিশিরকুমার 'আলমগীর' থেকে 'প্রশ্ন'—প্রত্যেকটি নাটকে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের আরো বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে—"The actor does not merely imitate. He re-creates, from the depths within, a new and strangely variable personality."—এই অভিনব ব্যক্তিত্ব-সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই অভিনয়ের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্যে রসিক ও বিদগ্ধ দর্শক উপলব্ধি করে মুগ্ধ হোতেন। শিশিরকুমারের অভিনয় মোহিনীমূর্তি ধারণ করে দর্শকচিত্ত হরণ করে নি, তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কিছু বক্তব্য থাকত, থাকত কিছু চিন্তার খোরাক। বাস্তবতাবোধ, জীবনানুস্মৃতি এবং শিল্পগত বুদ্ধি ও বিবেচনা শিশিরকুমারের তীক্ষ্ণ ছিল বলেই তিনি অভিনয়কে এমন একটা তুঙ্গশীর্ষে তুলে ধরতে পারতেন যেখানে অনেকেই সহজে নাগাল পেতেন না। এই জন্য অনেক নাটকে তাঁর অনেক ভালো অভিনয় দর্শকদের অগোচরে রয়ে যেত। সর্বরসজ্ঞ অভিনেতা ছিলেন শিশির-কুমার। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় তিনি একা শেখাতে পারতেন। কাজেই শিশিরকুমারের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রসৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টি যুগপৎ কিভাবে সম্ভব, তা তাঁরা কতকটা বুঝেছেন। শিশির-প্রতিভার এই দিকটির ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার।

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গী, তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণ এ সবই legendary হয়ে আছে এবং থাকবে। কিন্তু তাঁর অভিনয়প্রকৃতি অর্থাৎ যাকে আমরা বলি characteristics, সেই বিষয়ে অনেকের পরিষ্কার ধারণা নেই। ষ্ট্যানিস্লাভিস্কির একটি কথা মনে পড়েঃ "প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় সময়ে দুটি সত্ত্বা সমান্তরাল ভাবে কাজ করে। এক শিল্পী-সত্ত্বা ও দ্বিতীয় অভিনেতার ব্যক্তি-সত্ত্বা।" শিশিরকুমারের অভিনয়-অভিব্যক্তি শিল্পজনোচিত ছিল তো বটেই ; উপরন্তু তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বার এক অদ্ভুত প্রভাব সেই শিল্পসত্ত্বাকেও অতিক্রম করে যেত। সেই কারণেই তাঁর অভিনয়ের টেকনিক বা ষ্টাইল অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা দুঃসাধ্য ছিল। কোনো মহৎপ্রতিভাকে কেউ কোনোদিন অনুকরণ করতে পারে না। শিশিরকুমার মূলতঃ সার্থক হয়ে উঠতেন ভাবময় রোমান্টিক চরিত্রে। অন্তর্দ্বন্দ্বময়, আদর্শ-বান চরিত্রে তো বটেই, উপরন্তু নাটকের যে অংশে চরিত্রে সকল জাগতিক উপকরণ ছাড়িয়ে একটা আবেগপূরিত ভাব কাব্যমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশের অবসর থাকত, সেখানে তিনি হয়ে উঠতেন নৈসর্গিক ব্যঞ্জনাময়। সে প্রকাশে থাকত একটা পৃথক ভাষা। বুদ্ধদেব বসু বলেনঃ "তাঁর স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিল, বীরত্ব ও কারুণ্যের দিকে ; যা আবেগে আর্দ্র বা বীর্যে উদ্ধত তার বাইরে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাঁকে কল্পনা করা যেতো ম্যাকবেথ অথবা ওথেলোর ভূমিকায় কিন্তু ইয়াগো অথবা শাইলকের নয়। হাস্যরসও যে তাঁর অধিকারভুক্ত নয়, এ-কথা বুঝেছিলাম তাঁর 'শেষরক্ষা' দেখে।"

সর্বাগ্রে উল্লেখ করব শিশিরকুমারের 'আলমগীর'। আলমগীরের ভূমিকা-ভিনয় তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির মধ্যে একটি এবং এরই মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিনয়ও এই আলমগীর। তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে তিনি এই ভূমিকাটির অভিনয়ে কোনোদিন ক্লান্তি বোধ করেন নি—তাই অভিনেতা শিশিরকুমার ও আলমগীর—মঞ্চে এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ-রচিত সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে আলমগীরের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তিত্বাভিমানী, চির অপরাজেয় আলমগীরকে মঞ্চে শিশিরকুমার যেভাবে

উপস্থাপিত করতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পক্ষেও তা দুঃসাধ্য। আলমগীরের বিপক্ষে আছে উদিপুরী। বাংলা নাটকে উদিপুরী একটি আশ্চর্য চরিত্র-সৃষ্টি। ঘৃণার সঙ্গে প্রেম, সরলতার সঙ্গে দুর্বলতার অপূর্ব মিশ্রণে গঠিত এই চরিত্রটির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আলমগীরকে তার সেবা ও করুণার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। আলমগীর যতক্ষণ জাগ্রত ততক্ষণ তিনি শক্তিমান, অপরাজেয়। কিন্তু নিদ্রাভিভূত, স্বপ্নাভিভূত আলমগীর তেমনি অসহায়—নিজের অজ্ঞাতে স্বপ্নের ঘোরে তিনি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে যান। মঞ্চে এই দ্বিধাবিভক্ত আলমগীর-চরিত্রের অভিব্যক্তিতে শিশির-প্রতিভা যে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করত, তার তুলনা নেই। আলমগীরের মুখ আর মন যে এক নয় (মুখে তার ধর্মের বুলি আর অন্তরে সাম্রাজ্যের লিপ্সা) তা অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রতিটি দৃশ্যে শিশিরকুমার এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। যে দৃশ্যে তিনি দিলিরকে বলছেন :

> "ভুল বুঝছ দিলির খাঁ। আক্রোশ আমার কারো ওপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা—তাও কারও ওপর নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে সেই ধর্মের জন্য আমি বাদশাহি নিয়েছি।"

—তখন ঔরংজেবের অন্তরের কপটতাকে শিশিরকুমার যে কি সুনিপুণ সূক্ষ্মতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন, চক্ষের দৃষ্টিতে, প্রতিটি কথার উচ্চারণের ভঙ্গিতে, বাদশাহের কপটাচরণ তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কি অনির্বচনীয় রূপে অভিব্যক্ত হোত, সে-শিল্পসৃষ্টি অনুভবের জিনিস, ব্যাখ্যানের নয়। আবার এই কপট ধর্মাশ্রয়ী সম্রাট যখন মর্মস্পর্শী ভাষায় সুজার ও তার স্ত্রী পিয়ারীবানুর শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা দেন, তখন শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শকদের চক্ষের সামনে সম্রাটের যে হৃদয়বান্ মহানুভব রূপকে মঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলতো, বাংলা মঞ্চে তেমন অভিনয় পূর্বে কখনও দেখা যায় নি, পরেও আর কখনো দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। এখানে নাট্যকারের ভাষা অভিনেতাকে অবশ্য খুবই সাহায্য করে। সেই মর্মস্পর্শী ভাষাকে শ্রোতার চিত্তস্পর্শী করে তুলে মোগল-বংশ গরিমায় প্রবুদ্ধ সম্রাটের

ছবিকে শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যেভাবে মঞ্চে রূপায়িত করতেন তা অবিস্মরণীয়। সেই দীর্ঘ সংলাপ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একা আলমগীর-রূপী শিশিরকুমার দিলির খাঁর উদ্দেশে যেভাবে বলে যেতেন, তা মুহূর্ত মধ্যে দর্শকদের অন্তরে প্রবিষ্ট হোয়ে এমন ভাবসন্ধি ঘটাতো যার সম্যক বর্ণনা অসম্ভব। রুদ্ধনিশ্বাসে হৃদয়-মন দিয়ে শুনতে হোত সেই সংলাপ। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে আমরা আলমগীরের দর্শন পাই। নাটকে তাঁর সর্বপ্রথম স্বগতোক্তিটিই আলমগীর-চরিত্রের পরিচায়ক। মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হাত দু'খানি রেখে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষিপ্রপদে পাদচারণা করতে করতে শিশিরকুমার সেই স্বগত-উক্তিটিকে এমন ভঙ্গিতে রূপ দিতেন যা মুহূর্তমধ্যে দর্শকের মনকে উন্মুখ করে তুলতো। এই দৃশ্যে আলমগীরের দ্বৈতসত্বাকে শিশির-কুমার যেভাবে তাঁর অলৌকিক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তুলতেন যা একমাত্র তাঁর মতন প্রতিভাবান নটের পক্ষেই সম্ভব। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অপরাজেয় এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী আলমগীরের শিশুর মতো নিঃসহায় রূপটিকে শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যেভাবে অভিব্যক্ত করতেন, তা অভিনয়কলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর সৃষ্টি।

'আলমগীর' ট্র্যাজেডি। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঔরংজেব জরা, মনোবিকার, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং স্ত্রী-বুদ্ধির কাছে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত আর কখনো হন নি। শক্তির উন্মাদনায়, বুদ্ধির কূটত্বের ভরসায় তিনি হৃদয়ের শাশ্বত সত্যকে আজীবন ফাঁকি দিয়ে এসে-ছেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম, শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে মঞ্চে প্রতিটি দৃশ্যে যে ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠতো, তার বিশদ আলোচনা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের স্থান দাবী করে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভে যেমন, তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলমগীরের ভূমিকাভিনয়ে তাঁর প্রতিভা কোনোদিনই ম্লান দেখা যায়নি, বরং শিশিরকুমারের পরিণত বয়সের আলমগীর যেন সেই রূপদক্ষ শিল্পীর মহৎ সৃষ্টি বলেই বিবেচিত হবে। তাঁর বৃদ্ধবয়সের আলমগীর দেখে বিগতযুগের ষ্টারে বৃদ্ধ অমৃতলাল মিত্রের মীরকাশেমকে দর্শকদের মনে

পড়তো। তবে অমৃতলাল বা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় শিশিরকুমারের শরীর বৃদ্ধবয়সেও এতটুকু ভাঙে নি। তাঁর সেই বীরোচিত দীর্ঘ বপু তেমনি উন্নত ছিল, আর তাঁর সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বরের volume এবং অপূর্ব মাধুর্য ছিল তেমনি অম্লান। আলমগীরের সেই 'দিলির' ডাকের মধ্যে বৃদ্ধবয়সেও শিশিরকুমার যে বিদ্যুতের চমক দিতেন তাতে দর্শকের হৃদয় কেঁপে উঠতো —এক অকল্পিত শিহরণ খেলে যেত সমগ্র প্রেক্ষামণ্ডপে। কণ্ঠস্বরের এই অপরিমেয় শক্তি শিশিরকুমারের চিরদিন অটুট ছিল—সাধারণ সভায় বক্তৃতা করবার জন্য তাই তাঁকে কেউ কোনোদিন 'মাইক' ব্যবহার করতে দেখেনি।

শিশিরকুমার নূতন ও পুরাতন দু'রকম নাটকই অভিনয় করেছেন। পুরাতন নাটকের নূতন রূপ তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবীরের কথা আগেই বলেছি। এইখানে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে তিনি পরস্পর-বিরোধী যে তিনটি চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন—ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও জনৈক ব্রাহ্মণ—তা এ-যুগের বাংলা থিয়েটারে গিরিশ-নাটকের এক নূতন ব্যাখ্যা হিসাবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর হাতে গিরিশচন্দ্রের নাটক বিকৃত হয়নি, বরং এই কথা বলা চলে যে, অভিনয়নৈপুণ্য আর উপস্থাপনাকৌশল (acting and presentation)—এই দুটি বিদ্যার সহায়তায় শিশিরকুমার পুরাতন নাটকের মধ্যেই নবযুগের তরুণ ভাবধারাকে অক্লেশে বইয়ে দিয়েছেন। পৌরাণিক চরিত্র রাম; সেই ভূমিকাতেই রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনভাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ—অথচ দেখা গেল যে, "শিশিরকুমার 'সীতা' নাটকে বাঙালির দাম্পত্যপ্রেমের এক বেদনা-মধুর অভিব্যক্তি দিয়া শিক্ষিত সমাজকে জয় করিলেন।···তাঁহার অনবদ্য অভিনয়ের অন্তরালে যে রাম-চরিত্র ফুটিয়াছে তাহা আমাদের শিক্ষিত পত্নীবৎসল দর্শকের প্রতিরূপ।" তাই না শিশির-কুমারের রাম এমন সর্বচিত্তবিজয়ী হয়ে উঠেছিলেন, নাট্যমন্দিরের 'সীতা' এমন বিরাট সমাদর লাভ করেছিল। শিল্পচেতনার সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে শিশিরকুমারের 'রাম' শুধু অতুলনীয় নয়, অননুকরণীয়। তেমনি 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে শিশিরকুমারের 'ভীম' তাঁর 'রাম'-এর চেয়ে কম

আকর্ষণীয় হয় নি।

গিরিশযুগে এবং তার পরবর্তীকালেও এই নাটকের অভিনয়ে বৃহন্নলা-রূপী 'অর্জুন'ই নায়কের স্থান অধিকার করে আসছিলেন, 'ভীম' চরিত্রটি একান্ত অবহেলিত ছিল বললেই হয়। এমন কি অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় একজন সুযোগ্য অভিনেতাও এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এর এমন কোনো রূপ ফোটাতে পারেন নি যা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। শিশির-কুমারই ভীমের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে এই চরিত্রে এমন একটি নূতন প্রাণ সঞ্চার করলেন যার ফলে নায়কের প্রাপ্য সম্মান বৃহন্নলার সঙ্গে বৃকোদরও সমান ভাগে ভাগ করে নিতে পারবে। এই নাটকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তৎকালীন 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিলেন: "তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় শিশিরপ্রতিভার অপূর্ব অভিব্যক্তি। ভীম শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ—এই তিনটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের যে বিভিন্ন মূর্তি রঙ্গমঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা একমাত্র তাঁর মতন প্রতিভাবান নটের পক্ষেই সম্ভব ছিল। 'ভীম' বলতেই সাধারণত দর্শকদের মানসচক্ষে যে ভীমের ছবি ফুটে ওঠে, এ সেই যাত্রাদলের নাটুকে 'ভীম' নয়। এই অমিত বলদৃপ্ত মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব যখন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো সদম্ভ চরণপাতে বিরাট রাজসভায় সূপকার পদপ্রার্থী হোয়ে প্রবেশ করেন, তখন তিনি যে শুধু একজন অতি বলিষ্ঠদেহ সূপকার মাত্র নন, তাঁর মধ্যে যে একটা অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য আছে সেটুকুও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রৌপদীর অপমান ও লাঞ্ছনায় রোষরুষ্ট কেশরীর ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধে কম্পিত উত্তেজিত ভীমের সেই প্রতিশোধস্পৃহা যা অজ্ঞাতবাসের প্রচ্ছন্নতাও প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারত না, কেবল জ্যেষ্ঠের অনুরোধই যাকে নিষ্ফল করে দিচ্ছে, সেই কঠিন নিরুপায় ভাব শিশিরকুমারের ভীমের অভিনয়ে অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতি চমৎকার ফুটে উঠেছিল। অমিতবিক্রম শক্তিশালী ভীমের নিরুপায় রুদ্ররোষে রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সেই ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ, সেই শালপ্রাংশুভুজদ্বয়ের নিস্ফল আক্রোশে দুরন্ত আস্ফালন, সেই অজগরভুজঙ্গ গর্জনতুল্য দীর্ঘশ্বাস, সেই অবমাননাহত রোষদীর্ণ বিরাট বক্ষের ব্যথিত স্পন্দন, শত্রুনিষ্পেষণ পিপাসায় তাঁর সেই অধীর ব্যাকুলতা, সে

যে কী সুন্দর অভিনয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। যে প্রচণ্ড শক্তির দুর্নিবার বেগ নিয়ে ভীম ছুটে এসেছিলেন কীচকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কীচক সে আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো পলকের মধ্যে প্রাণ দিল। কীচককে বধ করে ভীমের কিন্তু তৃপ্তি হোল না। অসমযোগ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধান্তে শ্রেষ্ঠতম বীরের যে অসন্তোষ, শিশিরকুমার তাঁর অসামান্য প্রতিভার গুণে সেই ভাবটির যে অতুলনীয় প্রকাশ দেখিয়েছিলেন—তা সেদিন বাংলা দেশের অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রাজসভার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দৌবারিকের মল্লবীর তুল্য আকৃতির প্রতি ভীমের সেই কৌতূহল দৃষ্টিটুকু, তাঁর সেই গজরাজের মতন মেদিনীটলন চরণভরে চলাফেরা, সেই বলদৃপ্তের মতো আশেপাশের লোকের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনী, অজ্ঞাতবাসান্তের দিন তাঁর সেই অধীর উল্লাস ও উত্তেজনা, যার ঝোঁকে তিনি বিরাট রাজাসনের মূল্যবান উপাধানগুলি ক্রীড়নকের ন্যায় ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বিরাটরাজাকে আলিঙ্গন দিতে গিয়ে আনন্দে তাঁকে বাহুবেষ্টনে শূন্যে তুলে ফেললেন—এ সবের তুলনা হয় না, এ অভিনয়ের মাধুর্য শোভাসম্পদ লিখে বোঝাবার নয়।

"এই একই মানুষ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা দিলেন। নাটকে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রপাল যদুকুলপতি পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্যাম সৌম্য-মূর্তি নিয়ে শান্ত মধুর কণ্ঠে সহাস্য প্রসন্ন বদনে যে শ্রবণাভিরাম বচনসুধা বর্ষণ করে যান তা দর্শকের কর্ণকে তৃপ্ত করে, চক্ষুকে প্রীত করে। গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভা যেমন এই একটি মাত্র দৃশ্যে কয়েকটিমাত্র কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট চরিত্রকে সম্যক পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছে, শিশির-কুমারের অভিনয় প্রতিভাও ঠিক তেমনি অনায়াসে এই একটি মাত্র দৃশ্যে স্বল্পক্ষণ অভিনয়ের মধ্যেই মহাকবির সেই ধ্যানদৃষ্ট মূর্তিকে দর্শকদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল। তারপর ঈষৎ বিকৃতমস্তিষ্ক কাকচরিত্রাভিজ্ঞ রাজপুরীর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় কাতর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণের ভূমিকাতেও শিশিরকুমার যে আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তা তাঁরই প্রতিভার উপযুক্ত। এই চরিত্রটি যেন তাঁরই নিজের এক অভিনব সৃষ্টি।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'পাষাণী'তেও তিনি গৌতম ও ইন্দ্রের দুই পরস্পর-বিরোধী ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। পাষাণীতে তিনি গৌতম চরিত্রটির একটা নূতন conception দিয়েছিলেন।

পুরাতন সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল'-তে যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় আর একটি আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টি। 'প্রফুল্ল' বাংলা থিয়েটারের একটি প্রসিদ্ধ নাটক এবং ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। 'প্রফুল্ল'র নেপথ্য প্রেরণা ছিল 'সরলা' এবং 'প্রফুল্ল'র আগে 'সরলা' নাটকের অভিনয়ই নাট্যজগতে দিক্‌পরিবর্তনের সূচনা করে দিয়েছিল সেদিন। তখনকার দিনে একটি মঞ্চে একটি সামাজিক নাটকের একাদিক্রমে এক-বৎসর ব্যাপী অভিনয়, বড়ো কম সাফল্যের কথা নয়। ষ্টার থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্দ্র নাটকখানি লিখেছিলেন। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট ও ম্যাকবেথকে যেমন বলা হয় 'talent testing drama'—অর্থাৎ ওদেশে যে কোনো নূতন অভিনেতাকে সর্বাগ্রে হ্যামলেট অথবা ম্যাকবেথের চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হয়। বাংলা দেশে তেমন নাটক মাত্র দুখানি আছে—'প্রফুল্ল' আর 'চন্দ্রগুপ্ত'। 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশই কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এই চরিত্রের অভিনয় অতি সুকঠিন। তাই নাট্যমন্দিরের যুগে শিশিরকুমার যখন এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার কথা ও যোগেশ-চরিত্রে অভিনয় করার কথা বিজ্ঞাপিত করেছিলেন তখন নাট্যামোদী মহলে একটা তুমুল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক নাটকে সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

বাংলা থিয়েটারে 'যোগেশ'-চরিত্রটি একটি অভিনয়-ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, বলা চলে। প্রাচীন ও নবীন যুগের ছয়জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা এই চরিত্রটি মঞ্চে রূপ দিয়ে গেছেন, যথা—অমৃতলাল মিত্র, গিরিশ-চন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, দানিবাবু এবং শিশিরকুমার। অমৃতলালই প্রথম যোগেশ, এই ভূমিকাভিনয়ে তাঁর খুব সুনাম হয়েছিল। সেইজন্য ছয় বৎসর পরে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় 'প্রফুল্ল' যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন প্রথমে তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'ট্র্যাজেডিয়ান' মহেন্দ্রলাল বসুর যোগেশ-

চরিত্রে নামবার কথা হয়, কিন্তু তিনি ভরসা পান নি। অগত্যা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে তাঁর স্বষ্ট চরিত্রটির রূপ দিতে হয়। তখন যুগপৎ ষ্টার ও মিনার্ভায় এই 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় শহরে চাঞ্চল্যের স্বষ্টি করেছিল; চাঞ্চল্যের কারণ ষ্টারে অমৃতলাল আর মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের একই চরিত্রে অভিনয়। গুরু-শিষ্যের সেই প্রতিযোগিতা দর্শনীয় বস্তু ছিল। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গিতে, চাল-চলন, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে আকারে, গাম্ভীর্যে গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।··· গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে।" তিনি এই ভূমিকায় বাস্তব অভিনয় করতেন। আর্টে যে মার্জনাযোগ্য আতিশয্য ও কৃত্রিমতা থাকে, গিরিশযুগের একজন সমালোচকের মতে, গিরিশচন্দ্র অনেকস্থলে তাও বর্জন করে চলতেন। কথিত আছে, যোগেশের ভূমিকায় তিনি যে ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম অনুভূতি, করুণরসের অজস্রধারা ও সেই সঙ্গে যোগেশের মত্ততার মধ্যেও যে অপূর্ব গাম্ভীর্য সঞ্চার করতে পারতেন, তা legend হয়ে আছে। কোনো অভিনেতাই যোগেশের ভূমিকায় আজ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রকে অতিক্রম করতে সক্ষম হননি।

এর বহুকাল পরে নবযুগে নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারে এই নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। সেদিন গিরিশ-পুত্র দানিবাবু ও শিশির-কুমার যোগেশ-চরিত্রটিকে মঞ্চে রূপ দিয়েছিলেন। এ ঘটনা ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। শিশিরকুমারের মুখে শুনেছি যে, এই সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকাটি অভিনয় করবার পূর্বে তিনি নাটকখানিই শুধু আগাগোড়া বার-দশেক পড়েন নি, সেই সঙ্গে 'যোগেশ'-চরিত্রটি সম্পর্কে যত ভাষ্য আছে, সেগুলিও সংগ্রহ করে চরিত্রটির অন্তর্নিহিত রূপটিকে ধরবার চেষ্টা করে-ছিলেন। একটি সমালোচনা তিনি আমাকে একবার দেখিয়েছিলেন। সেটি প্রসিদ্ধ লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। বলেছিলেন, "পাঁচকড়ি বাবুর interpretation যথার্থ। সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি 'প্রফুল্ল' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: " 'প্রফুল্ল' নটগুরু

গিরিশচন্দ্রের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক। এমন মর্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক বাংলা ভাষায় বুঝি আর নাই। সাধুতা, সত্যবাদিতা ও সরলতা—Honesty, uprightness ও straightforwardness—এই তিনটি যোগেশের সংসারধর্মের মূলমন্ত্র ছিল—ইহাই তাহার ধর্ম ছিল। কিন্তু যোগেশ ঈশ্বরভক্তিমূলক ধর্ম মানিত না অথবা সে ধর্মের সমাচার রাখিত না। যোগেশ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিত বলিয়া পূর্ব হইতেই সে একটু একটু মদ খাইত—কিন্তু তখনও মদ তাহাকে খায় নাই। তারপর ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল, যোগেশের ত্রিশ বৎসরের হাড়ভাঙা পরিশ্রমজাত যথাসর্বস্ব এক নিমেষের মধ্যে উড়িয়া গেল, সে পথের ফকির হইল। নৈরাশ্য, অবসাদ, মানের ভয়—এই তিনটি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল—তখন সে এই তিনের দংশন জ্বালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুরাপুরি মাতাল হইয়া উঠিল; দুঃখে আত্মহারা যোগেশ বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ খাইতে শুরু করিল। সত্যসত্যই তাহার সর্বনাশ হইল। বিরূপ অদৃষ্ট ঘটনার সূক্ষ্ম সূত্রের জাল বুনিয়া যোগেশের সর্বনাশ সাধন করিল।"

এই ব্যাখ্যার মধ্যেই শিশিরকুমার চরিত্রটিকে রূপ দেবার একটা সূত্র পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এ এমনই একটি ভূমিকা যা মঞ্চে জমান খুবই সহজ, যোগেশের মুখে নাট্যকার ভাল ভাল কথা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে চীৎকারেরও সুযোগ আছে—কাজেই এ চরিত্রে claps পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু তাতে আর যাই হোক শিল্পসৃষ্টি হবে না। তিনি নিয়ে এলেন সহজ সরল বাস্তবতা আর সেই সঙ্গে আধুনিকতা। অভিনয়কে করে তুললেন সংকেতময়। আবার সে সংকেতও আগাগোড়া সূক্ষ্ম—ঢাকাই মসলিনের মতো। সেই সূক্ষ্মতা আবার স্থানে স্থানে spiritual sublimity-তে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গর্ডন ক্রেগ একবার বলেছিলেন, "All stage actions and all stage words must first of all be clearly seen, must be clearly heard."—শিশিরকুমারও তাই এই চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর বাণী ও ভাবভঙ্গির মধ্যে কোথায়ও জড়তা আনেন নি। এই স্পষ্টতার জন্যই যোগেশ-চরিত্রে তাঁর অভিনয় হয়েছিল সমারোহহীন,

সহজ ও স্বাভাবিক। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে তাঁর যোগেশ এক কথায় superb—মুখে কথা নেই, শুধু ভাবের লীলা চলেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে। "সেই বেগস্পন্দিত ভাবের প্রবাহে যোগেশের মনের কথা যতদূর ফোটাবার তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারপর 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্নামাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব। এ হাসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। কথিত আছে, গিরিশচন্দ্র এইখানে প্রস্তরীভূত মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন, অর্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানিবাবু অর্ধচেতন ও অর্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন। কিন্তু শিশিরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চরিত্রের যে conception বা ধারণা করেছিলেন, তাতে এই অর্ধ-উন্মাদের মত কান্নামাখা হাসি তাঁর মুখে অতি চমৎকার মানিয়েছিল।" সেই সময়ে অনেকে বলেছিলেন যে, শিশিরকুমারের যোগেশ নাকি ইমোশন-বর্জিত হয়েছিল। কথাটা ঠিক নয়। প্রয়োজন মতো তিনিও ঐ চরিত্রে ইমোশনের পরিচয় দিতেন। তিনি বলতেন, এ চরিত্র এমনই—দুঃখের পর দুঃখের আঘাতে বুক ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে—যে এর আগাগোড়া emotional করলে এর সমস্ত বিশেষত্বই নষ্ট হয়ে যায়। যোগেশ-চরিত্রের এই conception নিয়েই তিনি সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন। আসল কথা, গতিশীল মুহূর্তের ভাবকেই অভিব্যক্ত করার মধ্যেই অভিনেতার শিল্পবোধের পরিচয় থাকে। যোগেশের ভূমিকার শেষ অংশে তাঁর আশ্চর্য সফলতার পেছনে আছে এই শিল্পচেতনা, সচরাচর মঞ্চে যা দুর্লভ। অভিনয়ে dignity জিনিসটা যে কি, তা শিশিরকুমার এই মাতাল যোগেশ-চরিত্রটির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেদিন যে ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অভিনয়-শিল্প সাধকদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু ছিল। জ্ঞানদার মৃত্যুর পর দেখা গেল যোগেশ-বেশী শিশিরকুমার মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। যোগেশ-চরিত্রের এই যে conception, মঞ্চে এ জিনিস আগে কেউ দেখেনি। যে নিজের একমাত্র বালক পুত্রের হাত মুচড়ে একটা সিকি কেড়ে নিতে পারে, সাধ্বী স্ত্রীকে লাথি মেরে যে গয়না-বেচা টাকা নিয়ে

মাইকেল নাটকে মাইকেল—শিশিরকুমার

ষোড়শী নাটকে জীবানন্দ—শিশিরকুমার

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য—শিশিরকুমার

পালাতে পারে, এককালের লক্ষপতি হয়েও যে একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাততে পারে, তার কাছে এই তো প্রত্যাশিত। 'মানুষ পাষাণ হওয়া' কথার কথা হিসাবেই লোকে জানতো, কিন্তু শিশিরকুমার-অভিনীত যোগেশের মধ্যে সেটা সবাই প্রথম প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিল। দানিবাবুর যোগেশের বৈশিষ্ট্য ছিল গম্ভীর উচ্ছ্বাস।

নাট্যমন্দিরে 'প্রফুল্ল'র অভিনয় যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি প্রেক্ষাগার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে, 'প্রফুল্ল'র প্রথম কয়েকরাত্রি প্রেক্ষাগারে দাঁড়াবার জায়গাই পাওয়া যায় নি। এর কারণ শুধু অভিনয় নয়, এই নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্যও হয়েছিল অসাধারণ। একটি দৃষ্টান্ত দিই। নাট্যমন্দিরে এই নাটকের যবনিকা যখন প্রথম ওঠে তখন দেখতে পাওয়া গেল যে, উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রকে প্রণাম করে লক্ষ্মীর আধার সিন্দুকের পূজা করলেন। সেই সময়ে দৈবাৎ তাঁদের হাত থেকে মঙ্গলঘটটি পড়ে যায়। ঘটনাটি তুচ্ছ। কিন্তু এরই মধ্যে কি রকম দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মঙ্গলঘট পড়ে-যাওয়া অমঙ্গলসূচক। প্রথম দৃশ্যেই নাটকের গতি সৃষ্টি হয়। এই যে improvement upon the author—এই যে নাট্যকারের সৃষ্টিকে অতিক্রম করে যাওয়া—এ জিনিস শিশিরকুমারের পূর্বে আর কারো কাছ থেকে আমরা পাই নি।

যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার দু' এক জায়গায় কথা উল্টে-পাল্টে বলতেন এবং দু-একটি কথা যোগও করতেন। 'গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয়ের সময়েও তিনি তাই-ই করতেন। কিন্তু তাঁর এই অদল-বদল করা, স্যর হেনরি আর্ভিং-এর শেক্সপীয়ারের নাটক অদল-বদল করার সগোত্র ছিল না। "Irving's Shylock was a creation which he thrust suceessfully upon Shakespear's play ; indeed, all Irving's impersonation were changelings. His Hamlet and his Lear were to many people more iteresting than Shakespear's Hamlet and Lear," বলেছেন

বার্ণার্ড শ তাঁর *Pen Portraits and Reviews* গ্রন্থে বিখ্যাত অভিনেতা বীয়ারবম ট্রি-র প্রসঙ্গে। শিশিরকুমার অভিনীত গিরিশ-চরিত্রগুলি আর যাই হোক changeling নয়; সেগুলি তাঁর হাতে, এই রকম অদল-বদলের ফলে, একটি আশ্চর্য নূতন রূপ পেত। এইরকম রূপারোপে তাঁর দক্ষতা ছিল অননুকরণীয়। প্রাচীনপন্থী দর্শকদের কাছে এটা ভাল লাগত না। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারতেন না যে শিশিরকুমার এমন-এমন স্থানবিশেষে এগুলো করতেন, যাতে অভিনয়ের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যেত। নাট্যকার ও নটের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন; নাট্যকার মূর্তি গড়েন, নট তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য অভিনেতার রূপ দেবারও অধিকার থাকে, অবশ্য তিনি যদি সৃজনীশক্তিসম্পন্ন অভিনেতা হন। অভিনয়ে এইভাবে natural grace নিয়ে এসে শিশিরকুমার যুগরুচিকে মার্জিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এই জন্যই বলি তাঁর অভিনয়ের মধ্যে সবসময়েই জানবার, শিখবার ও ভাববার মতন কিছু থাকত। এইখানেই শিশিরপ্রতিভার স্বকীয়তা।

'সধবার একাদশী'তে শিশিরকুমারের আর একটি অতুলনীয় সৃষ্টি নিমচাঁদ। বাংলা থিয়েটারের একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা নিমচাঁদ। এই প্রসিদ্ধির কারণ নটগুরু গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন নিমচাঁদ হয়ে। শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সময়ে নাট্যমন্দিরে এই প্রহসনখানির পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, তারপরে শ্রীরঙ্গমে জীবনের অপরাহ্ন কালে। শিশিরকুমারের নিমচাঁদ এক কথায় একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রূপকর্ম—এ ভূমিকায় তিনি সত্যই অপ্রতিরোধ্য। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর একটি অতুলনীয় সৃষ্টি। এই ভূমিকার অভিনয়ে শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার আর একটি দিককে সকলের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। 'প্রফুল্ল'র আগে পর্যন্ত তাঁকে সামাজিক ও হাস্যরস প্রধান নাটকে অভিনয় করতে দেখা যায়নি, তাই তিনি তখনো পর্যন্ত একজন সু-অভিনেতা বলে খ্যাতি লাভ করলেও, তিনি যে একজন চৌকস অর্থাৎ all round অভিনেতা, তা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই কঠিন ছিল। কিন্তু 'প্রফুল্ল' ও 'সধবার একাদশী'—উপরি-

উপরি এই দুখানি সামাজিক নাটকে পরস্পরবিরোধী দুটি কঠিন ভূমিকার অভিনয়ে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কেবল অপূর্ব ও বিচিত্র নয়, বিস্ময়করও বটে এবং বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি নিজের অভিনয়-ভঙ্গিকে অবলীলাক্রমে কতখানি বদলে দিতে পারতেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিমচাঁদ। নিমচাঁদের মধ্যে হাস্যরস আছে এবং সেই সঙ্গে আছে চিন্তাশীলতার সূক্ষ্ম-ধারা। তার মত্ততার প্রলাপ একসঙ্গে হাসায় ও ভাবায়। সাধারণ হাসির ভূমিকার মতো এই ভূমিকার অভিনয় করা তাই আদৌ সহজ নয়। শিশির-কুমারের নিমচাঁদ প্রমাণ করলো যে প্রতিভার মায়াস্পর্শে একটি বহু পুরাতন ভূমিকাও কতটা নূতন, জীবন্ত ও চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে। এ ভূমিকায় একটা প্রধান উপভোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে নিমচাঁদের বচনামৃত। এই বচনগুলি ঠিক-মতো আবৃত্তি করতে না পারলে ভূমিকাটি মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা। তাই গিরিশচন্দ্রের পর বাংলা ষ্টেজে উল্লেখযোগ্য নিমচাঁদের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। নাট্যমন্দিরে এই বইখানা প্রথম দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই জানেন শিশিরকুমারের মুখ দিয়ে নিমচাঁদের প্রত্যেকটি বচন কি ভাবে হীরের টুকরোর মত ফুটে উঠেছিল। নিমচাঁদের অচেতন মাতলামি ও সচেতন রসনিপুণতা এবং অধঃপতনের মধ্যেও তার আত্ম-সম্মান বোধ—এসব শিশিরকুমারের অভিনয়নৈপুণ্যে দীপ্যমান হোয়েই মঞ্চে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এ ভূমিকায় তাঁকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন।

পুরাতন অন্যান্য নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘চন্দ্রগুপ্ত’ ও ‘সাজাহান’ শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করেছিলেন। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে চাণক্যের অভিনয়ে তাঁর অপূর্ব সাফল্য তো তাঁর ছাত্রজীবনের কথা; এবং তখনই চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করে তিনি বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। সেই সময়ে শৌখিন অভিনেতাদের মধ্যে এই ভূমিকাটিতে অভিনয় করে আর একজন খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। পরিণত বয়সে পেশাদার মঞ্চে এই ভূমিকায় শিশিরকুমারের ছাত্রজীবনের এই খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা থিয়েটারে এ যুগের চারজন প্রসিদ্ধ নট এই ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছিলেন।

যথা—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, শিশিরকুমার ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। এঁদের মধ্যে একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন আর কারো চাণক্য উল্লেখযোগ্য নয়; চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার একমাত্র দানিবাবুর মধ্যেই তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শিশিরকুমারের চাণক্য স্বয়ং নাট্যকারের মনে অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীকালে মঞ্চে তাঁর চাণক্য তেমনি অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার যখন ছাত্র তখন দানিবাবু মিনার্ভা থিয়েটারে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এই ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার চৌদ্দ-পনর বছর বাদে ষ্টারে আবার তাঁকে দেখা যায় এই ভূমিকায়—তখন থিয়েটারে শিশিরযুগ এসে গিয়েছে। প্রাচীনপন্থী দর্শকরা বললেন, সেদিনও যেমন, আজো তেমনি—দানিবাবুর চাণক্য অতুলনীয়। তারপর তাঁরা যখন শিশিরকুমারের চাণক্য দেখলেন, তখন বললেন এ শুধু অতুলনীয় নয়, এ রীতিমতো বিস্ময়! যে দৃশ্যে চাণক্য বলেন, "কাত্যায়ণ, নাড়ি দেখতে পারো?"—অথবা যে দৃশ্যে চাণক্য মুরার সামনে চন্দ্রগুপ্তকে সম্বোধন করে বলেন—"মা, যার অপার শুভ্র করুণা মানব জীবনে" ইত্যাদি—সেই-সেই দৃশ্যে শিশিরকুমারের চাণক্যের অন্তর্ভেদী মর্মজ্বালার যে সুষ্ঠু অথচ সংকেতময় অভিব্যক্তি আর অভিনয়ের ভঙ্গিতে যে dignity প্রকাশ পেত, বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে সে জিনিস ছিল অকল্পিত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "শিশিরের চাণক্যের অভিনয় তাহার অভিনয়প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আত্রেয়ীর পুনঃপ্রাপ্তির দৃশ্যে নাট্যকার চাণক্যের অন্তর্জগতে যে তুমুল ভূমিকম্পরূপ বিপর্যয়ের কল্পনা করিয়াছেন, আবেগের শ্বাসরোধী আতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোলায়িত করিয়াছেন, তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে স্খলিত উক্তির সমাবেশে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপুলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।...নন্দের হত্যার পর চাণক্য যখন রক্তরঞ্জিত হস্তে তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে বাঁধিতেছে তখন তাহার মুখের অস্বাভাবিক উল্লাসের কি একটা বিকৃত, কুঞ্চিত-কুটিল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ আনন্দ

যেন ফেলিবারও নয়, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবারও নয়—চাণক্য-প্রকৃতির এক অংশ যাহা গভীর তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছে অপর অংশ তাহার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাইতেছে—এই অস্বস্তিকর আনন্দ চাণক্যের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই দৃশ্যের চরম অভিব্যক্তি রূপে শিশির নাট্যকারের অপরিকল্পিত আর একটি অঙ্গ-সঞ্চালনের আশ্রয় লইয়াছে। বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ চাণক্য, পৃথিবীর সকল আশা হইতে নির্বাসিত চাণক্য, কূটনীতির পাকে সমগ্র প্রাণশক্তিকে গুটাইয়া-রাখা চাণক্য, ঠিক আনন্দ-বিহ্বল স্কুলের ছেলের ন্যায় তিনটি লম্ফ প্রদানের দ্বারা তাহার অন্তর-নিরুদ্ধ উদ্বৃত্ত আবেগকে মুক্তি দিয়াছে। এই তিনটি লাফ চাণক্যের স্বাভাবিক চরিত্রের কত বিসদৃশ, অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত অনিবার্যরূপে সুসঙ্গত।" এই সংকেতময় আঙ্গিক-প্রচেষ্টার দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি আমাদের দেশের মঞ্চে এই প্রথম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইনস্টিট্যুটে শিশিরকুমারের চাণক্য দেখে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন: "শিশির বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবে।" দ্বিজেন্দ্রলালের এ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি।

তেমনি 'সাজাহান' নাটকে। অনেকদিনের পুরাণো নাটক এই 'সাজাহান'। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ নিষ্ক্রিয় হয়েও যেমন নাট্যের নায়ক, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানও তাই। বর্তমান যুগের উপযোগী করে শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরে এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করলেন। অতুলনীয় প্রযোজনা এবং নাম-ভূমিকায় ততোধিক অতুলনীয় তাঁর অভিনয়। 'নাচঘর' লিখেছিলেন: "নাটকের কেন্দ্র হচ্ছে সাজাহানের চরিত্র। সেখানে যুগপৎ বন্যা আর মরু-ঝটিকা এবং তারই মধ্যে অভাবিত ভাবে দেখা দেয় দয়া স্নেহ আর প্রেমের স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখা। প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দেখা গেল রোগে-দুঃখে পঙ্গু ভারতসম্রাট সাজাহান; সম্মুখে তাঁর অমর প্রেমের মর্মরস্মৃতির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাজমহল। প্রাসাদ-চক্রান্ত সৃষ্টি করেছে এক দুঃসহ অসহায় অবস্থার। তাঁর পায়ের তলা দিয়ে এই যে মর্মভেদী বিপুল ট্র্যাজেডির লীলা বয়ে যাচ্ছে, তা সম্রাট সহ্য করছেন কেবলমাত্র তাঁর জীবন-মরণের চির-আরাধ্যা, অতুল স্নেহ ও প্রেমের মানসী-প্রতিমা মমতাজের মুখ স্মরণ করে। তাঁর করুণ দৃষ্টি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে শুধু যেন এই

মৌনবাণীই ফুটে উঠছে—যে পৃথিবী আমার মমতাজের চরণ স্পর্শ পেয়েছে, সে কী এই পৃথিবী, হা ঈশ্বর—সে কী এই পৃথিবী !'' শিশিরকুমার-অভিনীত সাজাহান দেখে দর্শকের মনে এই ভাবই জাগত। ভারতসম্রাট সাজাহানের চিত্র যে এমন জ্বলন্তভাবে সংকীর্ণ রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে ফুটে উঠতে পারে, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে স্বপ্নেও সে কথা আমাদের মনে হয় নি। সাজাহানের সে কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি! পঙ্গু দুর্বল, পুত্রস্নেহাতুর ও পত্নী-প্রেমিক বৃদ্ধ সাজাহানের ভূমিকায় এ যুগের আরেকজন প্রসিদ্ধ নট অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী। মল্লযোদ্ধার মতো লম্ফ ঝম্ফ করে, বিকৃত মুখভঙ্গী করে তিনি এই delicate চরিত্রটিকে এমন ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেন, তার মধ্যে আর যাই থাক, সূক্ষ্ম রসবোধের কোনো পরিচয় নেই। যাঁরাই এই ভূমিকাটির অভিনয়ে শিশিরকুমারের মুখ, চোখ ও দেহের ভঙ্গী দেখেছেন এবং যাঁরা শুনেছেন সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর, তাঁরাই বুঝবেন তাঁর সাজাহান ও অন্যের অভিনীত সাজাহানের মধ্যে শিল্পগত ব্যবধান কত। ''তাঁর ঠোঁটের একটুখানি বাঁকা রেখা ও তাঁর চোখের অতি ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিও কত বেশী ভাব প্রকাশ করে। একটু দেহের কাঁপন, সামান্য দুটি আঙুল নাড়ার ভিতরেও কী গভীর অর্থ নিহিত আছে।'' গ্যালারি-সুলভ অভিনয় আর রসসমৃদ্ধ, অনুভূতিপুষ্ট অভিনয় যে এক জিনিস নয়, তার দৃষ্টান্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমারের সাজাহান। সাজাহানে তাঁর এই অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম দেখে গ্র্যানভিল বার্কার-এর অভিনয় সম্পর্কে শ'য়ের একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ে—"By creating poetic reality he can raise the spectator to the imaginative level in which the play lives and without this the theatre is nothing." রবীন্দ্রকাব্যরসে অভিসিঞ্চিত যাঁর মানস, যিনি সাহিত্যরসিক, সেই শিশিরকুমারের অভিনয়-রীতি যে বাংলা থিয়েটারে নবযুগ প্রবর্তন করে দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এই 'সাজাহান' তিনি দানিবাবুর সঙ্গেও একবার করেছিলেন। দানিবাবু ঔরংজেবের ভূমিকা অভিনয় করতেন।

পুরাতন নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় তাঁর প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আলমগীরের মতো রঘুবীরও বাংলা থিয়েটারে ব্যক্তিগত অভিনয়ের (personal acting) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। গিরিশযুগের এই অচল নাটকখানিকে স্বীয় অভিনয়-নৈপুণ্যে শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম সচল করে তুললেন। এ বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ 'রঘুবীর' নাটকখানি রচনা করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অমর দত্ত মিনার্ভা লীজ নিলেন। তখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন—একটির স্থলে যুগপৎ দুইটি থিয়েটার, ক্লাসিক তো ছিলই, এখন মিনার্ভা হোল। 'রঘুবীর' নাটক নিয়েই তাঁর সময়ে মিনার্ভার উদ্বোধন হয়েছিল। এই নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ ১৯০৪, ৭ই ডিসেম্বর। রঘুবীরের ভূমিকায় অভিনয় করেন অমর দত্ত আর জাফরের ভূমিকায় মহেন্দ্র বসুর নামবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য অপর একজন এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অমর দত্তের রঘুবীর একেবারে নিন্দনীয় হয় নি; তা যদি হোত, তা'হলে *Indian Mirror* লিখতেন না : "Babu Amarendra Nath Dutt, who undertakes the hero's role, lives it with every fibre of his living." কিন্তু তবুও এ নাটক সেদিন জমে নি, দর্শকচিত্তে এর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম আবেদন পৌঁছয় নি। তারপর এই নাটকখানির কথা সবাই বিস্মৃত হয়, অমর দত্তের পর আর কেউ একে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরার কথা চিন্তা করেন নি। তারপর ম্যাডানে যখন 'আলমগীর' মঞ্চস্থ হয় তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ শিশিরকুমারকে তাঁর এই অনাদৃত নাটকখানির কথা বলেন। আলমগীরে শিশিরকুমারের প্রতিভা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল শিশিরকুমার হয় তো রঘুবীরকে revive করতে পারবেন। শিশিরকুমারও তাঁর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের সন্ধান পেয়েছিলেন, তবে যুগের ধর্ম অনুসারে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক আর গীতিনাট্য রচনা করেই ক্ষীরোদপ্রসাদকে তাঁর প্রতিভার নিঃশেষ করতে হয়েছিল।

যাই হোক, শিশিরকুমার 'রঘুবীর' করবেন ঠিক করলেন এবং নাম-ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ হলেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন: "শিশিরকুমার রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেটা তাঁর রাম, আলমগীর, ইন্দ্র বা চাণক্য ভূমিকায় অভিনয়ের প্রকাশভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি রঘুবীরের ভূমিকায় প্রথমে উদ্বেল দ্বন্দ্বকে শান্ত করবার চেষ্টায় সময় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও যেমন কলাকারুসঙ্গত, শেষে প্রতিহিংসার বাধা-বন্ধন ছেদনের অসংযমের প্রকাশের ভঙ্গিটিও তেমনি অশান্ত। রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে শিশির-কুমারের style আরো একধাপ উচ্চ গ্রামে উঠেছে দেখা গেল।" আলমগীর, রাম, চাণক্য—এই তিনটি ভূমিকাতেই তাঁর style সমালোচক ও দর্শকদের আলোচনার বিষয় ছিল তখন। তাঁর রঘুবীর দেখে তাঁর অভিনয়প্রতিভার মৌলিকতা সম্বন্ধে রসজ্ঞ দর্শক নিঃসন্দিগ্ধ হলেন।

এই ভূমিকাভিনয়ে শিশিরকুমার যে শিল্পচাতুর্য দেখান তা যথার্থই অলৌকিক। 'অলৌকিক' কথাটি আমি ব্যবহার করছি 'Superb' এই অর্থে। বার্নার্ড শ' তাঁর *Our Theatres in the Nineties* গ্রন্থে লাইসিয়ম রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাট্যকার হেনরি আর্থার জোন্‌স্‌-এর একটি নাটকের অভিনয় সমালোচনাপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। শ' বলেছেন: "In the born writer the style is the man and with the born dramatist the play is the subject." শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও তেমনি acting was the subject with him—এ কথা বলা চলে। তিনি জন্ম-অভিনেতা—অভিনয়কলা তাঁব স্বভাবসিদ্ধ—সেই সঙ্গে শিক্ষা ও সাধনার সংযোগ ঘটায় তাঁর প্রতিভা রসের ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে নিত্য নূতন সৃষ্টির লীলা দেখাতে পেরেছে। রঘুবীরে তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করলেন যে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ব্যাপারটা যতখানি চিত্তবিনোদনের তার চেয়ে ঢের বেশি তা দর্শকদের মনকে রসের ও ভাবের শিল্পময় জগতে পৌছে দেবার জন্য। রঘুবীররূপী শিশিরকুমার প্রতি দৃশ্যে, প্রতি কথায়, প্রতি হাবভাবে, প্রতি বচনভঙ্গিতে মঞ্চে যে অপূর্ব মাধুর্যধারা সঞ্চারিত করতেন, তা লিখে বোঝাবার নয়। নর্মদার উদ্দেশে—"উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্মদা" বলে

রঘুবীররূপী শিশিরকুমার যে দীর্ঘ উক্তি করতেন, তাঁর সেই উদাত্ত স্বরলহরী দর্শকচিত্তকে সহজেই আপ্লুত করতো। অনন্তরাও-এর প্রতি, জাফরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দীর্ঘ উক্তিগুলি শুনে দর্শকগণ চকিত হয়ে উঠতেন। তাঁর যৌবনবয়সের রঘুবীর বৃদ্ধবয়সেও ম্লান হয়নি। তাঁর অতুলনীয় আবৃত্তিশক্তি এই চরিত্রটির রূপায়ণে অনেকখানি সহায়তা করতো। ব্রাহ্মণ ও ভীল-প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনায় শ্যামলীর প্রতি উক্তিতে তিনি যে রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অনুপমেয়। আবার পরীবাণুর উদ্ধারকল্পে আগত শৃঙ্খলিত রঘুবীর যখন

শক্তি দাও দেব মহেশ্বর
শক্তি দাও শরীরে আমার—

প্রভৃতি বলতে বলতে লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলতেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি দর্শকের মনে যে রোমাঞ্চ জাগত, তা বাংলা থিয়েটারে বিরল। সেই পরীবাণু আত্মহত্যা করতে চাইলে, রঘুবীররূপী শিশিরকুমার যখন বলতেন—"সে কি? আমি তোমারে ছাড়িব?"—তখন তাঁর কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গিতে যুগপৎ প্রকাশ পেত কারুণ্য, বাৎসল্য, দৃঢ়তা, ধর্মপ্রাণতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিবিধ ভাব। আবার পরক্ষণেই মানুষের ক্ষুদ্র-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, শ্যামলীকে রঘুবীর যখন হতাশব্যঞ্জক সুরে বলতেন:

ঊর্ধ্বে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ, পদতলে
অনন্ত ধরণী; যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী যেথা ভগবান, অবলার মহাবলদাতা।

তখন দর্শকচিত্তে মমতার যে স্রোত উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তা এক কথায় অনির্বচনীয়। পঞ্চম অঙ্কে যে দৃশ্যে রঘুবীরের ভীল-প্রকৃতি অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে আত্মপ্রকাশ করত, সেই দৃশ্যে শিশিরকুমার যে অভিনয় করতেন, তা পৃথিবীর অভিনয়-ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। রঘুবীরকে চিনতে পেরে অনন্তরাও যখন বললেন—"এ কী মূর্তি? রঘুবীর! রঘুবীর!" —নাটকের সেই চরম মুহূর্তে রঘুবীরের কণ্ঠে তখন শোনা যেত:

রঘুয়া! রঘুয়া!

রঘুবীর নহি আর পিতা
মরে গেছে রঘুবীর।

তখন স্তব্ধ বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে—নির্বাক নিস্পন্দ নিথর হয়ে দর্শকগণ উপলব্ধি করতেন নাটকের সমগ্র নাট্যরসকে শিশিরকুমার কোন্ height-এ পৌঁছে দিলেন। এ অভিনয়ের তুলনা নেই।

এই শক্তিবলেই শিশির-প্রতিভা সেদিন অসাধ্যসাধন করেছিল—গিরিশ-যুগের ধারাকে রাতারাতি ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সমগ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি তাই সেদিন এই একটি মানুষের অভিনয়ের গুণে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাখালদাস প্রভৃতি মনীষিরা শিশিরকুমারের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। একেই বলে revolution—যুগান্তর।

'নর-নারায়ণে' কর্ণ আর 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদিরশাহ শিশির-প্রতিভার আর দুটি বিস্ময়কর শিল্প-স্বষ্টি। 'সীতা'-র রাম আর 'নর-নারায়ণ'এর কর্ণ—দুটিই ট্র্যাজিক-চরিত্র। রামের মতই কর্ণের ভূমিকাভিনয় নয়নাভিরাম হয়েছিল—কর্ণের ভাবরসকে শিশিরকুমার আরো দীপ্ত করে তুলেছিলেন। রবিদ্যুতিমান আদিত্যপ্রভ কর্ণের চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যেমন বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমন এই চরিত্রটির রূপায়ণে শিশিরকুমার পৌরাণিক চরিত্রাভিনয়ে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। কর্ণের জীবন-নাট্যের ট্র্যাজেডিই এই নাটকের উপজীব্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটক নয়, নাট্যকাব্য। কর্ণের মনোরাজ্যের বিপুল ত্যাগের ইতিকথা, তার বীরত্বের দুর্জয় অভিমান, আভিজাত্যের অহঙ্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এক অতিমানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রত্যক্ষ করেও তাঁকে ভগবান বলে, নারায়ণ বলে অস্বীকার করা—সংক্ষেপে এই হোল ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ।

কর্ণের এই কঠিন ভূমিকায় রূপারোপ করেছিলেন শিশিরকুমার। তাঁর এই অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সাপ্তাহিক 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিলেন: "অদ্ভুত ও অতুলনীয় অভিনয়নৈপুণ্যে শিশিরকুমার এই

বিরাট চরিত্রকে দর্শকের চক্ষের সমক্ষে উজ্জ্বল দীপ্তিতে মূর্ত করে তুলেছিলেন।" কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডি ও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব—এই দুটি বিষয়কে শিশিরকুমার মঞ্চে স্তরে স্তরে প্রতি দৃশ্যে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা বা ব্যাখ্যান দেওয়া অসম্ভব।

চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীবিন্যাস, ভক্তিবাদ, সঙ্গীতপ্রবণতা এবং সর্বোপরি কবি-কল্পনা—এইসব বিবিধগুণের সমাবেশে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' সত্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা (তুলনায় তাঁর 'ভীষ্ম' নাটক এতখানি উৎকৃষ্ট নয়) এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। মহারথ কর্ণ এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলে মেনে নিতে কর্ণের প্রথম আপত্তি। 'সূচনা' দৃশ্যে কর্ণের মুখে নাট্যকার যে বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক সংলাপ দিয়েছেন তা শিশিরকুমারের অভিনয়ে যে কী মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল, তা বলবার নয়। কর্ণরূপী শিশিরকুমার যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ

বলে কিনা—নারায়ণ নরদেহ-ধারী
দেহরক্ষী গাণ্ডিবীর!
সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল
যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন করে আছে অনন্তভুবন,
বলে কি না—
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে!

তখন তাঁর কণ্ঠে দু'বার 'বলে কি না'—এমন একটি ভঙ্গিতে উচ্চারিত হোত, যার মধ্যে থাকত ভাবপ্রকাশের এক অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। নায়কের অন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাভাস আছে। সেখানে একটি সংলাপে যেখানে কর্ণের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলিয়েছেন ;

অন্তর্যামী বিভু নারয়ণ, বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ—

সেইখানে কর্ণের অন্তরে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর শক্তিপরীক্ষার আসন্ন সুযোগে

উল্লসিত কর্ণের চিত্রকে মঞ্চে শিশিরকুমার যেভাবে রূপায়িত করতেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কর্ণের জীবনের পশ্চাৎপটে রয়েছে নিয়তির চক্রান্ত, নাটকে এ জিনিস যেমন ফুটেছে, তেমনি মঞ্চে তা অভিব্যক্ত হোত শিশিরকুমারের চিত্তস্পন্দী অভিনয়ের মাধ্যমে। সেই অভিশপ্ত জীবনের আত্মদ্বন্দ্বকে প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি কথার উচ্চারণ ভঙ্গিতে কী সাবলীলভাবেই না তিনি ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। জগতের অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা কুড়িয়েও কর্ণের মধ্যে একটি অভিমান ছিল। তিনি সূতপুত্র। কিন্তু কর্ণের সে-অভিমানও শেষ পর্যন্ত রইল না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্মরহস্য প্রকাশ করলেন। তিনি জানলেন অর্জুন তাঁর ভাই—অমনি কর্ণের আজন্মপোষিত সংকল্প কোথায় ভেসে গেল। সেই নাটকীয় মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই যে সদ্যোজাত ভ্রাতৃস্নেহ সেই সংকল্পের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হোল :

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা—বাসুদেব !
মনভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি'
শুনাতে আসিলে তুমি
মনঃক্ষোভ কথা ! (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

—এই কথাগুলোর মধ্যে মহাবীর কর্ণের মর্মবেদনা হৃদয়ের ক্ষতমুখে প্রকাশ পেয়েছে। শিশিরকুমারের অভিনয়ে থাকত এই মর্মবেদনার এক মর্মস্পর্শী আবেদন। নাট্যমন্দির-মঞ্চে এই নাটকের শেষদৃশ্যটি অভিনয় ও প্রযোজনায় এমন চিত্তস্পন্দী হয়ে উঠতো যে তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। রণক্ষেত্রে ভগ্নরথে হেলান দিয়ে কর্ণ বসে আছেন। শক্তিমান্ পুরুষ, আজ জীবন-সায়াহ্নে স্মৃতির রোমন্থন করছেন। যুগপৎ সংশয় ও বিশ্বাস তাঁর মনে জেগেছে। তাই মৃত্যুমুখে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই স্বীকৃতি :

আর তো মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব !

কুন্তীই কর্ণের মৃত্যুরূপা নিয়তি। যে মায়ের প্রভাব তিনি আজীবন অস্বীকার করে এলেন, আজ জীবনের চরম মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই মায়ের প্রভাবই

কর্ণকে মানতে হোল। তখনি উদ্বেলিত হয় সেই মহাবীরের অন্তরে সোদর-মমতা আর সেই মুহূর্তেই ঘনিয়ে এলো মৃত্যু। এই দৃশ্যে শিশির-কুমারের অভিনয়, যে তুঙ্গতাকে স্পর্শ করতো, তা পৃথিবীর যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজিক অভিনেতার ঈর্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অর্জুন ছিল এই নাটকের দুর্বলতম অভিনয়। সেই-জন্য পরে শিশিরকুমার কর্ণ ও অর্জুন এই উভয় ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন। তাঁর অভিনয় এই চরিত্রটির মধ্যে একটা নবজীবনের সঞ্চার করে। ভুবন-বিজয়ী গাণ্ডীবধারী মহারথী অর্জুন যে একেবারে শ্রীকৃষ্ণের হাতের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন না, তৃতীয় পাণ্ডবের নিজের ব্যক্তিত্বও যে কিছু ছিল, তা শিশিরকুমার-অভিনীত অর্জুনের মধ্যে দর্শকরা অনুভব করেছিলেন। নাট্য-মন্দিরের যুগে শিশিরকুমার অসম্ভব পরিশ্রম করতেন, নইলে একই নাটকের দুটি প্রধান ভূমিকায় সমান কৃতিত্বের সঙ্গে কেউ অভিনয় করতে পারে?

দিগ্বিজয়ীর 'নাদির' শিশিরকুমারের আর এক অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি।

নাদিরশাহের পূর্বে শিশিরকুমার আলমগীর করেছেন। এবং অতুলনীয় ভাবেই করেছেন। তাঁর নাদির কিন্তু আলমগীরের পুনরাবৃত্তি বা repetition নয়। যিনি প্রকৃত শিল্পী—creative artist, তার এক সৃষ্টি কখনই আর এক সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। স্যর হেনরী আরভিং, ফরবেস রবার্টসন, স্যর লরেন্স অলিভার অথবা গ্রানভিল বার্কার—ইংলণ্ডের এই সব প্রসিদ্ধ মঞ্চাভিনেতা শেক্সপিয়ারের নাটকের—বিশেষ করে হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু এঁদের কারোরই অভিনয়ে ঐ দুটি চরিত্রের অভিনয়ের পুনরুক্তি থাকত না। ঐতিহাসিক চরিত্রের অভিনয়ে ভাবভঙ্গি, চলন-বলনের পুনরুক্তি পরিহার করে বিভিন্ন চরিত্রকে চরিত্রানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। Creative artist যিনি হবেন, তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিই হবে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—পরস্পরের সঙ্গে তুলনাবিহীন এক নূতনত্বের বিস্ময়ে অপূর্ব। নাদিরশাহ তাই আলমগীরের পুনরুক্তি নয়। শিশির-প্রতিভা সৃজনধর্মী—সেখানে repetition-এর স্থান নেই। তা যদি না হোত তাহলে মাত্র

কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় করেই সে প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যেত। ১৯২৪-এ আলমগীর-এর ভূমিকায় যিনি আত্মপ্রকাশ করলেন, সেই মানুষই বত্রিশ বছর বাদে 'প্রশ্ন' নাটকে নীতিনের ভূমিকায় কি করে অভিনয় করেন? Individuality of style ভিন্ন এই জিনিস সম্ভব নয়। শ' তাই বলেছেন—"Only a creative actor can impart finish, dignity and grace to every role he performs and can touch it with imagination. The exactiiude of expression of thought and feeling is seldom found—it depends on the conception of the character, without which the representation is bound to be spurious."—*Plays and Players.*

আগেই বলেছি, অভিনেয় প্রতিটি চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করতেন শিশিরকুমার এবং এইজন্যই তাঁর অভিনীত কোনো দুটি ভূমিকাই কখনো এক রকমের মনে হোত না। নাদিরশাহের ভূমিকাভিনয়ে তিনি নূতন করে তার প্রমাণ দিলেন। নাদিরের মধ্যে কোথাও আলমগীর উঁকি মারে নি—না ভঙ্গিতে, না চলনে-বলনে।

শিশিরকুমারের নাদির সম্পর্কে 'নাচঘর' লিখেছিলেন: "কী সূক্ষ্ম এই নাদিরশাহের অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠের সামান্য অর্ধস্ফুটধ্বনির ভিতরে এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাংলা দেশের আর কোন অভিনেতাকে তেমন চেষ্টা করতে দেখিনি। এই সূক্ষ্মতাকে সেদিন অনেকে হেঁয়ালী বলে ভুল করতেন, কেউ বা বলতেন ছেলেবেলা। এ সূক্ষ্ম অভিনয় সজাগ হয়ে দেখবার জিনিস, এতটুকু অসতর্ক হলেই অনেকখানি সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। মনে করুন একবার নাটকের প্রথম অঙ্কের সেই প্রেমনিবেদনের দৃশ্যটি। নাদিরশাহ যেভাবে সিতারার কাছে প্রেম নিবেদন করছে, তেমন অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে যে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করেও প্রেম জানানো যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার পূর্বে কেউ তা কল্পনাই করতে পারে নি।…কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখান নেই, বিকৃত থিয়েটারী কণ্ঠস্বর নেই, দৃশ্যকে জমকালো করবার জন্য হরেক রকম প্যাঁচ নেই, অথচ কত সহজে

পৃথিবীর এই অতি পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ করে তুলেছে। চতুর্থ অঙ্কের সর্বশেষে ভারতনারীর করুণ আত্ম-নিবেদনের পরে নাদিরশাহের সেই পা টানতে টানতে চলা যে কতখানি ভাবের সন্ধান দিয়েছে তা অনুভব করে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন।" এখানে শিশিরকুমার দৃশ্যটিকে মেলোড্রামাটিক করে না তুলে, কেবল মাত্র "ইঙ্গিতেই সূক্ষ্মভাবের সুষমা ও করুণ রস সৃষ্টি করেছেন।" এ জিনিস অভিনয় নয়; অভিনয়ের অতিরিক্ত কিছু যা প্রখর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন অভিনেতা ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

"নাদির ভূমিকার সর্বত্রই এমনি সৌন্দর্যকণা ছড়ান ছিল। একটি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য শিশিরকুমার যে রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করতেন, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভাব্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি থাকে, তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্ত যে সে সমস্তের কিছুই ত্যাগ করে না, 'দিগ্বিজয়ী' তার অন্যতম উদাহরণ। শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর ভাবব্যঞ্জক—কোন বাঙালি অভিনেতার এমন কণ্ঠস্বর নেই। দেখা গেল নাদির-ভূমিকায় তাঁর এই বহু-প্রশংসিত কণ্ঠস্বরের লীলা হয়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্র গতি মধুর।... নাদিরশাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখিনি—দেখেছি শতাব্দীর অন্ধকার ঠেলে জেগে-ওঠা ইতিহাসের নাদিরশাহকে। দুঃখী নিম্নশ্রেণীর সন্তান নাদিরশাহ সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। নাদির-চরিত্রের এই তথ্যটি শিশিরকুমার কোথাও এড়িয়ে যান নি। রাজপোষাকের হীরা জহরত ঠেলে নাদিরের চাষাড়ে ভাব, বিদ্যাহীন মন, ভদ্রতাহীন রুক্ষ প্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি সর্বদাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অথচ তার ভিতর থেকেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধির চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাবার তা পেয়েছে। একটি চরিত্রের দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি একমাত্র শিশির-কুমারের সূক্ষ্ম অভিনয়েই সম্ভব। এই নাটকে নাদিরশাহই হচ্ছে একমাত্র ভূমিকা, যা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। এই অভিনয়দর্শনের প্রীতিপ্রদ স্মৃতি জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না। বন্যার মত বেগে ছুটেছে ভাবের প্রবাহের পর প্রবাহ, তড়িৎশক্তিতে ফুটে উঠেছে চিত্রের পর চিত্র। আর সেই জিনিসকে অভিনয়ে রূপ দিয়ে চলেছেন শিশিরকুমার। ভাষায় তাকে

কতটুকু প্রকাশ করা যায়?" আর একটি কথা। পরিবেশ সৃষ্টির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে নাট্যমন্দিরে 'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; শিশিরকুমারের প্রয়োগপ্রতিভার বহু উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছিল এই নাটকের উপস্থাপনার মধ্যে—শিক্ষণীয় ছিল অনেক জিনিষ।

'দিগ্বিজয়ী' নামটির মধ্যে একটা বড়ো রকমের শ্লেষাত্মক ভাব আছে। সেই ভাবটি এই সংলাপের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। নাদিরের মুখ দিয়ে নাট্যকার যেখানে বলিয়েছেন:

দয়া নহে প্রকৃতি নিয়ম—
শক্তিমাত্র আশ্রয় জগতে!
শক্তি যার যতটুকু
অধিকার ততটুকু তার
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—
মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা···

সেখানে 'শক্তিমাত্র আশ্রয় জগতে' এই লাইনটির মধ্যে 'শক্তিমাত্র' কথাটির উচ্চারণভঙ্গি যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয়ে লক্ষ্য করতেন, তাঁরাই বুঝতেন নাদিরের ছবিকে, তার মনের ছবিকে তিনি কী সূক্ষ্মতার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেন। নাদিরের মনের অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা, সিরাজীর প্রতি তার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা, সকলের ওপর তার পারিবারিক জীবনের অশান্তি—এইসব জিনিস যুগপৎ কী সূক্ষ্মভাবে যে নাদিররূপী শিশিরকুমারের অভিনয়ে ফুটে উঠত, তা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার বিষয়। নাদির-চরিত্রের মূল কথা ভাঙাগড়া—এ ভাঙাগড়া তাঁর নিজেকে নিয়ে। 'দিগ্বিজয়ী'ও একখানি ট্র্যাজেডি এবং নাদিরের ট্র্যাজিক-চরিত্রকে শিশিরকুমার এক আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর বহু স্মরণীয় চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে নাদিরশাহ একটি।

*

'ষোড়শী'-তে জীবানন্দ শিশির-প্রতিভার আর একটি অনুপম শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃত। এ কথা বলা যেতে পারে যে, শিশিরকুমার এই ভূমিকাটির অভিনয়ে introversion-এর (অন্তরাপেক্ষা) প্রকাশে যে অভিনয়নিপুণতা

সীতা নাটকে রাম—শিশির
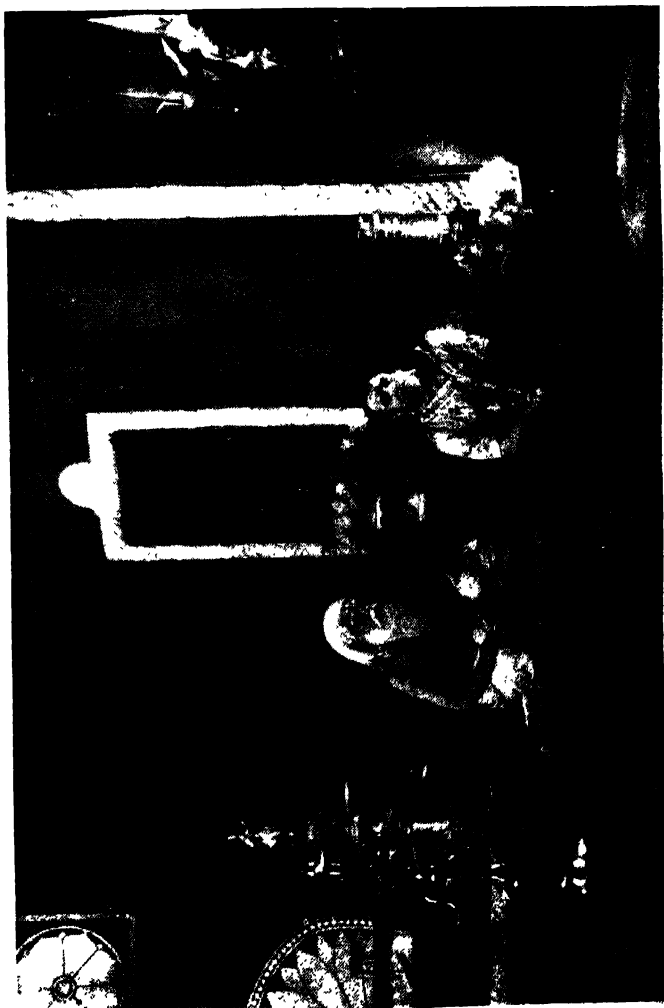
রিজিয়া নাটকে বক্তিয়ারের ভূমিকায়—শিশিরকুমার

দেখিয়েছেন, তা স্রষ্টার সৃষ্টিকেও অতিক্রম করেছে। তাঁর জীবানন্দ, এক কথায়, "all life"—জীবন্ত। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমরা এই জীবানন্দের ভূমিকায় মধ্যে লাভ করেছি। শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশির-কুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর সুধার আস্বাদ লাভের সুযোগ উপস্থিত, না দেখে তা ধারণা করা অসম্ভব। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি; নূতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের মূর্তি।...এ-রকম ভূমিকায় যা পাওয়া উচিত, আমরা তা থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইনি। নাটকের পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে বিশেষ করে যে সৌন্দর্য, যে ভাব-বৈচিত্র্য এবং যে হাসিকান্নার প্রশান্ত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, দর্শকদের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারে না। জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়—আসলে তা হচ্ছে সৃষ্টি—স্বাধীন সৃষ্টি, যা নাটকের মুখাপেক্ষা করেনা।" অমৃতলাল বসু এই অভিনয় দেখে তাই মন্তব্য করেছিলেন—"ষোড়শী-র জীবানন্দের মত wretched part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরের পক্ষেই সম্ভব।" স্বাভাবিকতাকে নিজের ইপ্সিত আকারের মধ্যে এনে স্বেচ্ছামত রূপ দেওয়া যে কি জিনিস—শিশিরকুমারের জীবানন্দ তারই একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে রইল বাংলা থিয়েটারে। "বুঝলে এককড়ি, ওটা চাই—" এই কথা কয়টি বলবার সময়ে জীবানন্দরূপী শিশিরকুমারের চোখের দৃষ্টিকে যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁরাই জানেন, কী সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থাকত ঐ ক'টি কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে, আর কি শিল্পময় সংকেত থাকত সেই দৃষ্টিতে।

আবার বলি, শিশিরকুমারের অভিনয় সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে অনুভবের জিনিস্—চিত্তবিনোদনটা সেখানে নিতান্তই গৌণ—মুখ্য হয়ে ওঠে ভাবসন্ধি, অভিনয়ের যা মূলকথা। শিশিরকুমারের অভিনয়—একাধারে চরিত্রবিশ্লেষণ ও কাহিনীর উদ্ভাসন। এই শক্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ছিল। সেই যে তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভে শিশিরকুমার বলেছিলে[illegible]—"আ[illegible] [illegible] আর্ট বেচে খাব না—" সে কথা তিনি অক্ষরে [illegible]রে [illegible]রে গেছেন। কোনদিনই, এমন কি শ্রীরঙ্গমের দৈন্য অবস্থায়ও [illegible]ন [illegible]গীর ও ষোড়শীর

মত বইয়ের বিক্রী নিতান্ত কয়েকটি টাকার বেশি উঠত না) তিনি আর্ট বেচে খান নি। শিল্পকে পণ্য করে তোলেন নি। মাঝে মাঝে বলতেন, "বই 'মার খাওয়া' জিনিসটা ছিল আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, ইদানিং সে অভিজ্ঞতা হোল। তবে কি অভিনয়ের ধারা বদলাব? গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, লম্ফ-ঝম্ফ মেরে, যাকে বলে play to the gallery—সেই রকম অভিনয় করব?" শ্রীরঙ্গমে এমন দিনও গেছে, প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগম আশানুযায়ী তো হয়-ই নি, সংখ্যার হিসাবে কোনো নটকেই তা inspire করে না, তবু দেখেছি শিশিরকুমার তাঁর ধর্মাচরণে এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি। দু'হাজার দর্শককে তিনি যা পরিবেশন করেছেন তাঁর গৌরবান্বিত নটজীবনের মধ্যাহ্নকালে, বৃদ্ধবয়সে অস্তমিত গৌরবের দিনেও পঞ্চাশজন দর্শকের সামনে তিনি সেই একই জিনিস পরিবেশন করেছেন অকৃপণ হস্তে, রস-সৃষ্টির ইতর-বিশেষ বড়ো একটা দেখা যেত না। একেই বলে মহৎ শিল্পী।

শিশিরকুমারের জীবানন্দ সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন: "জীবানন্দ কতখানি পাষণ্ড ও কতখানি হৃদয়বান, তাহার মধ্যে নীচ ও উচ্চ প্রকৃতি কি পরিমাণে মিশ্রিত অত্যাচারী জমিদার ও ব্যথানিপীড়িত মানবসত্তার পরস্পরবিরোধী অংশ তাহার মধ্যে কি অপরূপ ঐক্যে সম্মিলিত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত বিলাসী ও ট্রাজেডির উন্নত চরিত্র নায়ক কেমন করিয়া তাহার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত, এই জটিল দ্বৈততত্ত্ব—যাহা হাজার বার বই পড়িয়া ও সহস্র প্রকারের সূক্ষ্ম সমালোচনার সাহায্যেও সুস্পষ্ট হইত না—শিশিরের অভিনয়ে খোলা বইএর পাতার মত সহজবোধ্য হইয়াছে। জীবানন্দের পরিবর্তন যে অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য নহে, ধীরে ধীরে তুষের আগুনে পুড়িয়া তাহার অন্তর বিশুদ্ধ হইয়াছে, রায় মহাশয়ের ন্যায় ক্ষুরধার বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ও চক্রান্তকুশল সমাজপতির বিরুদ্ধে, নিজে অপরাধের সহকারীরূপে জেলে যাইবার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াও, সে যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছে—শিশিরের অভিনীত জীবানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের নিকট সূর্যালোকবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে।" আমার ব্যক্তিগত মতে জীবানন্দের ভূমিকাভিনয়ে

শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়কলার শেষ কথা বলেছেন—he has said the very last word in his acting—এবং এইটিকেই আমি তাঁর নটজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলতে চাই। তাঁর জীবানন্দ কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। জীবানন্দের প্রতিটি মুহূর্তের অভিনয়ে অনন্যমনা নাট্যাচার্য কখনো দর্শকদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দেন নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরঙ্গমে এই ষোড়শী নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন পুডোভকিন ও চেরকাশফ। শিশিরকুমারের প্রদীপ্ত অভিনয়ে মুগ্ধ এবং হতবাক হয়ে তাঁরা তাঁকে মস্কো আর্ট থিয়েটারের সুবিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক স্ট্যানিশ্লাভিস্কির সমতুল্য বলে অভিনন্দিত করেছিলেন সেদিন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। দেখেছিলাম যে এইরকম প্রশস্তি লাভ করেও নাট্যাচার্য কিছুমাত্র উল্লসিত বোধ করেন নি। পরে বলেছিলেন—"Such pattings mean nothing to me ; I am what I am."—তাঁর এই উক্তিটি মনে রাখবার মতন।

'বিজয়া'র রাসবিহারী তেমনি আর একটি চরিত্র যার রূপায়ণ দেখে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেককে বলতে শুনেছি যে শিশিরকুমারের রাসবিহারী শরৎচন্দ্রের রাসবিহারী নয়। নয়ই তো। প্রথম কথা, 'বিজয়া' 'ষোড়শী'র মত independent নাটক নয়, 'দত্তা'র নাট্যরূপ এবং উপন্যাসের নাট্যরূপের সকল ক্রটিই এর মধ্যে লক্ষ্যণীয়। আর সে নাট্যরূপও খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করতে হয়েছিল। নব-নাট্যমন্দিরে তখন নতুন কোনো ভাল নাটক ছিল না শিশিরকুমারের হাতে। একদিনের কথা মনে আছে। নাটকের উদ্বোধনের তখন তিন-চারদিন বিলম্ব আছে। ষ্টারের ওপরে শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি একত্রে 'বিজয়া' সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। তার আগে রিহার্স্যালে শরৎচন্দ্র শিশিরকুমারের রাসবিহারী দেখে বলেছিলেন, "শিশির, রাসবিহারীর characteristicsগুলো তুমি বদলে দিয়েছ, মনে হচ্ছে।" সেদিন শিশিরকুমার বলেছিলেন, "শরৎ দা,' নাটক আপনি লিখেছেন, অভিনয় করব আমি, আমার

নিজস্ব একটা conception আছে এই চরিত্রটি সম্পর্কে যেটা আপনার উপন্যাসে-বর্ণিত রাসবিহারীর conception থেকে কিছু তফাৎ। উপন্যাসের রাসবিহারীকে মঞ্চে দাঁড় করালে তার আবেদনটা দর্শকদের মনকে ঠিক স্পর্শ করতে পারবে না। জানেন তো শ' বলেন: 'The function of the actor is to make the audience imagine for the moment that real things are happening to real people.' আর্ভিং সাহিত্যিকের তৈরী মাচার ওপর দাঁড়িয়ে নিজের সৃষ্টি জাহির করতেন, আর বিয়ারবমের ট্র্যাডিশন ছিল creative acting—আপনার রাসবিহারী-চরিত্রটির অভিনয়ে আমি সেই ট্র্যাডিসনই follow করেছি। দেখবেন, অডিয়েন্স নেবে।"

শিশিরকুমারের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। তাঁর রাসবিহারী, কঙ্কাবতীর বিজয়ার পাশে কিছুটা দীপ্তিহীন হয়ে পড়লেও, একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি হিসেবেই পরিগণিত হবে। তাঁর রাসবিহারী একটু চমকপ্রদ অর্থাৎ কিছুটা serio-comic হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দর্শকচিত্তে এই কুটিল চরিত্রের মানুষটি সম্পর্কে interest জাগিয়ে তোলার জন্য এর প্রয়োজন ছিল মনে হয়, নতুবা 'বিজয়া' নাটক দাঁড়াত না। রাসবিহারীর ভূমিকাভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিলেন: "ঘটনা ও অবস্থাভেদে তাঁর চাহনি ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন এবং মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রুতে হস্ত-সঞ্চালন ভণ্ড, কুটবুদ্ধি প্রতাপশালী ব্যক্তিটিকে দর্শকদের চোখের সামনে এমন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়ে দেয় যে, সমস্ত প্রেক্ষাগার শিশিরকুমারের অভিনয়কে সারাক্ষণ ধরে রীতিমত উপভোগ করে। তাঁর কথা বলবার ধরণ, বিলাসের প্রতি কপট দৃষ্টি নিক্ষেপ, মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্যে প্রণামের ভাণ দর্শকমহলে হাসির হর্রা ছুটিয়ে দেয়। রূপসজ্জারও প্রশংসা করি।" রাসবিহারী গৃধ্নু, কপট ও চক্রান্তকারী—অতএব অভিনয়ের দিক দিয়ে একটি unsympathetic চরিত্র। একদা ললিতমোহন লাহিড়ী 'সীতা' নাটকে বশিষ্ঠের মত একটি unsympathetic অংশে অভিনয় করে অনেক দর্শকের নিকট অপ্রিয় হয়েছিলেন, এই কথা শিশিরকুমারের বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই রাসবিহারী-চরিত্রটিকে কিছুটা serio-comic

(বুদ্ধদেব বসুর কথায় "প্রহসনের স্থূল বিদূষক") করা ভিন্ন আর কোনভাবেই তাকে আকর্ষণীয় করা চলত না।

স্থূলতা (crudeness) এবং কপটতা এই চরিত্রটির আর একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীকুমারবাবু তাই মন্তব্য করেছেন: "রাসবিহারীর বাইরের মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতি-ধর্মবোধের নীচে তাহার এই স্থূলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রাহ্মধর্মের নামে যতই সূক্ষ্মধর্মবোধ ও রুচি-বৈদগ্ধ্যের ভাণ করুক না কেন আসলে সে একজন অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য পাটোয়ারির পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি।—ভণ্ড মাত্রেই স্থূল। এই গোপন সংরক্ষিত ইতরতার বহিঃপ্রকাশই হাস্যরসসৃষ্টির বিশেষ হেতু হইয়াছে। ..শিশির তাহার অভিনয়ে এই স্থূলতাকেই সূক্ষ্মভাবে প্রকট করিয়াছে। তাহার চেয়ারে বসিবার ভঙ্গি, তাহার দুগ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদের মাঝে মধ্যে যেন বিস্মৃতিবশে হাঁটুর উপর উঠিবার অশালীন প্রবণতা, এই জাতীয় দুই-একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে শিশির এই চরিত্রটির প্রকৃত রূপ ফুটাইয়াছে।"

খুব বড়ো একটা উচ্চাশা নিয়ে শিশিরকুমার 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ করেছিলেন। ভাল নাট্যকারের অভাব তিনি তাঁর নটজীবনের গোড়া থেকেই অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ওপর তাঁর খুব প্রত্যাশা ছিল। শিশিরকুমার বলতেন, "রবীন্দ্রনাথ মনে করলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হতে পারতেন।" রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বলতেন, "রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটক অভিনয় করেছি, তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করেও আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ একেবারে আমার সকল স্নায়ুর আনন্দ। তাঁর নাটক আমি তাঁর চেয়ে ভাল অভিনয় করেছি—এ আমি গর্ব করে বলতে পারি।" রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' গতানুগতিক নাটক নয়, এর অভিনয় কঠিন। রাজর্ষি উপন্যাস থেকে এই নাটকের সৃষ্টি। "এর কাব্যাংশ এবং নাট্যাংশ এমন সূক্ষ্ম সূত্রে একত্র গ্রথিত যে এর একটির উপর একটু বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই অন্যটি অত্যন্ত খর্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। সেইজন্য এর অভিনয়ের

মধ্যে অত্যন্ত জটিলতা আছে।" এই জটিলতা চরিত্রগত ও ভাবগত, দুই-ই। ভাবগত জটিলতাকে অভিনয়ে পরিস্ফুট করা প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। প্রয়োগকৌশলের দিক দিয়ে যেমন, অভিনয়ের দিক দিয়েও তেমনি নাট্যমন্দিরে 'বিসর্জন'-এর অভিনয় বাংলা থিয়েটারে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করে দিয়েছিল সেদিন। ভাব-সমৃদ্ধ এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার দর্শকমানসেও একটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। যুগ-সচেতন শিল্পী তিনি; নাট্যমন্দির থেকে শ্রীরঙ্গম—এই তিন পর্বেই তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রখরভাবে সচেতন ছিলেন এবং তা পালনে সাধ্যমত যত্নবান ছিলেন। মঞ্চে তাঁর প্রত্যেকটি Production ছিল অর্থপূর্ণ, ব্যাঞ্জনাময়।

'বিসর্জন' নাটকের সবচেয়ে কঠিন অংশ জয়সিংহের ভূমিকা। এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় legend হয়ে আছে। শিশিরকুমার প্রথমে এই চরিত্রটিতে অবতীর্ণ হন নি; প্রথমে তিনি রঘুপতির ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন; পরে তিনি 'জয়সিংহ' করেন। তাঁর রঘুপতি সম্পর্কে 'নাচঘর' লিখেছিলেন: "রক্তবস্ত্র পরিহিত শক্তি-পূজারী ব্রাহ্মণের মূর্তিতে তাঁকে মানিয়েছিল ভালো। তাঁর চলা-বলায়, দাঁড়ানো ও হাত-নাড়ার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, যদিও তিনি নাটকের রাজা নন, তথাপি যেন সকলের হৃদয়-মনের অধিপতি তিনিই। তাঁর সাজসজ্জা সবই ভালো কিন্তু তবু আমাদের মন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করছিল এইজন্য যে তিনি তাঁর নিজের চেহারা ভালো করে গোপন করবার চেষ্টা করেন নি কেন? চেহারার বিভ্রম দিয়ে চরিত্রগত রূপকে চোখের সামনে এনে খাড়া করলে প্রথম দেখাতেই মনের মধ্যে এতখানি গভীর রেখাপাত করে যে তাতেই অভিনয়ের অর্ধেক কাজ হাঁসিল হয়ে যায়। এই সুবিধার প্রতি শিশিরকুমারের অবহেলা আমরা মোটেই অনুমোদন করি না।"

তারপর যখন জানা গেল শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ-অভিনীত ভূমিকায় রূপ দেবেন, তখন নাট্যামোদী শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে কম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি। জয়সিংহের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ একদা সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। দেখা গেল, শিশিরকুমারের অসামান্য

নাট্যপ্রতিভার গুণে তাঁর অভিনীত জয়সিংহ সেই রকমই উদ্দীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। "পরিধানে চাঁপাফুলের মতন একখানি ক্ষৌমবসন, গৌর অঙ্গে জবাফুলের মত রক্তরাঙা রেশমী আংরাখা, মাথায় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে একটি সুন্দর সোনালী রঙের চিকন কেশবন্ধ শোভন করে বাঁধা, স্কন্ধে তার রুধিরাক্ত লোহিত উত্তরীয় বিলম্বিত প্রকোষ্ঠে তার স্ফটিক মণিবন্ধন, নগ্নপদে সেই সুধীর সুব্রত ব্রহ্মচারী যখন রঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন—সেই সুঠাম সুকান্ত সুবেশ সাধকের তপ্তকাঞ্চনকান্তি তরুণ মূর্তি প্রথম সন্দর্শন করেই দর্শকচিত্ত যুগপৎ মুগ্ধ ও উল্লসিত হয়ে উঠল।" ভিখারিণী মেয়ে অপর্ণাকে তার নিবিড় স্নেহ বাহু দিয়ে ঘিরে নিয়ে জয়সিংহরূপী শিশিরকুমারের কণ্ঠে যখন শোনা গেল :

মনে রেখো, দেবী আর গুরুদেব,
আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য, এ দাসের
তিনটি দেবতা।

তখন "সেই প্রথম দৃশ্যের করুণ কোমল অভিনয় থেকে শুরু করে তারপর রাজার ব্যবহারে, গুরুর ছলনায়, তাঁর সেই দ্বিধা-সন্দেহ সংশয়-অবিশ্বাস তার প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাধনার ভিত্তিমূলে যে প্রচণ্ড ভূকম্পন লাগিয়ে দিলে—দারুণ দ্বন্দ্বের চাপে, মর্মান্তিক বজ্রঝঙ্কার বিপুল সংঘাতে তার সেই তিনটি দেবতার প্রত্যেকটির অন্তরের বেদী হতে কেমন করে বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় লুটিয়ে গেল, তার আশৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার কেমন করে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে দুর্বল হয়ে তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহী করে তুললে—উন্মত্ত জয়সিংহ কেমন করে শেষে দেবীর পায়ে রাজরক্ত নিবেদন করে দিতে শ্রাবণের শেষরাত্রে আপনাকে আহুতি দিলে, নিপুণ রূপদক্ষ শিশিরকুমার সেই অভিশপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি পলে যা কিছু ব্যথা, যা কিছু আনন্দ—যেটুকু হাসি—যতখানি অশ্রু ছিল একেবারে উজাড় করে আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর এই জয়সিংহের ভূমিকায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় রঘুবীর আলমগীর প্রভৃতি তাঁর অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকার ন্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" অপর্ণার মর্মবেদনার ঢেউ এসে যখন জয়সিংহের চেতনায় আঘাত করল তখন তার কণ্ঠে-

তোমার হৃদয় ব্যথা আমার হৃদয়ে
এসে পেয়েছে চিরজীবন,

অথবা জয়সিংহ যখন বুঝল :

শুধু ধরা দাও তুমি মানবের মাঝে
মন্দিরের মাঝে নয়—

শিশিরকুমারের কণ্ঠে এই সংলাপ যাঁরা হৃদয়-মন দিয়ে শুনেছেন, তাঁরাই বুঝেছেন যে subtle ও dignified অভিনয় বস্তুটি কি।

নব-নাট্যমন্দিরেও তিনি রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নূতন নাটক—'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং মধুসূদনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেকের মতে 'যোগাযোগে'র মধুসূদন শিশির-প্রতিভার একটি অসার্থক সৃষ্টি। এই মঞ্চে 'রীতিমত নাটকে' প্রফেসর দিগম্বর শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত অভিনয়প্রতিভার আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী বলেন : "নাটকখানি দুর্বল, তাই প্রোফেসর দিগম্বরের ভূমিকাটি তিনি এমন প্রবলভাবে অভিনয় করতেন এবং তা তিনি করতেন নাটক থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়েই।"

তাঁর নটজীবনের শ্রীরঙ্গম-পর্যায়ে শিশিরকুমার অনেকগুলি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন এবং অনেক নূতন চরিত্রকে তিনি রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিণত প্রতিভার দান হিসাবে মনে রাখার মতন তিনটি চরিত্রই আমরা পাই, যথা—পরিচয়ে রায়বাহাদুর, মাইকেল মধুসূদনে মাইকেল আর তখ্‌ৎ-তাউসে জাহান্দর শা। যোগাযোগের মতন মাইকেল নাটকের বিন্যাসও ছিল শিথিল। পরিপোষক অভিনেতারা ছিলেন দুর্বল। তাঁর মাইকেল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন : "মাইকেলের ভূমিকায় দেখা দিয়ে শিশিরকুমার দর্শকের মনকে মুহূর্তমধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। চরিত্র অভিনয়ের এই অনুপম ক্ষমতার পরিচয় যৌবনে তিনি বার বার দিয়েছেন। ইদানিংকালে মনে হোত এই ক্ষমতা বুঝি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। মাইকেল অভিনয় করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিভা ক্ষয় পায় না, প্রকাশের অবসর পেলে আপন দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।" আর

শ্রীকুমারবাবুর অভিমত এই যে: "এ হেন দুর্জ্ঞেয় দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বকে শিশির আশ্চর্যরূপে পরিস্ফুট করিয়াছে।...মধুসূদনের অন্তর-সমুদ্রের একটা ঢেউ শিশিরের অভিনয়-ছন্দে ধরা পড়িয়া দর্শকের বিস্মিত-দৃষ্টির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" সত্যই বৃদ্ধ শিশিরকুমারের তারুণ্যদীপ্ত এই অভিনয় তাঁর প্রতিভার একটি অতুল কীর্তি। শিক্ষিত বাঙালি, মননশীল বাঙালি অভিনয়ের এমন বিপুল বৈভব এর আগে কোনোদিন লক্ষ্য করে নি। আবৃত্তির মধ্যে গূঢ় অর্থ এমন করে আর অনুভব করে নি। শিশিরকুমারের সৃষ্টির তালিকায় প্রথম পাঁচটির মধ্যে নিঃসন্দেহ 'মাইকেল' একটি।

'পরিচয়' নাটকে আমরা অভিনেতা ও প্রযোজক শিশিরকুমারের এক নূতন পরিচয় পেয়েছি। শিশিরমানসের পটভূমিকায় রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর রোমান্টিক; শেলী, কীটস, বায়রণ, ব্রাউনিং প্রভৃতি য়ুরোপের রোমান্টিক কবিরা তাঁর প্রিয় ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা শিশিরকুমারের অভিনয়ধারা যে মূলতঃ রোমান্টিক হবে, এ স্বাভাবিক। সেই ধারার প্রথম ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করি 'পরিচয়' নাটকে রায়বাহাদুরের ভূমিকায় তাঁর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—যাকে বলা যায় একেবারে আধুনিক (ইবসেন ও শ'য়ের আধুনিকতার অর্থে)—অভিনয়ে। এ শিশিরকুমার নূতন। জনা, আলমগীর, সীতা বা ষোড়শী, মাইকেলের শিশিরকুমারকে এখানে পাওয়া যাবে না। 'পরিচয়' বাংলা থিয়েটারে নবযুগের আর একটা বড় রকমের দিক্-পরিবর্তন বা turning point—কি অভিনয়ে, কি উপস্থাপনায়। 'পরিচয়' সামাজিক নাটক। শিশিরকুমার এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন: "সমাজের বিবেকবুদ্ধি, সামাজিক চিন্তার ধারা সমাজ-সমস্যার বিশ্লেষণ যে নায়কের প্রাণ (motive), তাকেই প্রকৃত সামাজিক নাটক বলা চলে। বর্তমান নায়কের সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে পরিস্ফুট। তাই নাটকখানি অপরিচিত লেখকের হলেও আমার রঙ্গমঞ্চে অনেকদিন ধরে অভিনয় করেছিলাম।"

শিশিরকুমার এই নাটকে উচ্চশিক্ষিত অথচ রক্ষণশীল রায়বাহাদুর

শশাঙ্ক চাটুজ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। "অবৈধ সন্তানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিচয় নাটকের মূল কাহিনী উপস্থাপিত। কিন্তু সেই সমস্যাকে ভাবালুতার বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাট্যকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিকে তাঁর সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এজন্যেই নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে,"—এই কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পরিচয় নাটকে শিশিরকুমার'—এই শীর্ষক প্রবন্ধে (বিচিত্রা, শিশির শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৬) তিনি এই নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হোল। রায়বাহাদুর অনন্তলাল এই নাটকের আর একটি চরিত্র। দিগিনবাবু লিখেছেন: "অপত্যস্নেহ ফল্গু-ধারার ন্যায় দুজনেরই অন্তরে প্রবাহিত। শশাঙ্ক চাটুজ্যে নিজের অবৈধ সন্তানকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত; অনন্তলাল অসবর্ণ বিবাহের দরুণ ছেলেকে স্বগৃহে স্থান দিতে অসম্মত। দ্বন্দ্ব দুজনের জীবনেই রয়েছে। তবে শশাঙ্ক চাটুজ্যে চাপা আর অনন্তলাল প্রায় মতিচ্ছন্ন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শিশিরকুমার ঢুকেই যখন বলতেন :......'চল হে রায়বাহাদুর আমার নতুন লেখাটা—শঙ্করভাষ্যের ওপর—তোমায় একটু শুনিয়ে দিই।'—তখন বাহ্যতঃ মনে হোত না তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে। কোমরটি ঈষৎ বাঁকিয়ে শুধু বার্ধক্যের ইঙ্গিতটুকু প্রকাশ করতেন; কিন্তু সহজ ঋজু ভঙ্গিতে বাক্যোচ্চারণের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পেতো। মনের গোপন-ভাবকে চাপা দিয়েও প্রারম্ভেই শিশিরকুমার শশাঙ্ক-চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটিকে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশের চেষ্টা করতেন। 'আমার নতুন লেখাটা' বলেই একটু থামতেন। তারপর 'শঙ্করভাষ্যের ওপর'—এই শব্দক'টির ওপর একটু জোর দিতেন।...অভিনয় চরিত্রানুগ করার জন্যই তিনি বিবেকের দংশনকে গোড়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মস্তরে রাখতেন।...শশাঙ্কের মনের দ্বন্দ্বটিকে (দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে) সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে, শিশিরকুমার স্ফুট থেকে স্ফুটতর করতেন। 'বড় গুরুতর প্রশ্ন করলে নীরোদ, বড় গুরুতর প্রশ্ন—' শশাঙ্ক চাটুজ্যের ক্লান্ত কণ্ঠ দিয়ে যখন এই ক'টি কথা উচ্চারিত হোত তখন তারই ভিতর দিয়ে উঁকি মারত যেন তাঁরই অতীত জীবন। অন্তরের অব্যক্ত

বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ। যাকে আমরা বলি আত্মার কান্না—সেই জিনিস শশাঙ্ক চাটুজ্যের ভূমিকাভিনয়ের ভেতর দিয়ে আশ্চর্যভাবে দেখিয়েছেন শিশিরকুমার।" উপলক্ষকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যে চলে যাওয়ার এরূপ ক্ষমতা সমসাময়িক কালে একমাত্র শিশিরকুমারেরই ছিল।

শিশিরকুমার তাঁর দর্শকদের কল্পনাকে কিভাবে উদ্দীপ্ত করতেন তার একটি চমৎকার নিদর্শন আছে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে। প্রতীকের ভেতর দিয়ে এবং মাত্র দুটি শব্দ—'শিকারী—শিকারী'—উচ্চারণের দ্বারা নাটকের ঘটনা পারম্পর্যকে তিনি এমনভাবে তুলে ধরতেন যে দর্শকগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন। "শশাঙ্ক-চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছত শেষ দৃশ্যে।...সংস্কারমুক্ত, লব্ধসত্য শশাঙ্কের ধীরস্থির মূর্তিটিকেই শিশিরকুমার এখানে রূপায়িত করতেন।" অভিব্যক্তিতে থাকত না কোনো আতিশয্য, বচনে থাকত না মেলোড্রামাটিক ভাব। "শিশিরকুমার যে কতবড় সংযমী অভিনেতা ছিলেন, তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন মিলত 'পরিচয়' নাটকের শেষ দৃশ্যে।" অথচ এই নাটকে তাঁর মঞ্চাবস্থান খুব অল্প সময় নিতো। এই নাটক কিন্তু দীর্ঘকাল চলেনি, বা আশানুযায়ী পয়সাও দেয় নি। এই প্রসঙ্গেই শিশিরকুমার বলতেন: "শ্রীরঙ্গমের 'পরিচয়' আর শেক্সপিয়ারের 'কিং লিয়ার' উভয়েরই সমান বরাত দেখছি। Shakespeare's greatest work, the best of his plays, *King Lear* is the least popular." তবু বলবো, শিশিরকুমার বাংলা থিয়েটারে যথার্থ আধুনিকতার উদ্বোধন করে গিয়েছেন এই নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনায়।

এমনি অতীতজীবনের উদ্ঘাটনকে উপজীব্য করে তিনি '*প্রশ্ন*' নাটকখানি মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু যে boldness 'পরিচয়' নাটকে ছিল, 'প্রশ্নে' তার অভাব হওয়ার জন্য নীতীনের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করেও শিশিরকুমার এই নাটকখানিকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন নি। শশাঙ্কের মতন নীতীনের ভূমিকাভিনয়ও নাটকীয়ত্ব বর্জিত। শিশিরকুমার তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে বহু চরিত্রকে মঞ্চে রূপায়িত করেছেন; পুরাতনকে নূতনরূপে উপস্থাপিত করেছেন, নূতনকে করেছেন অর্থপূর্ণ। তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটি

চরিত্রেই আছে তাঁর প্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। অভিনয় কেমন করে সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয় সে দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি একমাত্র নাট্যাচার্যের মধ্যেই। তাঁর প্রতিভার সীমানা স্পর্শ করা অন্যের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। অভিনয়ের রাজ্যে শিশিরকুমার একেশ্বর সূর্য, ভাবের ভুবনে রবীন্দ্রনাথ যেমন একচ্ছত্র সম্রাট।

॥ ১৫ ॥ গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার ॥

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে আছেন গিরিশচন্দ্র, অন্য প্রান্তে শিশিরকুমার, এর মাঝখানে অন্য কোনো অভিনেতা নেই। আমি চিরকাল এই অভিমত পোষণ করে এসেছি, এবং আজো তা করি। গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার দুজনই স্বাভাবিক অভিনয়প্রতিভা নিয়ে বাংলা থিয়েটারের দুই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নাট্যশালার উন্নতিবিধানে দুজনেরই বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দুজনেই দীর্ঘকাল ধরে বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে নট ও নাট্যাচার্যরূপে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একজন ছিলেন সাধারণ নাট্যশালার অর্থাৎ কমার্শিয়াল থিয়েটারের অন্যতম এবং প্রধানতম নির্মাতা এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চের ওপর ছিল তাঁরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য আর অন্য-জন ছিলেন বাংলা থিয়েটারের নবযুগ প্রবর্ত্তক এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বাংলা থিয়েটারের ওপর তাঁরো ছিল ঐরকম একচ্ছত্র আধিপত্য। 'সীতা'র উদ্বোধন থেকে শ্রীরঙ্গমের শেষ অভিনয়ের তারিখ ধরলে বত্রিশ বছর হয়; কিন্তু নাট্যমন্দির ও নব নাট্যমন্দিরের মধ্যবর্তী সময় এবং নব নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গমের মধ্যবর্তী সময়—প্রায় ছয়-সাত বছর শিশিরকুমার নিজস্ব মঞ্চের বাইরে ছিলেন। দুজনেই ছিলেন creative genius এবং সেই হিসাবেই আমি বলতে চাই যে বাংলা থিয়েটারের এক প্রান্তে গিরিশচন্দ্র, অন্য প্রান্তে শিশিরকুমার। দুজনেরই ছিল বহুমুখী প্রতিভা আর ছিল পাণ্ডিত্য। Theatre scholarship বলতে যা বোঝায় তা উভয়ের মধ্যেই প্রচুর-পরিমাণে বিদ্যমান, হয়ত শিশিরকুমারের মধ্যে বেশি—এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এঁদের দুজনকে আমরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলতে পারি। বিদ্বজ্জনের সমাদর দুজনেই লাভ করেছিলেন অকুণ্ঠভাবে এবং অপর্যাপ্তভাবে—সে সৌভাগ্য বাংলা দেশের আর কোনো নটই দাবী করতে পারেন না। দুজনেরই ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড আর ছিল রঙ্গমঞ্চ-প্রীতি। অভিনয় ছিল তাঁদের জীবনের ধর্ম এবং সেই ধর্মাচরণে দুজনেরই নিষ্ঠা সমতুল্য।

গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক। নাট্যকার হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, মানবচরিত্রাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত। তিনি রামনারায়ণ, বা মধুসূদন, বা দীনবন্ধু-প্রবর্তিত প্রথাগুলি গ্রহণ না করে নূতন আদর্শ, নূতন প্রথায়, নূতন ভাষায় নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটক বাংলা ভাষায় অপূর্ব, বাংলা সাহিত্যে নূতন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের আগাগোড়া বলতে গেলে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। গিরিশ-প্রতিভার ইহাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কমবেশি তাঁর আশীখানা নাটকের মধ্যে প্রায় আট শত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক, কতকগুলি ঐতিহাসিক, কতকগুলি সামাজিক আর কতকগুলি সমাজ আদর্শ থেকে গৃহীত। সব ক্ষেত্রেই তিনি একটু অসাধারণ নিজস্বতা ঢেলে দিয়ে সেই সব অসংখ্য দেব ও মানব চরিত্র বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করেছেন। পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, উপাখ্যান থেকে এবং সমাজ থেকে তিনি বহুতর চিত্র গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর সেই নিজস্ব ভাবের ছাপ দিয়ে সেগুলোকে কেমন একটা নূতন অবয়বে, নূতন হাবভাববিশিষ্ট করে উপস্থিত করেছেন যে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দিব্য-দৃষ্টির প্রভাব, তাঁর মৌলিকতা ও মহাপ্রাণতার উজ্জ্বল আভাস সেগুলিতে স্পষ্ট পরিস্ফুট। অথচ প্রত্যেকটি নূতন, প্রত্যেকটি খাঁটি, প্রত্যেকটিই পৃথক। এ শক্তি নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। নাট্যসাহিত্যে গিরিশপ্রতিভার নূতন দান গৈরিশি ছন্দ যা তিনি প্রধানতঃ পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে ব্যবহার করতেন। এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে তিনি বাংলা নাটককে অনেকখানি গতিশীল করে তুলেছিলেন। সামাজিক নাটকের সংলাপ রচনায় তিনি মাইকেল ও দীনবন্ধুকে অতিক্রম করেছেন। গিরিশ-প্রতিভা বহুমুখী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও স্বামী বিবেকানন্দ তাই গিরিশ-চন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার অনুরাগী ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন-চন্দ্র পালের মত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার প্রশংসা শতমুখে করেছেন। শিশিরকুমারও করতেন। (পরিশিষ্টে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। নাটক রচনায় যেমন, গীত রচনায়ও তেমনি

তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। গীতি-কবিতায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁর গান বাংলায় অমর হয়ে থাকবে, কারণ তা খাঁটি বাঙালির গান। ললিত-পদচ্ছন্দে সুরানুসারী ভাববিকাশে গিরিশচন্দ্রের অনেক গান বাংলা ভাষায় অতুল সম্পদ হয়ে রয়েছে। সহজ ভাষায়, শোনা কথায় গভীর তত্ত্বপূর্ণ গান তিনি যেমন রচনা করেছেন, ইংরেজিনবীশ কোনো কবিই তেমন পারেন নি। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে reactionary মনে করা ভুল ; থিয়েটার চালাবার জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন এবং যুগের প্রয়োজনকে তিনি মঞ্চে তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সাফল্যও লাভ করেছিলেন অসাধারণ। গিরিশচন্দ্র নিজে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েই তাঁর নটজীবন শেষ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যেমন, রঙ্গমঞ্চে তেমনি গিরিশচন্দ্রই ছিলেন এর চালক ও পালক। তাঁর প্রতিভার ঐতিহ্যে পরিস্ফুট সেই রঙ্গালয়কেই শিশিরকুমার আরো একটি নূতন তুঙ্গশীর্ষে স্থাপন করে গিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের অসুবিধা ছিল বহু, প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি মধ্যবিত্ত অর্ধশিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি সাহিত্যিক। অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় সংস্পর্শে না এসেই তিনি নাটক রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর সম্বল ছিল ভারতীয় পুরাণ, যাত্রা-ওয়ালাদের খানকয়েক তৃতীয় শ্রেণীর নাটক ; দীনবন্ধু, মাইকেল ও অখ্যাত-নামা কয়েকজনের বাংলা নাট্যরচনা এবং শেকস্‌পিয়ারের গ্রন্থাবলী। সুযোগ অল্প ছিল বলেই তিনি বেশি অধ্যয়নের অবকাশ পান নি ; অর্থের অতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল বলেই সুরুচির চরম প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। যেটুকু তিনি করেছেন আর্থিক লাভ-ক্ষতির দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করেই তাঁকে করতে হয়েছে। দর্শকবৃন্দের তুষ্টিসাধনকে শাসনে রেখে প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে হয়েছিল বলে আজকাল গিরিশচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর back-dated নাট্যকার বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে তিনি তাই আমল পান না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা এত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে তাঁর পূর্ববর্তী আর কোন্ সাহিত্যিক রচনা করেছেন? কলিকাতার

সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষায় গিরিশচন্দ্রের কী অসাধারণ অধিকার ছিল তার পরিচয় আছে তাঁর 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটক দুখানিতে। ভাব প্রকাশে কোথাও কোথাও তিনি নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ স্থলে যার মুখে যে ভাষাভঙ্গি বা কথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাই তিনি বলিয়েছেন। তাই সত্তর বছরের পুরানো হলেও 'প্রফুল্ল' বা 'হারানিধি' প্রভৃতি নাটকগুলোর সংলাপের ভাষা কিছুমাত্র বদল না করে আজো—এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—অভিনয় করা চলে। গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যেখানে যে ভাষা যেমনভাবে প্রযোজ্য, সেখানে তিনি সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তিনি শেক্স্‌পিয়ারের অনুবর্তী। রোমিও পদ্যে কথা বলেছেন, ফলষ্টাফ গদ্যে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে একই দৃশ্যে বিদূষক গদ্যে ও জনা পদ্যে কথা বলেন। শেকস্‌পিয়ারের ন্যায় mood dialogue রচনায় গিরিশচন্দ্রও দক্ষ ছিলেন। আবার উপন্যাস নাটকান্তরিত নাটকের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শেক্স্‌পিয়ারের পরিচয় সাধন তাঁর আর একটি আশ্চর্য কীর্তি। তাঁর ম্যাক্‌বেথ নাটকের অনুবাদ অদ্বিতীয়। অনুবাদে মূলের সুরটি চমৎকার বজায় আছে। অন্তরের গভীর অনুভূতি ভিন্ন এমন সার্থক অনুবাদ সম্ভব হয় না। গিরিশপ্রতিভার অভিব্যক্তি কোনো একখানা নাটকে ঘনীভূত হয় নি—তা তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রকে বলা হয় ভিক্টোরিয়ান যুগের নাট্যকার। কিন্তু জীবনের উত্থান-পতনের যে কাহিনী তাঁর নাটকে আছে তা অপ্রচুর নয়, অস্ফুটও নয়, কিন্তু রোমান্টিক কবির স্বপ্ন জড়ানো বলে তাতে ভবিষ্যৎহীন বর্তমান প্রকাশের অহমিকা নেই। গিরিশচন্দ্র মনে করতেন তীক্ষ্ণ রসবোধের এবং উচ্চতম কল্পনার জারকরসে যে পরিদৃষ্টমান বাস্তব সত্য কবির সত্য হয়ে রূপান্তরিত হোল, তাই-ই সাহিত্য পদবাচ্য হবার যোগ্য। এইজন্য গিরিশচন্দ্রের রচনায় বারবার শেক্‌স্‌পিয়ারের দেখা পাওয়া যায়। যে সহস্র-মুখী জীবন তিনি তাঁর সাত শতাধিক চরিত্রে পরিস্ফুট করেছেন, তাদের মধ্যে নাটকীয় উৎকর্ষগত কোন ফাঁকি বোধহয় নেই। গিরিশচন্দ্রের নাটক

মতবাদ প্রচারদোষে দুষ্ট, এমন অভিযোগ অনেকে করে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন্ বড় লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁর বেশির ভাগ রচনায় তাঁর বিশিষ্ট মতবাদ দেখতে না পাওয়া যায়? দর্শকদের বিকৃত বা স্থূল রুচির জন্য যদিও কোথাও কোথাও তাঁর রচনা-শৈথিল্য দেখা গিয়েছে, তবু মানবজীবনের এত অধিক দিক গিরিশচন্দ্র ব্যবহার করেছেন যা দেখলে তাঁর জ্ঞান ও ধারণার প্রসার সম্বন্ধে অবাক হতে হয়। সমসাময়িক বাংলার নাট্যকারদের সঙ্গে গিরিশ-প্রতিভার পার্থক্য এইখানেই। সর্বরসের সার্থক চিত্রণে গিরিশচন্দ্রের নাটক যথার্থ ই সর্বযুগের সকল রসিক পাঠকের কাছে মূল্যবান।

গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে এত কথা বললাম শুধু এই কারণে যে রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার তাঁর নাটকের খুব বড়ো মূল্য দিতেন। তা যদি না দিতেন তা'হলে এই বিংশ শতাব্দীতে তিনি মঞ্চে গিরিশ-নাটককে উপস্থাপিত করতেন না। এমন কি, জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন: "জাতীয় নাট্যশালার মঞ্চে লোক দেখবে বিগত দিনের ভাল ভাল নাটক।" এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর একটি উক্তি স্মরণীয়। তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে গিরিশ-পার্কের নামকরণে যখন বাধা উপস্থিত হয় (অবশ্য মেয়র হিসাবে তিনি সেই বাধা অগ্রাহ্য করেছিলেন), তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "গিরিশবাবুকে বাঙালি চেনে নি, এখনো চিনবার বিলম্ব আছে। মৃত্যুর একশো বছর পরে ইংলণ্ডে যেমন শেক্স্‌পিয়ারের আদর হয়েছিল, তেমনি একদিন আসবে, যেদিন এ-দেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনবে, তাঁকে আদর করবে, তাঁর গুণকীর্তনে গর্ব অনুভব করে ধন্য হবে। গিরিশচন্দ্রের নাটক যাচাই করবার জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হবে না। পশ্চিম থেকে বিদেশীয় শিক্ষার্থী এসে নতজানু হয়ে শিখে যাবে গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য।" গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল; তাঁর 'নল-দময়ন্তী' ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল; তাঁর 'বিল্বমঙ্গল'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বসু; ভগিনী নিবেদিতা এই অনুবাদ সংশোধন করে দিয়েছিলেন; 'বিষাদ' ও

'দুখিয়া' হিন্দীতে অনূদিত হয়ে একদা এলাহাবাদে অভিনীত হয়েছিল; হিন্দী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ লেখক 'শঙ্করাচার্য' নাটকখানির হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন; 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকখানিও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয় আর আচার্য হরিনাথ দে 'প্রফুল্ল' নাটক ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদ অসমাপ্ত। সরকারী সঙ্গীত-নাটক-আকাদমির গিরিশ-সাহিত্য প্রচারে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের স্রষ্টা ও পালক। তাঁর অভিনয়প্রতিভার আলোচনা এখানে করব না। এ-কলায় তিনি দেবদত্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয় নাট্যকলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি কারো কাছে পাঠ গ্রহণ করেন নি। তাই না তাঁর মৃত্যুতে অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন:

গুরুর অভাবে কে সে নটগুরু আপনি হইলা সিদ্ধ;
'নিমচাঁদ'বেশে প্রথমাভিনয়ে করিলা বঙ্গ মুগ্ধ।

শিশিরকুমারেরও তেমনি কোনো গুরু ছিল না; তিনিও স্বয়ংসিদ্ধ অভিনেতা এবং গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তিনিও নাট্যকলাবিদ্যায় দেবদত্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাই বলি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে গিরিশচন্দ্র অন্য প্রান্তে শিশিরকুমার। নাটক নির্বাচনে, রঙ্গালয় পরিচালনায়, নট-নটীদের শিক্ষাদানে, গিরিশ-প্রতিভা বাংলা থিয়েটারকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে গিয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই দুই যুগ ধরে তিনি এর কর্ণধার হয়েছিলেন। থিয়েটারের উন্নতির জন্য তাঁর স্বার্থত্যাগও ছিল অতুলনীয়। শিশিরকুমারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এইখানে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। "রঙ্গমঞ্চ ভালবাসি" —এমন কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে, দরদের সাঙ্গ গিরিশচন্দ্রের পর একমাত্র শিশিরকুমারই বলতে পেরেছিলেন। অভিনয়কলা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে তাঁর একটি রচনায়। সেটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হোল।

এইবার শিশিরকুমারের কথা। এ আলোচনা তুলনামূলক নয়, দুটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার মধ্যে সে অবকাশই বা কোথায়? গিরিশযুগের

থিয়েটারে যে জিনিসটা ছিল না, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার নিয়ে এলেন সেই বহু প্রত্যাশিত জিনিস—প্রয়োগকৌশল, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় art of production বা presentation ; সেদিন এরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতির পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বহু পূর্বেই তাঁদের পারিবারিক মঞ্চে এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও একাধারে নট, নাট্যকার এবং নাট্যশিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনানৈপুণ্য সম্বন্ধে অনেক সময়ে শিশিরকুমারের কাছে অনেক কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল। বলতেন: "পৃথিবীতে নাটক রচনা করেছেন অনেকেই, কিন্তু মঞ্চে সেই নাটক প্রযোজনা করবার ক্ষমতা খুব বেশি নাট্যকারের মধ্যে আমরা পাই না। আমাদের দেশে নিজের নাটকের প্রযোজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রডিউসার ছিলেন। তিনি তাঁর নাটক ও অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি নি। নাট্যশিক্ষক হিসেবেও তাঁর জুড়ি দেখি না। অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে তৈরি করতে তিনি দিনের পর দিন পরিশ্রম করতেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কোনদিন পেশাদারী অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে ঐ কাজে নামেন নি। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় তিনি একা শেখাতে পারতেন।" শিশিরকুমারের নট-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ, এ অনুমান অসঙ্গত নাও হোতে পারে। পেশাদার মঞ্চে তাঁকে পাবার জন্য তাঁর একটা বড় রকমের আকাঙ্ক্ষাও ছিল। পরিশিষ্টে শিশিরকুমারের 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শিশিরকুমার যেমন নূতন অভিনয়রীতির স্রষ্টা, তেমনি প্রয়োগরীতিরও প্রবর্তক তিনি। শ্রীরঙ্গমে তাঁকে একদিন বলেছিলাম তাঁর নটজীবনের রেমিনিসেন্স লেখবার জন্য। রাজী হন নি। বলতেন, কী দরকার? তখন আর্ভিং-এর স্মৃতিকথা বইখানা একদিন তাঁকে দিয়ে বলেছিলাম, একটা কিছু থাকা চাই তো। তার উত্তরে বলেছিলেন, "কেন, my school of acting will remain." আলোচনা আর বেশি অগ্রসর হয় নি। আজ বুঝছি যে, নটের সত্যকার জীবনস্মৃতি এ ছাড়া আর কিছুই হোতে পারে

না। গিরিশচন্দ্রের মতন, শিশিরকুমারেরও একটা আদর্শ ছিল এবং আদর্শনিষ্ঠাও ছিল এবং তার জন্য পৃথিবীর সকল আদর্শবাদীদের অদৃষ্টে যা ঘটে থাকে, তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছিল অনেক। রঙ্গমঞ্চে নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে আবির্ভূত হলেন শিশিরকুমার। গিরিশচন্দ্র সাধারণ বাঙালি দর্শকদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের প্রতি যে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, শিশিরকুমার তাকে শতগুণে বর্ধিত করে তুলেছিলেন—শিক্ষিতজনের মধ্যে তিনি এনে দিয়েছিলেন থিয়েটারের প্রতি একটা genuine feeling, প্রকৃত আকর্ষণ, ভালবাসা। রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি যে নূতন যুগের সৃষ্টি করলেন, তার স্বরূপটা অনেকের কাছেই খুব পরিষ্কার নয়।

শিশিরকুমার যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর সম্মুখে প্রধান অসুবিধা ছিল পাঁচটি, যথা—(১) শিক্ষিত যুবক ও অভিনেতার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার সাহসের বিরলতা; (২) দর্শকবৃন্দের মধ্যে রুচি, শিক্ষা, ভদ্রতা ও নিয়মানুগত্যের অভাব; (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থিয়েটার বিরাগ; (৪) নীতিবাদীদের থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চন করা এবং (৫) থিয়েটারের প্রায় সব ধরণ-ধারণের মধ্যেই একটা গ্রাম্যতাদোষ, সৌকুমার্যের অভাব ও সারারাত্রিব্যাপী নিছক পেশাদারী অভিনয়। মঞ্চের মাধ্যমে তিনি যুগপৎ নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষসাধন এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন করতে চেয়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চকে সামাজিক পাতিত্য থেকে রক্ষা করা ছিল শিশিরকুমারের প্রথম কাজ। শিশিরকুমারের সমসাময়িককাল পর্যন্ত বাংলা ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কিংবা অভিনয় কার্যে যাঁরা নিযুক্ত থকতেন, নানা কারণেই তাঁরা যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। এর বড়ো দৃষ্টান্ত স্বয়ং নটগুরু গিরিশচন্দ্র। রঙ্গালয়ের স্রষ্টাকে 'নোটো গিরিশ' বলে উপহাস পর্যন্ত করা হোত। তাই তো তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন:

সবে কয় অভিনয় নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন।

এই নিন্দা সামাজিক অমর্যাদার রূপ ধারণ করেছিল সেদিন। অপরেশচন্দ্র

একবার মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত গিরিশচন্দ্রের চতুর্দশ বার্ষিকী স্মৃতি-সভায় (১৩৩২, ২৫শে মাঘ) বড় দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন: "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহাকে একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। তাঁহার জীবিতকালে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে গিরিশচন্দ্র একখানা ছেঁড়া কুশাসনও পান নাই।" দেশের শিক্ষিত সমাজ —বিশেষ করে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ রঙ্গমঞ্চের প্রতি সেদিন তেমন আকর্ষণ বোধ করত না। A nation is known by its stage—এই বোধই তাদের মধ্যে তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি জাগে নি। মননশীল সমাজের কাছে মঞ্চের কোনো আবেদন ছিল বলে মনে হয় না। গিরিশ-পরবর্তী যুগে থিয়েটারের অবনতির এইটাই ছিল একটা বড়ো হেতু।

তারপর এলেন শিশিরকুমার। বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে এবং একটি সম্ভ্রান্ত জীবিকা পরিত্যাগ করে তিনি যোগদান করলেন পেশাদারী মঞ্চে। আজ যে বাংলা থিয়েটার সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে, তার মূলে আছে শিশিরকুমারের এই দুঃসাহস। তাঁকে দিনের পর দিন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীগোষ্ঠীর জন্ম বর্তমান মর্যাদা আদায় করতে হয়েছে। এ কাজ একদিনে সম্ভব হয় নি। শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও যে মঞ্চকে জীবিকার ক্ষেত্র করতে পারে, তা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। অথচ তাঁরই নট-জীবনের প্রথম যুগে আমরা তাঁকে সামাজিক মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছি —মনে করেছি তিনি ব্রাত্য। কিন্তু তাঁর ছিল সকল বাধাবিঘ্নজয়ী প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব; তারই বলে তিনি লাভ করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠা। সমাজের অবজ্ঞা তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। শিশিরকুমারকেই কতবার বলতে শুনেছি, "কলকাতার খবরের কাগজগুলো প্রথম দু'বছর আমার বিষয়ে একটি লাইনও লেখে নি।" কিন্তু তার জন্য তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না, স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি তিনি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, শিক্ষিত বাঙালির মনীষাকে রঙ্গমঞ্চের দিকে আকর্ষণ করেছেন, তাকে শেষ পর্যন্ত জাতে তুলেছেন। এই-ই তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এবং এরই মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম অভিনয়শিল্পে নিয়ে এলেন রুচি, শিক্ষা, সৌষ্ঠব জ্ঞান, সৌকুমার্য, ভদ্রতা, সৌজন্য এবং সুদর্শন নট-নটী। এমন কি যেখানে আগে রঙ্গমঞ্চের বিলাতি ধরণের নাম ছিল, সেইখানে তিনি খাঁটি বাংলা নাম আমদানী করলেন। "The advent of Sisirkumar on the Indian stage is something like illumination"—বলেছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যই, শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই "পট, নট, মঞ্চ, আলোকশিল্প এবং অভিনয়কৌশলের নবরূপায়ণের সামগ্রিক সুসম্বদ্ধতায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ যেন পুনঃ প্রসূত হোল।" আগেই বলেছি, বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রায় এক অন্ধকার যুগে এই সুশিক্ষিত সাহিত্যরসিক এবং প্রতিভাবান নটের আবির্ভাব। এর পেছনে ছিল ইতিহাসের সক্রিয় বিধান। শিশির-প্রতিভার মূল্য নিরূপণে এই কথাটি বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

শিশিরকুমারকে আমরা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের যুগপ্রবর্ত্তক বলি। তাঁর নট-জীবনের শ্রীরঙ্গম পর্যায়ে আমি একবার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখি; সেই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নবযুগপ্রবর্তক শিশিরকুমার।' যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সম্পর্কে ঐ বিশেষণটি ঠিক ঐভাবে তার পূর্বে আর কেউ ব্যবহার করে নি। সেদিন সকালে কাগজখানা হাতে করে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমেই সনৎদাকে (সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়) দেখালাম। তিনি সেটা হাতে করে নিয়ে গেলেন ভেতরে শিশিরকুমারকে দেখাবার জন্য। আমিও চলেছি সঙ্গে সঙ্গে।—"এই ত্যাখো শিশির, আনন্দবাজারে তোমার সম্বন্ধে মণি কি লিখেছে", বললেন সনৎদা।—"কি লিখেছে"?—"লিখেছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নবযুগপ্রবর্তক"।—"Do you deny me this privilege, Sanat"? বললেন শিশিরকুমার; তারপর তিনি কাগজখানা নিয়ে লেখাটা পড়লেন। সবটা পড়ে আমাকে বললেন, "Yes, you have caught the right thing।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "একবার আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকারকে আনতে পার? মাখন সেনের আমলে ঐ কাগজ তো সর্বদা আমার বিরুদ্ধে ছিল। এখন বুঝছি কাগজের co-operation দরকার, আগে গ্রাহ্য করতাম না। জানো, কাপ্তেন নরেন দত্তকে একবার কি বলেছিলাম? তিনি তখন 'Liberty' কাগজ-

চালাচ্ছেন। আমি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি, পয়সাকড়ির তখন খুব টানাটানি। বিজ্ঞাপনটা তিনি refuse করলেন, টাকা না দিলে ছাপবেন না, বললেন। আমার লোক ফিরে এসে এই কথা আমাকে যখন জানাল, তখন টেলিফোনে তাঁকে বলেছিলাম, "Look here Captain Dutt, yours is a venture, it may not last, but mine is an institution, it will last as long as I live."

যাক্ সে প্রসঙ্গ। আমি যা লিখেছিলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই : বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান শুধু নূতন অভিনয়রীতি নয়, তাঁর প্রকৃত দান হোল সুষ্ঠু প্রয়োগরীতি এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা মঞ্চে যে যুগান্তর এনে দিয়েছে, যে অসাধ্যসাধন করেছে, বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। গিরিশযুগে বা তারপরেও আমাদের দেশে মঞ্চে producer-এর প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য সম্পর্কে দর্শকদের কোনো ধারণাই ছিল না; মালিকদের তো নয়ই। গিরিশচন্দ্র বড়ো অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রডিউসার ছিলেন না। অবশ্য ইংলণ্ডের থিয়েটারেও প্রয়োগশিল্পটি উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের আগে দেখা দেয় নি। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ধারা যাঁরা গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে অভিনয়ে presentation বা প্রয়োগশিল্পের গুরুত্ব কত বেশি। নাট্যকলাকারুতে প্রয়োগশিল্পীর স্থান যে কত উঁচুতে, এ ধারণা বিশ শতকের দর্শকের মনে সুস্পষ্ট। গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক ছিলেন, রেণহার্ট বা স্ট্যানিশ্লাভিস্কি-প্রমুখ প্রয়োগাচার্যদের তুল্য কল্পনা তাঁর ছিল না। সে কল্পনা ছিল শিশিরকুমারের। অভিনয়শিল্প আর প্রয়োগশিল্প—এ দুটো সত্যই পৃথক আর্ট; আবার এই দুইয়ের সম্মিলিত ফলেই মঞ্চের আবেদন দর্শকচিত্তে সমগ্র রূপ এবং রস নিয়ে ফুটে ওঠে।

যে কোনো নাট্যপ্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দরকারি ব্যক্তি প্রযোজক বা প্রডিউসার। সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে তাঁকে। যন্ত্র-সঙ্গীতের রস উপভোগ থেকে আরম্ভ করে নাচের সূক্ষ্ম গতির ইঙ্গিতও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবে না। এখনকার নাটকের অভিনয়ের বিচার প্রযোজকের কলানৈপুণ্যের ওপর

নির্ভর করে বেশি। মহলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই প্রযোজকের কাজ শুরু হয়ে যায়। তাঁর কাজ হচ্ছে এমন সহজ উপায়ে নাটকটিকে দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে করে নাটকের আবেদনকে কোনো দর্শকই অগ্রাহ্য করবার সাহস না পায়। নাট্যকারের স্বপ্নকে বাস্তবের সাজ পরিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। সব ক্ষেত্রেই যে প্রযোজককে নাটকের জন্য বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে তার কোনো মানে নেই। নাট্যকার যদি পাকা হন তা'হলে প্রযোজকের কাজের ভার কমে যায় বহুল পরিমাণে। কারণ নাটকের মধ্যেই প্রযোজকের সমস্যার সমাধান থাকে। তবে নাট্যকার যদি কাঁচা হন তা'হলে প্রযোজককে বেশ রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়। প্রথমেই নাটকখানি বার তিন-চার আগাগোড়া পড়ে ফেলতে হবে। এটা প্রযোজককে ভুললে চলবেনা যে, যে কোনো আর্টের তুলনায় বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন বিভিন্ন লোককে থিয়েটারি আর্ট বুঝিয়ে দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। এই বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মনে স্বাভাবিক ভাবে কি রকমে আঘাত করে সফলকাম হওয়া যায় তা প্রযোজকের জানা উচিত। ধীর মস্তিষ্কে সকল জিনিস ভালভাবে বুঝে তাঁকে কাজে অগ্রসর হতে হবে। অসম্পূর্ণ মালমসলা থেকেই তাঁকে সম্পূর্ণতার সীমানায় পৌছবার চেষ্টা করতে হবে। নাট্যকারের ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁকে তাঁর নিজের ধারণাগুলো শিল্পীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্রের মতই অনেক সময় অচল—তাদেরকে সুরে বেঁধে নিতে হবে। নট-নটীদের ঠিকমতো চালনা করলেই প্রযোজকের কাজের বা দায়িত্বের শেষ হয় না। দৃশ্যপট, আলো, সাজ পোষাক, বাদ্য-সঙ্গীত—যে কোনোটির ভেতর দিয়ে যদি দর্শকদের চিত্ত কিঞ্চিৎমাত্র দোলানো যায়, তাদের মনে একটু আঁচড় কাটতে পারা যায়, তার দিকে প্রযোজকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা উচিত। তাঁর নৈপুণ্য যাতে অতি সরল দর্শকও বুঝতে পারে, এইরকমভাবেই তাঁকে কাজ করতে হবে। অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী ভিন্ন প্রযোজক হওয়া যায় না। এ যুগে শিশিরকুমার ছিলেন এমনি দুর্লভ শক্তির অধিকারী একজন প্রডিউসর।

গর্ডন ক্রেগ বলেছেন—নাটক, অভিনয়, দৃশ্যপট বা নাচগান, এর কোনোটাকেই থিয়েটারের আর্ট বলা চলে না। "It consists of all

the elements of which these things are composed." কথাই হচ্ছে নাটকের দেহ, কাহিনী অভিনয়ের মূলশক্তি ; দৃশ্যপট নিজেকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে পারে শুধুমাত্র রেখা ও বর্ণসমষ্টির মধ্যে দিয়েই, দৃশ্যই নৃত্যের প্রাণ। এখানে কোনোটাই অপর কোনোটার চেয়ে বেশি দরকারি নয়। বিভিন্ন element বা মূল পদার্থগুলির প্রকৃত মিলন ঘটাতে পারলেই উঁচুদরের আর্ট সৃষ্টি করতে পারা যায়। মঞ্চের বহিরঙ্গের সুব্যবস্থা করার পর প্রযোজককে নাটকের দিকে মন দিতে হবে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের প্রতিটি গতি প্রতিটি বিশিষ্ট কথার উপর ঝোঁক, বিরাম, লয়ের মাত্রা ইত্যাদির সম্পূর্ণ মহলা দেবার পূর্বে তাঁকে সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিষয় ঠিক করে রাখতে হবে ; কি ধরণের নট-নটী দরকার, অভিনয়-ধারা কি পদ্ধতিতে শুরু হবে ইত্যাদি। তবে এই বিষয়ে যদি নাট্যকারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা যায় তবে অনেক সুবিধা। নাটকটির প্রতি লাইন ভাল করে পড়বার আগে যদি নাট্যকারের সঙ্গে বইটির সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা করা যায় তা'হলে আরো ভাল হয়। এজন্য প্রথম কয়েকটি মহলায় নাট্যকারের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। মহলার পূর্বে প্রযোজক যা ঠিক করেন, মহলার সময়ে তার অনেক কিছুই বদলান হবে না—এমন কোনো কথা নেই। প্রযোজকের কল্পনার শেষ তুলির টান চলে মহলার সমাপ্তির সঙ্গে। ভূমিকা নির্বাচন আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ। মোট কথা, কলাশিল্পের প্রতি নিখুঁত ও নিরলস দৃষ্টি ভিন্ন প্রযোজকের পক্ষে সাফল্য অর্জন অসম্ভব। শিশিরকুমার ঠিক এমনি ধরণের একজন প্রযোজক ছিলেন। নাটকের সাজসজ্জা, রূপ ও রঙের দিক থেকেও যে অনেক কিছু ভাববার আছে, তা তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য থেকে বোঝা যেত। নাট্যমন্দিরের নাটকে সাজসজ্জার আড়ম্বর বা চাকচিক্য অবান্তর বলে মনে হোত। গীতিকাব্যের মতো একটি সৌন্দর্যের আনন্দকে অনুভব করানই ছিল প্রয়োগশিল্পী শিশির-কুমারের লক্ষ্য। তাঁর প্রযোজিত নাটকে তাই রূপ ও রঙের কোনো আড়ম্বরের চেষ্টা থাকত না, থাকত না তাতে চোখ ঝলসানোর প্রচেষ্টা—সব মিলিয়ে দর্শক যা অনুভব করতো তা হোল নানা রঙের বিন্যাসে স্নিগ্ধ শান্তি, সুন্দর তৃপ্তি। রঙ্গমঞ্চের প্রগতির পথে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে শিশির-

কুমার অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন এবং নাট্যমন্দিরের যুগে নূতন-পুরাতন বহু নাটকের প্রয়োজনায় তিনি এর অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরঙ্গমের যুগে শিশিরকুমারের এই সৌন্দর্যবোধ কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল মনে হোত।

নাট্যমন্দির মঞ্চে শিশিরকুমার যখন 'তপতী' মঞ্চস্থ করেন, তখন শুনেছি, মঞ্চসজ্জা নিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছিল। 'তপতী' নাটকের ভূমিকা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেই আলোচনার সারমর্ম এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। নাট্যমঞ্চের আয়োজনের দিকে আজকাল খুব বেশি মন দেওয়া হয় এবং এর ফলে আমরা প্রকৃত জিনিস থেকে কতদূর সরে যাচ্ছি, সেটা আজ বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। বর্তমানে যাঁরা মঞ্চব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁদের অবগতির জন্য রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখানে তুলে দিলাম। তুলে দিলাম এই কারণে যে তিনি একাধারে ছিলেন নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজক। কবি লিখেছেন: "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলে-মানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে'ই পর্যাপ্ত। আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্য-কাব্য দর্শকের কল্পনার ওপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত। অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্রিকযুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশ চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।" বর্তমানে পটের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এসে মিলেছে যান্ত্রিক প্রাধান্য। শিশিরকুমার তাই শেষজীবনে আসরাভিনয়ের revival-এর কথা বিশেষ-

ভাবে চিন্তা করতেন। বলতেন, "দৃশ্যপট বা মঞ্চসজ্জার বাহুল্য (excess) বাস্তব সত্যকে বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।" 'তপতী' নাটকে এইদিক দিয়ে তিনি কিছুটা প্রয়াস পেয়েছিলেন, মঞ্চসজ্জাকে বাহুল্যবর্জিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার মধ্যে ছিল ভাবীকালের প্রয়োগব্যবস্থার প্রতি একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

শিশিরকুমার একাধারে প্রতিভাবান অভিনেতা এবং প্রথমশ্রেণীর প্রয়োগশিল্পী। বাংলা থিয়েটারে মার্জিত রুচির অভিনয় দ্বারা মঞ্চে নূতন যুগ প্রবর্তনের জন্য কলানুরাগীরা চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনেতা গিরিশচন্দ্রও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সব জড়িয়ে যে প্রয়োগনৈপুণ্য, অভিনয়ে যে সামগ্রিকতা ও সূক্ষ্মতার দিকে দৃষ্টি, তার প্রত্যেক অভিনেতাকে সব সময়ে কোনো কিছুতে রত রেখে সজীব করে তোলা, এ সবের দিকে প্রাক্-শিশিরযুগের কারোরই কোনোদিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল না। তখন যে কোনো নাটকের কয়েকটিমাত্র ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হোত, কিন্তু বাকী ভূমিকাগুলির অভিনয় ভালো হোত না এবং সব মিলিয়ে প্রয়োগশিল্পের ত্রুটি থাকতো অগুণতি। শিশিরকুমারকে প্রয়োগকর্তা হিসাবে উচ্চতম স্থান দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম ছোট ছোট ভূমিকার অভিনয়ের finish-এর দিকটা বড়ো করে দেখেছিলেন, ছোটখাটো অভিনেতার অভিনয়ে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। 'বিজয়া'র পরেশ এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাই জানেন কী অপূর্ব সুন্দর হয়েছিল এই ভূমিকাটির অভিনয়—তাও আবার একটি আনকোরা নূতন অভিনেতাকে দিয়ে। সবাই সেদিন মনে করেছিল, "একেবারে যেন জ্যান্তো পরেশকে পল্লীগ্রাম থেকে ধরে এনে কলকাতার রঙ্গমঞ্চের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে"—চেহারায়, হাসিতে, চলনে, বলনে, সাজসজ্জায় সে অভিনয় এমনই বাস্তবানুগ হয়েছিল। এইখানেই নাট্য-শিক্ষক শিশিরকুমারের কথা আসে।

শিক্ষক হিসাবে তিনি অপ্রতিরথ। প্রায় সম্পূর্ণ নূতন নট-নটী নিয়ে একটি নূতন থিয়েটারের পত্তন করা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্য-মন্দিরের পূর্বে আর দেখা যায় নি। শিশিরকুমার যদি সুদক্ষ শিক্ষক না

হতেন তা'হলে এ জিনিস সম্ভব হোত না। রবীন্দ্রনাথের মতন তিনিও অজস্র অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করেছেন। নাট্যমন্দিরের প্রথম যুগে নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমারের মধ্যে যে প্রশংসনীয় ব্যাপার দেখা গিয়েছিল তা হোল তাঁর সহকর্মী ও সহকর্মিনীদের উন্নতিকল্পে তাঁর স্নেহসিক্ত আচরণ ও প্রাণপণ প্রয়াস। এই সময়ে তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমার নাম হোক নাই হোক, দেশের নামকে আমি গৌরবময় করবো, এই ভেবে যে কাজ না করে সে দেশের কোনো অনুষ্ঠানকে সাধারণের আধার করে তুলতে পারে না। আর সকলকে বড়ো করলে তবে আমি বড়ো হব।" এই মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল বলেই না অত কম সময়ের মধ্যে তিনি অতগুলি শিল্পী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি অন্য অভিনেতার শক্তিবিকাশের পথ ও সুবিধা করে দেবার জন্য শিশিরকুমার সময় সময় নিজের অভিনয়কেও কুণ্ঠিত করতেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন যে, রিহার্সালের সময় তিনি বহুবার নাট্যাচার্যের ধৈর্যের প্রগাঢ়তা ও শিক্ষাদানের নিপুণ পদ্ধতি দেখে তিনি বিস্মিত হতেন। শচীনবাবু তারাসুন্দরীর একটি কথা উল্লেখ করে লিখেছেন: "তারাসুন্দরী একবার আমাকে বলেছিলেন, গিরিশবাবুর রিহার্সাল দেখেছি। ভাদুড়ীমশায়ের রিহার্সালও দেখি। অনেক তফাৎ। এমন করে মনের দুয়ার গিরিশবাবু খুলে দিতে পারতেন না।"

শিশিরকুমার ফাঁকি দিয়ে যুগপ্রবর্তক হননি, এম-এ পাশ-করা প্রতিভাবান অভিনেতা বলেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন নি। তিনি পরিশ্রম করেছেন, সাধনা করেছেন, যুগসচেতন শিল্পীর প্রত্যেকটি দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করেছেন, তবেই না তিনি নাট্যমন্দিরকে নাট্যজগতের শীর্ষদেশে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর যৌবনকালে শিশিরকুমার যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারতেন তার একটা দৃষ্টান্ত মিলবে ১৩৩৪ সালে নাট্য-মন্দিরের বড়দিনের অভিনয়সূচীতে (পরিশিষ্ট)। একাদিক্রমে তিনি দশরাত্রি অভিনয় করেছেন এবং এর মধ্যে আট দিন দুবার করে অভিনয় করেছেন। এ বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয়। নাট্যশিক্ষক হিসাবে দিনের পর দিন তিনি যে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, সে ইতিহাস ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক

লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে ঝোঁক (accent) দিতে হবে, কি ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আসবে, সবই শিশির-কুমার নূতন শিল্পীদের পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিতেন। এক সময়ে এমন ব্যক্তিকেও তৈরি করেছেন যাকে দেখে সেই অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে করতে পারে নি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনয়কালে অভিনেতার চাল চলনে হাবভাবে পাছে কোনোপ্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে, ওঠা-বসার, হাত ও দেহের ভঙ্গি কি ভাবে চালালে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে—এ সবই তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। তিনি নিজে নাটকের জন্য লোক বেছেছেন, শিখিয়েছেন। যতক্ষণ না কোনো অভিনেতার পার্ট সম্পূর্ণ সুন্দর হয়েছে, ততক্ষণ তাঁকে খুশি করা অসম্ভব ছিল। তাঁর নিজের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তার জোরে তিনি অন্যকেও সেই ভাবে দেখতে চাইতেন। বলতেন, কেন পারবে না, না পারবার কী হেতু থাকতে পারে। শিক্ষক হিসাবে শিশিরকুমারকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় বলতে পারি। তাদের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন, দৃষ্টির ব্যঞ্জনা, কণ্ঠস্বরক্ষেপণের ভঙ্গি, এমন কি তাদের সাজসজ্জা পদ্ধতি পর্যন্ত শিশিরকুমার মঞ্চের ওপর নিখুঁতভাবে তুলে ধরতেন। অভিনয়কে তিনি আবৃত্তি প্রধান করে তুলতে বলতেন না; বলতেন—"তোমরা তোমাদের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তোমাদের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলবে।" শরৎচন্দ্রকে তাই বলতে শুনেছি—"শিশির যত বড়ো না অভিনেতা তার চেয়েও উনি বড়ো নাট্যশিক্ষক।" শিশিরকুমার প্রকৃত নাট্যশিক্ষক ছিলেন, সেকালের motion master ছিলেন না। নূতন নট-নটী যেমন তৈরি করেছেন, তেমনি পুরাতনকালের নট-নটীদের নূতন যুগের উপযোগী করে তিনি গড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি নরম মৃত্তিকাপিণ্ড থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল তৈরি করতেন। এইভাবেই তাঁর প্রযোজিত প্রত্যেকখানি নাটকের অভিনয়ে সামগ্রিকতা মূর্ত হয়ে উঠতো। এ জিনিস বাংলা পেশাদার মঞ্চে শিশিরকুমারের পূর্বে ছিল অকল্পিত ব্যাপার। শিক্ষা, প্রতিভা, দূরদর্শিতা ও কল্পনার বিরল সমাবেশেই শিশিরকুমার নাট্যাচার্য হতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে বিশেষ করে শ্রীরঙ্গম পর্যায়ে

শুনেছি শিক্ষাদান ব্যাপারে তিনি নাকি বদ্ধমুষ্টি হয়েছিলেন। কাউকে শেখাতে চাইতেন না। আমার মনে হয়, এ অভিযোগ মিথ্যা। তা'হলে 'দুঃখীর ইমান' কেমন করে সফল হোলো, করিমচাচার সৃষ্টি কি করে হোল, শ্রীমতী রেবাই বা কি করে তাঁর সহ-অভিনেত্রী হোতে পেরেছিলেন?

নাটক নইলে থিয়েটার চলে না। নাট্যশালার গঠনে ভালো নাটকের অভাব কি গিরিশচন্দ্র, কি শিশিরকুমার দুজনকেই প্রতিপদে অনুভব করতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্র একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "প্রকৃত নাট্যকার তো প্রায় চল্লিশ বৎসর রঙ্গালয়ে বেড়াইয়া দেখিতে পাইলাম না।" তবে তিনি আক্ষেপ করে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কলম ধরেছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলা থিয়েটারের একটা প্রবল অভাব দূর করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। আর শিশিরকুমার বলতেন: "নবযুগের উপযোগী নবীন নাট্যকার পেলাম না—রঙ্গমঞ্চে এখনো তার পদধ্বনি শুনতে পাইনি। একদিন জাতির প্রার্থনায় এদেশে মাইকেল দীনবন্ধু গিরিশ প্রভৃতি আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, জাতীয় সাহিত্যকে তাঁরা যথেষ্ট অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন, সেই সঙ্গে রঙ্গালয়কেও। কিন্তু নাটকের দিক দিয়ে আধুনিক যুগ একেবারেই নিঃস্ব।" কিন্তু তাঁর এই আক্ষেপ আক্ষেপেই পর্যবসিত হয়েছিল। শিশিরকুমার কলম ধরেন নি। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ অভিনেতা, তাঁর প্রতিভা এক পথেই ধাবিত হোত।

শিশিরপ্রতিভা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে কি ভাবে সমৃদ্ধ করে গিয়েছে তার সম্যক মূল্যায়ন এখনই হয়ত সম্ভব নয়, ভাবীকালের নাট্যকলানুরাগী কোনো ঐতিহাসিক যখন যুগপ্রবর্তক এই নাট্যাচার্যের প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করবেন, তিনি যেন তখন মনে রাখেন যে, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হোয়েই শিশিরকুমার নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়কে তিনি একটা নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে গেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুশীলনশক্তি রঙ্গমঞ্চে রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিল। পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে বিলাতী কনসার্ট তো তিনিই উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করি। "অভিনয় কি কেবল অভিনেতৃরই ওপর নির্ভর করে? না। ভালো নাটক চাই। অভিনেতৃর অভিনয় করবার

সুযোগ পাওয়া চাই, রসকে জমিয়ে তোলবার সাজ-সরঞ্জাম, দৃশ্যপট, আলোছায়ার খেলা, সুর, সঙ্গীত, অর্থাৎ কল্পলোকের সৃষ্টির অনুকূল সব অবস্থা থাকা চাই, অভিনয় যাঁরা করবেন তাঁদের প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা, সাহচর্য চাই, আর চাই দর্শকদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি—এক কথায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ভাবসন্ধি থাকা দরকার নিবিড়ভাবে। সমাজজীবনকে প্রতিফলিত করতে হবে মঞ্চে। সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চেরও ভাবসন্ধি থাকা দরকার।"

ঢাকাই মসলিনের সুচারু ও সূক্ষ্ম বয়ন কার্য যেমন অনুভবের জিনিস, তেমনি অনুভূতির বিষয় ছিল শিশিরকুমারের অভিনয়স্থাপত্যের সূক্ষ্মতা। সে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, ব্যঞ্জনা, স্বরগ্রামের উচ্চতা-নিম্নতা, ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। তেমনি ছিল তাঁর অভিনয়। একমাত্র তাঁরই অভিনয়ে দেখেছি ইমোশনের সঙ্গে ইনটেলেক্টের সমন্বয়, অভিনেয় চরিত্রের interpretation-এর সঙ্গে অভিনীত নাটকের কাহিনীর illumination এবং এই শক্তি পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত মাত্র দু'চারজন অভিনেতার মধ্যেই দেখা গিয়েছে। প্রযোজক শিশিরকুমারের কলাজ্ঞানও ছিল অসামান্য; এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন: "As a producer of plays he took great pains with his sets and decor, but without allowing them to get the upper-hand." তাঁর প্রযোজিত প্রত্যেকখানি নাটকের প্রয়োগকৌশলের মধ্যে কৌশল অপেক্ষা কলারই যে প্রাধান্য থাকত, তার কারণ তাঁর রসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ, মুদ্রাজ্ঞান ছিল সঠিক। শিল্প এবং সাহিত্য দুই-ই রূপায়িত হোয়ে উঠত তাঁর অভিনয়ে। শিল্পসৃষ্টি তাঁর কাছে দু'দণ্ডের বিলাসের সামগ্রী ছিল না, এ ছিল তাঁর জীবনের সাধনা, অনুভূতির সামগ্রী। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল আবৃত্তি-কৌশল। রাম, দিগম্বর, মাইকেল প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর আবৃত্তির যাদুকরী শক্তি শ্রোতাদের কি ভাবে অভিভূত করত, সে-কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাচনভঙ্গী বাংলা থিয়েটারে আজ পর্যন্ত আর কোনো অভিনেতার মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি।

বার্ধক্য নটের ভীষণ শত্রু—অপরাজেয় শত্রু। ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী অভিনেতারা এ সত্য জানেন ও মানেন। একসময়ে ম্যাক্রেডি ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান অভিনেতা। কিন্তু পূর্ণ গৌরবের মাঝখানে তিনি রঙ্গালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়েও ম্যাক্রেডিকে কেউ আর রঙ্গমঞ্চে নামাতে পারে নি। স্যর ফোরবেস রবার্টসনও যথাসময়ে নাট্যজগৎ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে অর্থের জন্য বৃদ্ধবয়সেও অভিনয় করতে হয়েছে, তখন তিনি মঞ্চের ওপর ঠিক মতন দাঁড়াতেই পারতেন না। দানিবাবু অতীতগর্বের মহিমা নিয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তারাসুন্দরী সম্পর্কেও সেই একই কথা। শিশিরকুমারও এই ভুল করেছিলেন—এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল যেমন চির অম্লান, দৈহিক স্বাস্থ্যও ছিল তেমনি অটুট। জরার ভারে কেউ তাঁকে কোনোদিন নুয়ে পড়তে দেখে নি। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও মহাজাতি সদনে শেষ মঞ্চাবতরণ করেছিলেন তিনি। তিনি বলতেন: "দেহে যতদিন শক্তি আছে, গলা না পড়ে যাচ্ছে, আর উন্মাদ না হচ্ছি ততদিন আমি যা চাই, তা হোল নাট্যশালা।" শক্তি তাঁর অটুট ছিল, গলাও তাঁর পড়ে যায়নি—বার্ধক্যকে তিনি সত্যই জয় করেছিলেন। তবে মন তাঁর ভেঙে গিয়েছিল ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যে। সে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের হেতু—একটি জাতীয় রঙ্গশালা। দেশ তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেনি। তাই বুঝি সেই আত্মসচেতন শক্তিমান পুরুষ, সেই প্রতিভাধর শিল্পী অতি দুঃখে রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর মধ্যে দম্ভের প্রশ্ন ওঠে না।

শিশিরকুমারের মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে, ২৬শে জানুয়ারি মাইকেলের জন্ম-দিনে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। সেদিন সকালে তাঁকে আমার সদ্য প্রকাশিত 'মাইকেল' বইখানা দিতে গিয়েছিলাম—এ বই আমি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছি। খবর পাঠাতেই নীচেয় নেমে এলেন। বইখানা হাতে দিয়ে একটা প্রণাম করলাম। বললাম—আপনাকে না জানিয়ে বইটা আপনার

নামে উৎসর্গ করেছি। চোখের খুব কাছে বইখানা ধরে পাতা উল্টোতে উল্টোতে শিশিরকুমার গাঢ়স্বরে বললেন—"মাইকেলের ওপর অনেকেই অবিচার করেছে।"—"অবিচার তো আপনার ওপরেও করেছে, তবে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বোধহয় আপনাকে খেতাব দেওয়া হয়েছে।"—"এ খেতাবের কি মূল্য আমার কাছে? জানো, খেতাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।" শুনে চমকে উঠলাম। তখনো সংবাদটা কাগজে প্রকাশিত হয় নি। শিশির-কুমারের মধ্যে এক নূতন শিশিরকুমারকে দেখে সেদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠেছিল। খেতাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি দিল্লীতে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন, সেটি পরিশিষ্টে দেওয়া হোল।

১৯৫৯, ৩০শে জুন। রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে শিশিরকুমারের মৃত্যু হোল। তাঁর গৌরবময় জীবননাট্যের ওপর নেমে এলো শেষ যবনিকা। বরানগরের বাড়ির সেই নির্জন দ্বিতল গৃহে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস পড়ল শিশিরকুমারের। মঞ্চে একটি যুগের অবসান হোল।

"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী।"

'সীতা' নাটকে রামচন্দ্রের প্রতি সীতার এই উক্তি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনে যেমন, নটরাজ শিশিরকুমারের জীবনেও তেমনি মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। শিশিরকুমার যখন নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তখন বাংলায় এমন কোনো মনীষী ছিলেন না যিনি তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়েছিলেন, তাঁর বন্ধুত্বগর্বে গর্ববোধ করেন নি, এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। তবু নিঃসঙ্গতাই ছিল সেই মহৎ শিল্পীর জীবনের অভিশাপ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সত্যই লিখেছেন: "ষোড়শীর জীবানন্দের অভিনয়ে তাঁর সমস্ত গতি, এমন কি তাঁর ক্লান্ত পদচারণার মধ্যে যে সহজ চেষ্টাহীন নিঃসঙ্গতার ব্যথা ফুটে উঠতো, সে-নিঃসঙ্গতা যতখানি জীবানন্দের, ঠিক ততখানি শিশিরকুমারের।" তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁর আশেপাশে কত লোক এসেছে, চলে গিয়েছে, তবু নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ দিয়ে তাঁর মনের অন্তঃপুর কেউ ভরিয়ে তুলতে চায় নি। দেখা যেত বহুলোকের মাঝখানে শিশিরকুমার যেন নিঃসঙ্গ, তাঁর অন্তরলোক শূন্য—অভিনয়ের পর

প্রেক্ষাগৃহ যেমন শূন্য মনে হয়, ঠিক তেমনি। এই শূন্যতা, অন্তরের নিঃসঙ্গতা বিস্মৃত হবার জন্যই বুঝি তিনি দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

অত বড়ো শিল্পীর কেন এই মানসিক নিঃসঙ্গতা? সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তিনি, কৃতী অধ্যাপক তিনি—জীবনে তাঁর কোনো অভাব ছিল না, সমাজে ছিল তাঁর উচ্চ স্থান। কিন্তু নাট্যকলালক্ষ্মী একদিন ডাক দিলেন তাঁকে—গিরিশ-অর্ধেন্দুর প্রতিভাপুষ্ট বাংলা রঙ্গমঞ্চ ডাক দিলো তাঁকে। সে-আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। তাঁর পূর্ববর্তী যুগে সমাজ ও মঞ্চের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান ছিল, তা তো তিনি প্রত্যক্ষই করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে শিশিরকুমার ভেবে-ছিলেন, সমাজ ও রঙ্গমঞ্চের এই দুস্তর মানসিক ব্যবধান তিনি দূর করবেন। আর মঞ্চকে করে তুলবেন নাট্যানুরাগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিসন্তানের জীবিকা অর্জনের স্থান। প্রায় তিন যুগ ধরে তিনি এই চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবযুগ-স্রষ্টার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি। রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তিনি জাতির অন্তরকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন; এরই জন্য তাঁর সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল একটি স্বপ্ন—যার কথা তিনি বার বার বলতেন—"একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলব।" এ শুধু শিশিরকুমারের স্বপ্ন ছিল না, এই-ই ছিল তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর নিজের কথায়—"My very existence"; এবং তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে বলতেন,—'মনে ছিল আশা'— তখন কতদিন তাঁর চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছি—সেই ইডেন গার্ডেনে তাঁবু ফেলে থিয়েটার করার প্রথম দিনটি থেকে শ্রীরঙ্গম অধ্যায় পর্যন্ত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে শিশিরকুমার একটি স্থায়ী মঞ্চ পান নি যেখানে তিনি তাঁর প্রতিভার আরো চমকপ্রদ নিদর্শন দেখাতে পারতেন। আমার তো মনে হয় এই আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই শিশিরকুমারের শেষজীবনের তিক্ততার, ব্যর্থতার সুর বেজে উঠেছিল। এরই জন্য তাঁর অনেক নাট্যপ্রয়াস, অনেক কল্পনা ঠিকমতো রূপ পায় নি। শিশিরকুমারের মতন প্রতিভা এক শতাব্দীতে একটির বেশি জন্মায় না; অথচ তাঁরই শেষজীবনের অভিজ্ঞতা এই হোল যে—"বাড়িওলার লোকজন এসে

তাঁর জিনিসপত্র সমস্ত বাইরে ফেলে দিল। গায়ে জামাটা দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিশিরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন"—এই কথা লিখেছেন নৃপেন্দ্রবাবু। এই কলকাতা শহরের শিক্ষিত সমাজের যিনি একদা idol ছিলেন তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভে, একদা যাঁর কণ্ঠস্বর রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলতো শ্রোতার হৃদয়ে, যাঁর অভিনয়প্রতিভা মুগ্ধ করেছে বিদেশীদের—সেই যুগপ্রবর্তক শিশিরকুমারকে যে এমন রিক্তভাবে নাট্যশালা থেকে বিদায় নিতে হবে, এ কি কোনোদিন কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? সমাজে তিনি ব্রাত্য হয়েই রইলেন, অন্তরের নিঃসঙ্গতা নিয়েই তাঁকে এই পৃথিবীর মঞ্চ থেকে চলে যেতে হোল। রঙ্গমঞ্চে এই প্রতিভাধর নটের প্রবেশ যেমন গৌরবময়, তাঁর প্রস্থান তেমনি বেদনাদায়ক।

এখানে একটা প্রশ্ন আছে—তাঁর নটজীবনের অর্থনৈতিক পটভূমিটি তা'হলে কি কোনোদিনই উজ্জ্বল বা স্বচ্ছল ছিল না? 'সীতা' তো কম পয়সা দেয় নি? বিজয়া, রীতিমত নাটক, দিগ্বিজয়ী, জনা, ষোড়শী, বিপ্রদাস—এ সবই তো শিশিরকুমারের একাধিক থিয়েটারে triumph card-এর মতন ছিল। তা'ছাড়া, বাংলার নাট্যানুরাগী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে পরিমাণ অর্থসাহায্য লাভ করেছিলেন, তার পরিমাণ তো কম ছিল না। তাঁর নিজের পক্ষে কি একটা নিজস্ব থিয়েটার তৈরি করা সম্ভব ছিল না? না, তা ছিল না। শিশিরকুমার শিল্পী ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন: "রঙ্গালয় পরিচালনার গুরু ও বহুমুখী দায়িত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ও নিজের অভিনয় সবই শিশির অবলীলাক্রমে নিজের বিশাল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। হয়ত এত গুরুভার বহন একজন লোকের সাধ্যাতীত। সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত তাহার মত লোকোত্তর প্রতিভাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল।"

একবার চুঁচুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটর যতীন মুখোপাধ্যায় (শিশির-কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ইনি একজন) তাঁর বন্ধুকে অনুযোগ করে নাকি বলেছিলেন, "শিশির, টাকা তো তুমি কম পাও নি, একটু হিসেব করে চললে তুমি কি একটা নিজস্ব স্টেজ তৈরি করতে পারতে না?" উত্তরে

শিশিরকুমার বলেছিলেন : "ওইটাই তো ভুল করেছি, যতীন। But now it is too late to amend—" নাট্যাচার্যের এই স্বীকৃতি খুবই স্পষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে আমরাও যে ভুল করেছি, তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিই নি— এ কথাটাও বলতে হয়।

বসন্তের আবির্ভাবে রিক্ত বনভূমি যেমন অকস্মাৎ পত্রপুষ্পে বিপুল সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনি আমরা দেখতে পেলাম যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শিশির-প্রতিভার বাসন্তীস্পর্শে হৃতশ্রী বাংলা থিয়েটার যেন অকস্মাৎ নব-নবীনের সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠলো; তাঁর আকর্ষণে এলেন সব তরুণ নট-নটী এবং তাঁদের মিলিত প্রয়াসে বাংলা থিয়েটার যেন জমে উঠল, জ্বলে উঠল। কিন্তু আবার এও আমরা দেখতে পেলাম যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই পেশাদার থিয়েটারের অবস্থাটা কী দাঁড়াল। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার রঙ্গজগতে একটা দুঃসময় এসেছিল। তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন শিশিরকুমার। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে রঙ্গালয়ে তিনি উচ্চমানের নাটক প্রযোজনা করে বাংলার নাট্যজগতকে গৌরবান্বিত করে গিয়েছেন। কিন্তু থিয়েটারে অবনতি বা decadence-এর সূচনা দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। এই সময়ে রঙ্গালয়ে যে অকাল শুরু হোল, তারই জের চলেছে এখনো। শিশিরকুমার তাঁর জীবিতকালেই এ-জিনিস প্রত্যক্ষ করে গেছেন। মঞ্চমালিকেরা টাকার ওপর দৃষ্টি রেখে এই সময়ে নাটকের নামে যে সব বস্তু পরিবেশন করেন, তা বেশির ভাগই রসোত্তীর্ণ হোল না, ফলে নাটক দেখার দর্শক গেল কমে। থিয়েটারে এই অবনতি অনিবার্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে, যথা—(১) নূতন ভালো নাটকের দৈন্য; (২) পুরানো নাটকের অভিনয় আর (৩) খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স। শিশিরকুমারের যুগে নাটকের দৈন্য সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়। বহুবার আমি তাঁকে বলেছি, রঙ্গমঞ্চে আপনি প্রবেশ করেছেন একা, সঙ্গে কোনো প্রতিভাবান নাট্যকার পান নি, পরেও কোনো নাট্যকার তৈরি করতে পারেন নি। তাঁর যুগে সত্যকার ভালো নাট্যকার কোথায়? তাঁর প্রতিভা তো পুরাতন নাটকের অভিনয়েই

বেশির ভাগ নিঃশেষিত হয়েছিল, আর কয়েকখানি উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। অন্যান্য থিয়েটারে যেসব নাট্যকার ছিলেন তাঁরা জনপ্রিয় নটদের কথা মনে রেখে ফরমায়েসি নাটক লিখতেন মাত্র।

শেষজীবনে শিশিরকুমার দুটি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। একটি বাংলার সাধারণ নাট্যশালার শতবার্ষিকী উৎসব আর দ্বিতীয়টি হোল বাংলা থিয়েটারের প্রসিদ্ধ নাটকগুলির একটি theatre edition বা মঞ্চ-সংস্করণ তৈরি করা। বলতেন, "স্যর হেনরি আর্ভিং আর ফ্র্যাঙ্ক মার্শাল মিলে যেমন শেকস্‌পিয়ারের নাটকগুলির একটা থিয়েটার এডিসন বের করেছিলেন, আমাদের দেশের থিয়েটারের নাটকগুলির ঐ রকম একটা এডিসন বের করা খুব দরকার। তা নইলে নাটকের রস আস্বাদন ঠিকমত হয় না। নাটকের সাহিত্যের দিকটা যেমন দেখতে হবে, তার অভিনয়ের দিকটাও তেমনি বিচার্য।" দুঃখের বিষয়, এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সুযোগ তিনি পান নি।

ব্যক্তিত্বাভিমানী চির অপরাজেয় শিশিরকুমারের জীবনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া বাংলা থিয়েটারের ওপর সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

শিশিরকুমারের অসাধারণ শিল্পশক্তি, তাঁর সৃজনীপ্রতিভা দেশের জীবন ও মননশীলতাকে বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ—শিল্প-সাধনায় এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে গৌরবের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, রাজনীতিতে কিংবা মানবতার উদার প্রাঙ্গনে যেসব যুগপ্রবর্তক বাংলা দেশের জীবনধারাকে সমৃদ্ধতর করে গিয়েছেন, নাট্যকলার যুগপ্রবর্তক রূপে শিশিরকুমার তাঁদের সমগোত্রীয়। শিল্পী শিশিরকুমারের মতো মানুষ শিশিরকুমারও ছিলেন মহৎ। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাক্তন নট ও মঞ্চশিল্পী শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "দয়ালু, কোমল-হৃদয়, শিশিরকুমার লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিতে ভালবাসিতেন। আর্তত্রাণ, বিপন্নের বিপদমুক্তি তাঁহার জীবনের গোপন ব্রত ছিল। গিরিশ ও গিরিশোত্তর

যুগের বার্ধক্যে অক্ষম, বৃত্তি ও সহায়হীন, নট-নটীকে তিনি গোপনে অর্থ-সাহায্য করিতেন।"

শিশির-চরিত্রের আর একটি মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করতে হয়। অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন শিশিরকুমার। তাঁর জীবনে তাঁর মায়ের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কথিত আছে, 'সীতা' নাটকের উদ্বোধনের সময়, মঞ্চে প্রবেশ করবার আগে শিশিরকুমার সর্বাগ্রে তাঁর মাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর তাঁর মা-ই ছিলেন এই বৃহৎ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, শিশিরকুমারের থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতেন; তাঁর জন্য একখানি স্পেশাল বক্স থাকতো। প্রতিদিন বরানগরের বাসা থেকে শিশিরকুমার তাঁর মা-কে দেখতে যেতেন। মা-অন্ত প্রাণ ছিলেন শিশিরকুমার, তাই মায়ের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক পেয়েছিলেন। মাতৃভক্তি যেমন, তেমনি আবার ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন শিশিরকুমার। পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়েছে এবং সেকালের যৌথ-পরিবারের আদর্শে তিনি খুব বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। থিয়েটার পরিচালনার ব্যাপারে দেখেছি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃষীকেশ ভাদুড়ীর ওপর শিশিরকুমারের নির্ভরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই দায়িত্বপালনে হৃষীকেশবাবু চিরকাল তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন, বলা যেতে পারে। শিশিরকুমারের বন্ধুপ্রীতিও প্রবল ছিল। উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনাদর্শের অনুসরণ শিশির-চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। নাট্যশালার তিনি যথার্থ 'বড়বাবু' ছিলেন—শাসনে ও স্নেহে তিনি নাট্যশালা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই ভালবাসতেন।

প্রসঙ্গতঃ শিশিরকুমারের দেশপ্রেম সম্পর্কে কিছু বলব। সকলেই জানেন তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভে তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম, দেশের জন্য তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ শিশিরকুমারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারপর দেশের স্বাধীনতার জন্য তরুণ সুভাষচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য আত্মোৎসর্গ দেখে তিনি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শিশিরকুমারের দেশপ্রেমের মধ্যে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস হয়ত

ছিল না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কী আন্তরিকতা ছিল, তা তাঁরাই অনুভব করেছেন যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি কংগ্রেস সরকারের খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, শিশিরকুমার বুঝি স্বদেশপ্রেমিক ছিল না। এ ধারণা ভুল। তিনি গভীরভাবেই দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বিভিন্ন আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করতেন। যখন লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক হয়, শিশিরকুমার তখন রাজধানী দিল্লীতে—সবেমাত্র তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তিনি ভাইসরয়ের মিলিটারি সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অভিনয় সম্পর্কে যেসব সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেগুলো তাঁকে দেখিয়ে তিনি ভাইসরয়ের প্রাসাদে অভিনয় দেখাবার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বলেছিলেন: "আমার প্রস্তাবে ওরা রাজী হোল বটে, কিন্তু অভিনয় যাতে সফল না হয় তার জন্য বাধাও এসেছিল। উদ্দেশ্য—আমার failureটা নজীর হিসাবে বিলাতে দেখিয়ে বলবে, Indians are not fit for independence—তবে আমি খুব সজাগ ছিলাম। ভাইসরয়ের বাড়িতে যখন অভিনয় হয়, তখন সাজঘরে দেখি পুলিশের ব্যবস্থা। আমি আপত্তি জানালাম প্রবলভাবে। মিলিটারি সেক্রেটারিকে বললাম—'The police must be removed from the green room, otherwise I refuse to give the performance'—আমার এই দৃঢ়তায় ফল হয়েছিল—পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অভিনয়ও নিখুঁত হয়েছিল। সেদিন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের মধ্যে এসেছিল, তাতে করে আমার সামান্যতম ত্রুটিও ওরা কাজে লাগাতে পারবে জেনেই আমি খুব হুঁসিয়ার হয়ে অভিনয় করেছিলাম।" শিশিরকুমারের স্বদেশপ্রীতির উৎস ছিল বাংলার জাতীয়তাবাদ, গান্ধীমার্কা রাজনীতি নয়। তিনি নিজে ছিলেন বিপ্লবতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই তো তাঁর idol ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর ঘরে একমাত্র সুভাষচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনো দেশনেতার ছবি স্থান পায় নি।

তেমনি প্রসিদ্ধ ছিল শিশিরকুমারের সাহিত্যপ্রীতি। ইংরেজি সাহিত্যে—বিশেষ করে কাব্য ও নাটকে তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি

সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্তের কবিতাকে তিনিই তো জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁর সুকণ্ঠের আবৃত্তি দিয়ে। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচক। বাংলা নাটক সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। খ্যাতনামা নাট্যকারদের নাটক থেকে শুরু করে গীতাভিনয়ের নাটক পর্যন্ত সবই তিনি যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মতন নাট্যসমালোচক আমি খুব কমই দেখেছি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ডি. এল. রায়ের কোন্ নাটকখানা আপনার মতে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে বলেছিলেন—"সাজাহান। আমি এই নাটকখানাকে *King Lear*-এর সমতুল্য মনে করি।" বয়োঃজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রতি শিশিরকুমারের শ্রদ্ধার নিদর্শন আছে 'জলধর কথা' বইতে। জলধর সেনের ৭৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে (১৯৩৪, আগষ্ট) তাঁকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত 'জলধর কথা'য় শিশিরকুমার বাংলা সাহিত্যের এই প্রবীণ পূজারী সম্পর্কে লিখেছিলেন:

> "সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বাঙালির ঘরের কথা, সুখের কথা, দুঃখের কথা, জলধর দাদা আমাদের যেমনভাবে শুনিয়েছেন, আজকালকার অধিকাংশ লেখক তেমনভাবে শোনাতে পারেন না। তিনি শতায়ু হোন। তাঁর লেখনি ধন্য হোক এবং দিনের পর দিন এমনি করে রসসৃষ্টি দ্বারা আমাদের চক্ষু সজল করুন; অন্তর সরল করুন, ঠাকুরের চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।"

বহুপাঠী শিশিরকুমারের সাহিত্যপ্রীতির আরো অনেক নিদর্শন আছে। মঞ্চে অভিনয়, আর অবসর সময়ে চুরুট ও বই—এই ছিল শিশিরকুমারের জীবনের অবলম্বন, তাঁর ব্যসন। গৃহলক্ষ্মীর শূন্য আসন পূর্ণ করেছিলেন নাট্য-কলালক্ষ্মী এবং তাঁরই ঐকান্তিক সেবায় সার্থক ও সুন্দর হয়েছিল শিশির-কুমারের নটজীবন। তারই অন্যতম উপচার ছিল নিরলস অধ্যয়নস্পৃহা।

শিশিরকুমারের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব। এটিতে তাঁর চরিত্রের আর একদিক পরিস্ফুট হয়েছে। ঘটনার সাক্ষী ছিলেন অশোকদা (পরলোকগত পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী)। বাংলা

থিয়েটারের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশিরকুমারের সঙ্গে, তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল দেখেছি। ঘটনাটি আমি তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। তখন শ্রীরঙ্গমের আর্থিক অবস্থা খুব কাহিল। টাকার অভাবে শিশিরকুমার একখানা নতুন বই খুলতে পারছেন না। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অশোকদা'র মারফৎ তিনি বঙ্গলক্ষ্মীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে কিছু অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠালেন। শিশিরকুমারের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের ওপর ভট্টাচার্যমশাইয়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল এবং এমন একজন গুণীব্যক্তি টাকার অভাবে বিব্রত বোধ করছেন জেনে, তিনি তাঁকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করতে সম্মত হলেন। তারপর দুজনের মধ্যে একদিন সাক্ষাৎ হোল সচ্চিদানন্দের বরানগরের বাড়িতেই। সঙ্গে ছিলেন সুরেনবাবু আর অশোক শাস্ত্রী। পুকুরের ধারে সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে উন্মুক্ত আকাশের তলায় সেদিন মিলিত হয়েছিলেন এ-যুগের এক কৃতী ব্যবসায়ী এবং এক প্রতিভাধর নট ও নাট্যাচার্য। "আপনার কত টাকার দরকার?"—সোজা প্রশ্ন সচ্চিদানন্দের। "আপাততঃ হাজার পাঁচেক হোলেই নতুন বই নামাতে পারি।" তেমনি সোজা উত্তর শিশিরকুমারের।—"টাকা আমি আপনাকে দিতে পারি একটি সর্তে?"—"কী সর্ত, বলুন।"—"আমার গা ছুঁয়ে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি মদ আর স্পর্শ করবেন না।" চকিতের মধ্যে শিশিরকুমার মেরুদণ্ডটা সোজা করে নিয়ে উত্তর দিলেন—"আমি শিশির ভাদুড়ী, bluff দিয়ে টাকা নেব না। এ সর্ত আমি করতে পারি না।" অত্যন্ত খুশি হলেন সচ্চিদানন্দ তাঁর এই স্পষ্ট কথায়। অমনি তিনি শিশিরকুমারের হাত-দুখানি ধরে বললেন—"আপনার এই স্পষ্টবাদিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, সর্ত আপনাকে আর করতে হবে না। আমি কালই টাকা পাঠিয়ে দেব।" —"কোনো হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব?"—জিজ্ঞাসা করেন শিশিরকুমার।— "তার দরকার নেই।" ঘটনাটি মনে রাখবার মতন।

রঙ্গমঞ্চকে শিশিরকুমার ভালবাসতেন—এই ভালবাসার সম্পূর্ণ ইতিহাস ভবিষ্যতে একদিন রচিত হবে। সেদিন যেন আমরা শিশিরকুমারের এই কথা কয়টি বিশেষভাবে স্মরণে রাখি: "নাট্যশালাকে উন্নত করতে হোলে

সর্বাগ্রে মনের ভেতর থেকে নাট্যশালার সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে, তা দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য-গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস—নাট্যকলার মধ্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাটক। অভিনয় ব্যতিরেকে নাটক সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।" মনে রাখতে হবে, তাঁর এই ঈপ্সিত কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। শিশিরকুমারের মহত্ব কোথায়? এটা বৈশ্যযুগ—সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এই যুগের বিলক্ষণ প্রভাব। শিল্পের ওপরও এর প্রভাব এসে পড়েছে। সুখের বিষয়, "এই গ্লানিকর পরিবেশের মধ্যে শিশিরকুমার শিল্পীজনোচিত দম্ভের সঙ্গে লোভের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছেন। অর্থপ্রতি-পত্তির মোহে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়ে তিনি কঠোর দারিদ্র্যকেই বরণ করে নিয়েছিলেন", তবু বৈশ্যবৃত্তির যূপকাষ্ঠে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে বলি দেন নি। শিল্পজগতে তিনি সত্যই ছিলেন শিল্পাদিত্য। বাদশাহ আলমগীরের বেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রবেশ করেছিলেন—সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কাল আলমগীরের মতোই দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বাংলার মঞ্চ-সাম্রাজ্য শাসন করেছেন তিনি সগৌরবে। ক্ষমতা ও অর্থের পায়ে আত্ম-বিক্রয় করেন নি শিশিরকুমার। অভিনয় ছিল তাঁর জীবনের 'মিশন' বা সাধনা। সেই সাধনার বেদীমূলেই আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছেন শিশিরকুমার —এই কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

আমরা তাই আশা করবো, আগামীকালে আবার যেদিন আর একজন প্রতিভাধর নট এসে বাংলা নাট্যশালার যবনিকা উত্তোলন করবেন, সেদিন তিনি হয়ত নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন। আজ এই মহৎ শিল্পীর জীবনের প্রশান্ত পরিণতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আমরা আর এক মহৎ শিল্পীর অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় থাকব।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

॥ এক ॥

প্রযোজক শিশিরকুমার

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় দক্ষতা ঘরোয়া প্রশংসার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নাটক সম্পর্কে এদেশে যাহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অভিনয়-প্রতিভা অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার নাটক-প্রযোজনা সম্পর্কে যথেষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি যে কয়টি বিষয়ে ঔৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

সাধারণ দর্শকের নিকট বোধ হইতে পারে যে নাট্যকার ও অভিনেতাদের উপরই নাটকের মঞ্চ-সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটককে মঞ্চস্থ করার সাফল্যে ইঁহাদের অবদান ততোটা নয়।

ভালো লেখক এবং সু-অভিনেতা অবশ্যই একটি সু-অভিনীত নাটকের পক্ষে অপরিহার্য্য, কিন্তু তাঁহারা যদি একটি দক্ষ প্রযোজকের দ্বারা পরিচালিত না হ'ন তবে ফল নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠিতে বাধ্য। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রযোজকই হইতেছেন নাট্যাভিনয়ের আদত মানুষ।

বহুতর সীমানিষেধের ভিতরে থাকিয়া প্রযোজককে ভাবপ্রকাশ এবং শিল্পসম্মত উপস্থাপনের দ্বারা একটি কল্পনার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়। নাটকের দুর্বল অংশগুলির সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সঙ্গতি-হীন বা আত্মবিরোধী বিষয়গুলিকে বাদ দিতে হয় এবং নূতন বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়া অভিনয়ের পারম্পর্য রক্ষা করিতে হয়। প্রচলিত ভদ্রতা বোধের মাপকাটিতে এবং আইনে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন নিষিদ্ধ। সুতরাং নাটকের সংশোধন শুধু আংশিক পরিবর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য; বাংলাদেশের মঞ্চাভিনয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এ বিষয়ে পথিকৃতের গৌরবের অধিকারী। তাঁহার পূর্বে প্রযোজকরা কচিৎ এই পন্থা অবলম্বন

করিতেন, এবং নাটকের এইরূপ সংশোধন করিলে দর্শকরা ধৈর্য্যচ্যুত হইত, কারণ তাঁহারা ঔৎকর্ষ অপেক্ষা নাটকের বিস্তৃত পরিধিই অধিকতর পছন্দ করিত। এ যুগের দর্শকদের শিল্পবোধের মাপকাঠির পরিবর্তন হইয়াছে; এখন পরিধি অপেক্ষা নাটকের ঔৎকর্ষই সমধিক আদৃত হইতেছে। এক একটি দৃশ্য যদি অবাস্তব বলিয়া মনে হয়, তবে বর্তমান কালের দর্শকরা পীড়িত হইয়া ওঠেন।

নাটকের দৃশ্যবস্তু ও আনুষঙ্গিক চরিত্র পরিবর্জন ও সংশোধন ছাড়াও, শিশিরকুমার আরেকটি রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কগুলির বিন্যাস পরিবর্তন করিয়া এবং একটি চরিত্রের উক্তি অন্য চরিত্রকে দিয়া বলাইয়া অথবা কোনও দৃশ্য বা অঙ্কের সামান্য এদিক-ওদিক করিয়া তিনি অভিনবত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইহার ফলে নাটকের গতি ও পরিণতি সুসমৃত ও সরল হইয়াছে। নাটকীয় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতির দিক দিয়া এই অভিনবত্ব যাদুকরী হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্বত্রই এইরূপ প্রয়োগরীতি নাটকের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। যতদিন অবধি নিখুঁত নাটক যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হইতেছে, ততদিন প্রযোজককে এইরূপ পরিমিত ক্ষেত্রেই তাঁহার নৈপুণ্য দেখাইতে হইবে। মাত্র ইহাই নয়। কলাবিদগ্ধ অভিনেতা, অভিপ্রেত দৃশ্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত অর্থ-সংস্থানের অভাব, এবং সর্বোপরি সমাজ-চেতনা,—এই সমুদয়ই নাটক-প্রযোজকের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে শিশিরকুমারের পূর্বে দেবদেবীদিগকে মানবীয় রীতিনীতির মাধ্যমে মঞ্চে দেখানো বিশেষ আপত্তিকর ছিল। কাল পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সুষ্ঠু মনোভাব দেখা যাইতেছে; ইহা সুলক্ষণ।

প্রত্যেক নাটকেই একটি মূল বস্তু বিদ্যমান—কোনো একটি সমস্যার সমাধান এবং শেষ পরিণতির দিকে নাটককে অগ্রসৃত করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি নাট্য-চরিত্রের সহক্রিয়তা প্রয়োজন। অনাবশ্যক ও সঙ্গতিহীন কোনো চরিত্রকেই মঞ্চে উপস্থিত করা বিধেয় নহে। জগতের বৃহত্তর এই জীবন-মঞ্চে উচ্চ নীচ প্রত্যেক চরিত্রেরই স্থান আছে, এবং জীবন-অভিনয়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই সহক্রিয়তার দ্বারা প্রতিদিনের অভিনয় সাধিত

হইতেছে। এই সহক্রিয়তার মূল্য সম্পর্কে শিশিরকুমার সজাগ ছিলেন এবং জীবনের অভিনয় হইতেই তিনি নাট্য-অভিনয়ের প্রযোজনারীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক অভিনেতা যখন অন্ত অভিনেতাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ম নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে তখনই সহক্রিয়তার মূল্য নিঃশেষ হইয়া যায়। শিশিরকুমার প্রত্যেক অভিনেতাকে বিশেষ ভাবেই পরখ করিয়া নিতেন, এবং নাটকের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে অভিনেতাকে নাটকের সাফল্যের দিক দিয়া প্রয়োজন, তাহাকেই সমধিক প্রাধান্ম বিস্তার করিতে দিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই: রবীন্দ্রনাথের "শেষ-রক্ষা" নাটকে নাট্যকার ইন্দুমতীকে অন্যান্ম চরিত্র অপেক্ষা বেশি প্রাধান্ম দিয়াছিলেন; শিশিরকুমার কিন্তু কমলমণি ও ক্ষান্তমণিকে এমনভাবে অভিনয়ে নিযুক্ত করিলেন যে তাহাদের অভিনয়ের ফলে ইন্দুমতীরই প্রাধান্ম হইয়া উঠিল। যদি এই চরিত্র তুইটি প্রযোজকের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া স্ব-স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে সহক্রিয়তার কোনো মানেই হইত না। সহযোগী অভিনেতাদিগকে প্রত্যেক চরিত্রই শিশিরকুমারের নাটকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিতে দেখি। নাটকের গতি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদাই চরিত্রগুলির তুর্বলতা বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয়ের ভিতর দিয়া সুসংহত ও সংশোধন করিয়া দিতেন। এই একটি দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে যে তিনি "টিম ওয়ার্ক" বা বিভিন্ন অভিনেতৃর সহক্রিয়তাকে কতোটা মূল্য দিতেন ও আগাইয়া নিয়াছিলেন।

নাটকের অভিনয়-সাফল্যে দর্শকদের সহযোগিতাও প্রচুর কার্যকরী হইয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয় ও অসময়ে করতালি প্রদান দর্শক-বিশেষের ব্যক্তিগত উল্লাসের নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক সময়ে নাটকের গতি ব্যাহত করে। সীতার বনবাস যাত্রার পূর্বদৃশ্তে রাম ও সীতার বিদায় সময়ে যদি করতালি দেওয়া হয়, তবে সেই বিদায়-দৃশ্তের ঘনীভূত রসসৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার, সীতার পরিচারিকাদের কৌতুককর অভিনয়ে যদি দর্শক করতালি না দেয়, তবে সেই দৃশ্যও অকিঞ্চিৎকর হইয়া ওঠে। অবশ্যই মঞ্চ এবং দর্শকদের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা আছে। কিন্তু এই

নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে মনস্তাত্বিক কারণ থাকা চাই। এই পরিবর্তন বা পরিণতির গতি স্বাভাবিক করিবার জন্য নাট্যকারকে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়। এ রকম ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, যেখানে নাট্যকার নাটকের গতির মোড় অকস্মাৎ ঘুরাইয়া দিয়াছেন, কোনোরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও। প্রযোজককে এই সব আকস্মিক গতি পরিবর্তনের একটা সুসংহত কারণ বা ভাষ্য উপস্থিত করিতে হয়। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রযোজককে এই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশের সমাবেশ করিয়া তুলিতে হয়। মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া শিশিরকুমার এই সব ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মাতা মুরার নিকট নন্দের জন্য অনুনয় করিতেছিল। এই দৃশ্যটি নাটকীয় পরিবেশে এত তীব্র যে যে-কোনো মুহূর্তে মুরা চন্দ্রগুপ্তের অনুনয়ে বিচলিত হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ নাটকীয় পরিবেশে শিশিরকুমার অকস্মাৎ চাণক্যকে দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সম্বোধন করাইলেন, এবং পর মুহূর্তেই চন্দ্রগুপ্তকে আগের কথায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানসিক দুর্বলতার দুর্লভ ক্ষণটি অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আর শতচেষ্টাতেও মুরার মন দ্রবীভূত হইবার নয়। সাধারণ দর্শকের চক্ষে চাণক্যকে দিয়া চন্দ্রগুপ্তের অনুনয়ের বাধাদানের মূল্য ধরা পড়িবে না, কিন্তু একজন মনস্তত্ত্বের অনুশীলন-কারীর কাছে এই সামান্য ব্যাপারটির অসামান্য মূল্য প্রতিভাত হইবে।

সু-উচ্চারিত পার্ট বলা শুধু একটি আর্ট নহে, নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য। শ্রুতিমধুর হওয়াই শেষ কথা নহে, নাটকটির গল্প এবং সংলাপ ও প্লটটি যাহাতে দর্শকের নিকট সহজে বোধগম্য হয়, প্রযোজককে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। সমসাময়িক অভিনেতাদের তুলনায় শিশিরকুমার উচ্চারণ বিষয়ে যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন, এ তাঁহার নিকৃষ্টতম শত্রুও স্বীকার করিবে। উচ্চারণে সাফল্যলাভের কারণ এই ছিল যে, শিশিরকুমার মাত্রা লয় মান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।

অভিনেতাদের ব্যক্তিগত চেহারা, ব্যবহার, চলাফেরা, স্বর ইত্যাদি বিচার

করিয়া শিশিরকুমার তাহাদের পার্ট নির্দিষ্ট করিতেন। এই রীতির ব্যতিক্রম করার অর্থই হইতেছে শিল্পের মূল সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা। যথাযথ অভিনেতৃ নির্বাচনে শিশিরকুমারের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনে, পশ্চাৎপট এবং আলোকসম্পাত বিষয়ে শিশিরকুমারের দৃষ্টি প্রখর ছিল। 'রঘুবীর' নাটকে দুইটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ বিদ্যমান, এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে ভিতরের ধারাটি পরিণতি লাভ করিয়াছে। সমগ্র নাটকটি নাতি-প্রোজ্জ্বল আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হইয়াছে; আলোকসম্পাতের এই আধুনিক টেক্‌নিক্ দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'শাজাহান' নাটকের একটি দৃশ্যে, যেখানে সপরিবার দারা মরুভূমির ভিতর দিয়া চলিয়াছে, সেখানে সমগ্র দৃশ্যে একটি কথাও নাই; পরবর্তী দৃশ্যে তাহারা নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছে। এই নিঃশব্দ যাত্রা অভিনয়ের ঔৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয় এবং দর্শকরা অভিভূত হইয়া পড়ে। 'সীতা' নাটকে নেপথ্য-সঙ্গীতের দ্বারা অতীত দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মূক অভিব্যক্তি বিষয়ে আমার জ্ঞান যাহা তাহাতে আমি বলিতে পারি যে শিশিরকুমারের জ্ঞান এই বিষয়ে গভীর ছিল। তাঁহার কয়েকটি অভিব্যক্তি খুবই বৈজ্ঞানিক-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিতে পারি। 'আলমগীর' নাটকে দিলীর খাঁ যখন দুর্গাদাসের প্রশস্তি করিতেছিল তখন শিশিরকুমারের অঙ্গুলিসঞ্চালন আলমগীরের অসহিষ্ণুতা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই।

'ষোড়শী' নাটকে ষোড়শী যখন কাগজপত্র জীবানন্দের হাতে তুলিয়া দিল, তখন ঐ কাগজগুলিকে শিশিরকুমার দাঁত দিয়া কামড়াইয়াছেন। অন্তরের দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ-প্রয়াসের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি আর কি হইতে পারে জানি না।

অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা এবং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের কাছে শুনিয়াছি, "শিশিরবাবু অমুক তমুক অভিব্যক্তি প্রায় করেন, এটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে।" হায়, বন্ধুরা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কতোটুকুই বা জানেন! কীই বা তাঁহারা বোঝেন বা বোঝাইতে পারেন।

প্রযোজকরূপে শিশিরকুমারের স্থান অদ্যাবধি অদ্বিতীয় হইয়া আছে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। *

—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন : নির্মলকুমার ঘোষ।

॥ দুই ॥

নটরাজ শিশিরকুমার

আমি তখন নিজগ্রাম উখরায় চিকিৎসা করি। সেখানে ১৯২০ সালের ২৬শে নভেম্বর বন্ধুবর কবি ধরণীধর চট্টোপাধায় একটি টেলিগ্রাম পাইলেন ; কলিকাতা হইতে সুধা দা' (শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়) তার করিয়াছেন 'Starting tonight Ukhra'—সেই টেলিগ্রামের পশ্চাদ্ভাগে ধরণীধর আমায় লিখেছেন—"কোনও প্রকার তাণ্ডবতায় যাহার আপত্তি নেই ও সকল রকম অসম্ভবতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহার নিতান্ত নিজস্ব, তাহার পক্ষে ঘরে থাকাই আশ্চর্য। আমরা সকলেই, আমাদের শ্রেষ্ঠতমের ভাষায় 'সুদূরের পিয়াসী'। বৈদ্যুতিক বার্তাবহ এখনই এই সংবাদ আনিল। কুমার-ডিহিতে লোক পাঠাইলাম—সেখানে 'শিশির' সুধাময় অথবা 'সুধা' শিশির-সিক্ত হয়ে যদি এসে থাকেন। আমরা বেরুচ্চি বেলা ১০-১০॥০টায়।" এই টেলিগ্রামের কথা ধরণীধরের কাব্যগ্রন্থ "জীবনখাতার" ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। বর্দ্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা পুস্তকেও কবি ধরণীধরের কথা লিখিত হইয়াছে।

নির্ধারিত দিনে শিশির দা' ও সুধা দা' আসেন। সুধা দা' ও ধরণীর মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, এবং সুধা দা' ও শিশির দা'র মধ্যেও ছিল একান্ত একাত্মতা। বন্ধুত্বের এই স্বতঃসিদ্ধ সূত্র অনুসারেই আমার বন্ধুত্ব হয় সুধাদা' ও শিশির দা'র সঙ্গে। এই দলের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং সকলেরই অনুজ-প্রতিম প্রীতিভাজন শ্রীমান শৈলবিহারীলাল সিংহ উখরা এষ্টেট জমিন্দারিজ-লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

অতঃপর এই সুদূরের পিয়াসীর দল উখরায় কয়েকদিন ক্রমাগত রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি, খণ্ড খণ্ড অভিনয় ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাপন করেন। সেখানেই শৈলবিহারী দে-র বাড়ীতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শিশিরদা'র 'বন্দীবীর' আবৃত্তি শুনি। পরের দিন সকলে মিলে মোটর নিয়ে শৈলবিহারী দের শালবন চক গোপালে যাওয়া হয়। সেখানে চারিদিক খোলা খড়ের ছাউনি তাঁদের কাছারী বাড়ীতে সমস্ত দিন এবং রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত শিকার, বনভোজন ও মজলিসী আনন্দে অতিবাহিত হয়।

এ-সময় শিশির দা'র বয়স আনুমানিক ৩০।৩১ বৎসর, তিনি তখন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে পূর্ণ উদ্যমে ইংরাজীর অধ্যাপনা করছেন। স্বশক্তিতে আস্থাবান হলেও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মনে তখনও যেন কুয়াসাচ্ছন্ন ভাব। কয়েকদিন ধরেই মজলিসের হাল্‌কা হাওয়া বয়ে যাওয়ার পর একটু পরিবেশ পাওয়া গেলেই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়—শিশিরদা'র ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে। তিনি যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত হয়ে প্রাচীনপন্থী আদিধর্ম পালন করবেন না, এ বিষয়ে আমাদের সকলের মধ্যেই ঐকমতের ঐকতান বেজে উঠলো।

শিশিরদা'র মনের অবস্থাটা তখনো—"যাবো কি যাবো না, মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোক লাজে" রূপ—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছটফট কচ্ছে। নিত্যই তাঁর মনের সংকল্প-বিকল্পের দোলায় আমরা সকলে মিলেই দোল খেতে লাগলাম। সমস্যাটার এক প্রান্তে হল—কলেজে প্রতিষ্ঠিত থেকে মধ্যে মধ্যে amateur—অভিনয় করে গতানুগতিক জীবন যাপন করা আর অপর প্রান্তে হল—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে নাট্যশিল্পে আত্মনিয়োগ বা আত্মসমর্পণ করা। শেষপর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানে—"The devotion to something afar from the sphere of our sorrow—The desire of the night for the morrow—" (—Shelley)-ই জয়ী হল—অর্থাৎ সুদূরের পিয়াসী দলের সুদূরের পিপাসাই চরিতার্থ হল। সকলে মিলে শিশিরদা' ও সুধাদা'কে অণ্ডালে ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হল—তাঁরা ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়লো। শিশিরদা' রুমাল নেড়ে স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন—"stage"!

এর পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক মাস পরেই তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে J,F. Madan-এর রঙ্গালয়ে যোগ দেন,—সে ইতিহাস সকলেই জানেন।

চক গোপালের মনোরম আরণ্য পরিবেশ শিশিরদা'কে মুগ্ধ করেছিল; পাশেই একটী অনতি বৃহৎ অগভীর জলাশয়ে এক ফোঁটাও জল নেই দেখে তিনি একদিন বলে উঠলেন—"ওহে জল যে ধু-ধু করছে পুকুরে!"

স্থানটি তাঁর এতই ভালো লেগেছিল যে তিনি ঐ শালবনে মাঝে মাঝে শহর থেকে এসে সপ্তাহান্ত যাপন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীশৈলবিহারী নামমাত্র শালিয়ানা জমায় তাঁহাকে কয়েকশত বিঘা সমেত ঐ জায়গাটি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মব্যস্ততায় তাঁহার আর দ্বিতীয়বার সেখানে আসা সম্ভব না হওয়ায় তিনি এই বন্দোবস্তে পরে ইস্তফা দিয়া দেন।

উখরায় ও চক গোপালে কয়দিন সুধাদা'র রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-কবিতার অনুপ্রাণিত উদাত্ত অভিনয়কল্প আনন্দময় আবৃত্তি থেকে আমি যেন রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশভঙ্গীর এক নূতন সন্ধান পাই। শিশিরদা'র হাস্যে, কথার ভাবভঙ্গীতে চোখে মুখে উছলে পড়া আনন্দমুখর কৌতুক এবং ইংরাজী সাহিত্যের ভাবাবেগ পূর্ণ প্রাণবন্ত উদ্ধৃতি মনে চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

এরপর ইং ১৯৩১ সালে কলিকাতায় আমি তাঁর চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হই। তাঁহার শরীরে একই সঙ্গে বহু স্ফোটক ও বিস্ফোটকের আক্রমণ হয়। শিশিরদা' লিখে পাঠালেন—"একবার আসিতে পারেন? বড় কষ্ট পাইতেছি—এক সঙ্গে অনেকগুলি ফোড়ার আক্রমণ—ইতি প্রীতিমুগ্ধ শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী।" (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-১৯৩১) তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল সেগুলির সঙ্গে আমার হস্তের ও শস্ত্রের যোগ ছিল। পৃষ্ঠদেশে ক্ষতচিহ্ন বীরের চিহ্ন নয় বলে একদিন কৌতুকও করেছিলাম।

এই সময় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মন্দিরের চাবি' প্রকাশমাত্রই নিষিদ্ধ হয় এবং এই নিষেধ সংবাদটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই শিশিরদা' জানতে পেরে আমাকে জানিয়ে দেন, ফলে আমি সমস্ত বইগুলি সঙ্গে

সঙ্গে বুকপোষ্ট যোগে যত্র তত্র পাঠিয়ে গ্রন্থের পুঁজি নিঃশেষ করে ফেলি,—পুলিশ এসে একখানি বইও পায় নি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাঁজের প্রদীপ'-এর প্রথমে 'দীপালী নাম দিয়েছিলাম। পরে ঐ নামে অন্য পুস্তক আছে বলিয়া শিশিরদা'র ইচ্ছানুসারে তাহার রাশিনাম গোপন করিয়া প্রচ্ছদপটে নাম রাখা হয় "সাঁজের প্রদীপ'। ইহাও তাহার ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

শিশিরদা'র রঙ্গালয় সম্পর্কে আর্থিক অভাব অনটন বহুবার উপস্থিত হয়। শ্রীশৈলবিহারী তাঁহার শুধু ভক্ত নহেন, চিরদিন তাঁহার অভিনয়কলার অনুরাগী ছাত্র। তিনি তাঁহার আচার্য হিসাবে শিশিরদা'কে কয়েক সহস্র টাকা অর্থসাহায্যও করেন। এই টাকা ফিরিয়া না পাওয়ার জন্য তাঁহার মনে কখনো কোন ক্ষোভ দেখি নাই।

'সীতা'র প্রথম অভিনয় রজনীতে উখরা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা উভয়ে আসিয়া নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনয় দর্শন করি।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমার 'মন্দার ও মালঞ্চ' নাম্নী নাটিকাটি মুদ্রিত হয় তখন তিনি শ্রীরঙ্গমের শেষ অধ্যায়ে উপনীত। তিনি স্বয়ং আসিয়া নাটিকাটির কিয়দংশ শোনেন, অবশিষ্ট অংশ আমি উঁহার আমন্ত্রণে তাহার নিকট গিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শোনাই। আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে সেটিকে তাঁহার রূপদান করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীরঙ্গমের পর তিনি বরাহনগরে বাসকালে আমার উপর দিয়া নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া যায় এবং আমি তাঁহার সংস্রব হারাই—ইহা চিরদিনই আমার অনুশোচনার কারণ হইয়া থাকিবে।

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

॥ তিন ॥

প্রতিবেশি শিশিরকুমার

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে কুড়ি বৎসর পূর্বে আমার প্রথম পরিচয় হয়—তাঁহার বি টি রোডের বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকের বাড়ীতে

আমি ছিলাম ভাড়াটে। আমাদের দুই বাড়ীর ছিল common টিউব-ওয়েল ও পাতকুয়া।

প্রথম আলাপে আমি "ঢাকার বাঙ্গাল" বলাতে তিনিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"মশায়, আমিও বাঙ্গাল—আমাদের বাড়ী ছিল রাজসাহী জেলার "খাজুরিয়া গ্রামে। আমার বাবা সাঁতরাগাছি এসে বসবাস করেন; আমরাও সেখানে তাই আছি।

তারপর বহুদিন অনেক বিষয় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁহার বাড়ীতে নিজস্ব একটী লাইব্রেরী আছে—আমাকে সেখানে গিয়ে বই পড়তে বলতেন; বেশীর ভাগ বই ছিল ইংরাজী নাটক, নভেল।

তিনি পড়াশুনা করতে খুবই ভালবাসতেন। আমি দেখেছি যে রাত আড়াইটা পর্যন্ত টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে তিনি রোজই পড়তেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে—তাঁহার ছোটবেলা হতেই এরূপ পড়ার অভ্যাস আছে। তাঁহার বিবাহের পরও রাত্র ২টা ২॥০টা পর্যন্ত এরূপ পড়াশুনা করতেন বলে তাঁহার স্ত্রী ভাবতেন যে স্বামীর মন মতন তিনি বোধ হয় হন নাই, তাই তাঁকে অবহেলা করছেন—এই অভিমানে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। আমি অফিস হ'তে বাড়ী ফিরলেই ভাদুড়ী মহাশয় প্রায়ই আমাকে ডাকতেন—তিনি বড় আলাপপ্রিয় ছিলেন—এবং আমাকে খাবার ও চা দিয়ে আদর করতেন।

তাঁহার কাছে অনেক লোকের সমাগম হতো। এবং অনেকেই তাঁহাকে ফল ও নানারূপ মিষ্টি দিতেন। তিনি আমার ছেলেপিলেদের খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

প্রায় সময়ই তাঁহার আবৃত্তি, কবিতা, পাঠ ইত্যাদি শুনতাম।

তাঁহার বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটী বারান্দা আছে। সেখানে তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যেসব লোকজন আসতেন তাঁহারা কেহই দাঁড়াইতেন না। শিশিরবাবু তাঁদের বলতেন "পাশের বাড়ীতে বউমা আছেন, ওখানে কেউ দাঁড়িও না।" তিনি ছিলেম একজন সতর্ক প্রহরী—আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের ও আমার স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। একদিন দুপুরে আমার বাড়ীর দরজা খোলা দেখে দুইটি পাঞ্জাবী সাধু

আঙ্গিনায় ঢুকে পড়লো। ওদের দেখে আমার স্ত্রী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল— একলা বাড়ী—তার উপর সাধু দুইজন ভবিষ্যৎবাণী করে কিছু আদায়ের মতলবে ভয় দেখাল। শিশিরবাবুর কাণে এই হল্লা যাওয়াতে তিনি উপর থেকে নেমে এসে সাধু দুজনকে গালাগালি দিয়ে জোর করে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন।

অন্য একদিন আমার বাড়ী ফিরতে রাত্র ১০টা হবে, স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্র ১১টায় ফিরি নাই বলে, আমার স্ত্রীর মনে একটু ভয় হল—তখন আমার স্ত্রী ভাদুরীমশায়ের চাকর ঝগড়ুকে দুই-এক-বার ডাক দিল—চাকর কিন্তু ঘুমে অচেতন—ডাক শুনে নাই। কিন্তু উপর হইতে শিশিরবাবুর কাণে এ ডাক পৌঁছিল—তিনি শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে ডেকে বলিলেন—"ওগো, ও বাড়ীর বউমা বোধ হয় ডাকছেন, দেখতো কি দরকার"—শ্রীমতী কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া আমার স্ত্রীর কথা শুনে ভাদুরী মশায়কে বললেন যে, আমি তখনও বাড়ী ফিরি নাই বলে আমার ভয় হচ্ছে। শিশিরবাবু তখনই আমার অফিসে ফোন কল্লেন—এবং জানিলেন যে আমি বাড়ীতে রওনা হইয়া গিয়াছি। তিনি তাহার চাকর ঝগড়ুকে আমার বাড়ীতে বসাইয়া রাখিলেন যতক্ষণ না আমি বাড়ী পৌঁছিলাম।

ভাদুরীমশায়ের স্বাস্থ্য ছিল অটুট—আমাকে তাঁহার মাংসপেশী দেখাইতেন এবং দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া আমাকে বলিতেন যে ৫০ বৎসর বয়সেও তাঁহার একটী দাঁতও নড়ে না।

তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা ছিল আশ্চর্য রকমের—তাঁহার সর্ব কনিষ্ঠ ভাইয়ের হয়েছিল যক্ষ্মার সূত্রপাত। তিনি নিজে তাহার সেবা পথ্য ঔষধ দিতেন এবং মান্দ্রাজ সেনিটোরিয়ামে তাহাকে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন। আমাকে বলিতেন যে তাঁহার ছোট ভাই তাহার প্রাণাধিক—তিনিই স্বহস্তে তাহাকে পালন করিয়াছেন—অপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহ!

তিনি যেসব বায়োস্কোপে নামিয়াছেন যেরূপ—চাণক্য, রীতিমত নাটক ইত্যাদি—যখনই এসব বই কলিকাতার কোন সিনেমাগৃহে দেখান হ'ত, আমাকে পাশ দিতেন—বলতেন, বউমাকে নিয়ে গিয়ে দেখে আসুন। তাঁহার

শ্রীরঙ্গমেও অনেকবার আমাদের বক্সে বসে থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ করেছেন—সব সময় তাঁহার অনুরোধ এড়াতে পারি নাই, বিশেষতঃ "আলমগীর", 'সীতা', 'ষোড়শী' প্রভৃতিতে।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। শিশিরবাবু ব্রাহ্মণের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার আমার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কোন কারণে একটু ঝগড়া হয়। ওরা বরাহনগরে খুব প্রতিপত্তিশালী জমিদার। একদিন আমাকে অনেক লোকসহ ঘেরাও করিয়া অপমানিত করিল। আমি আমার অফিসের সাহেবের মারফতে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলাম ও পুলিশ হইতে তদন্ত হইল। সকালে এ ঘটনা হইয়াছিল, তখন শিশিরবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। রাত্রে বাড়ী আসিয়া শ্রীমতী কঙ্কাবতীর নিকট ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "চাটুয্যে-মশায়, আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই ব্রাহ্মণকে এরূপ অপমান করতে সাহস করেছে—আমি বাড়ীতে থাকলে ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াত। যাক্ আপনি আপনার সাহেবের মারফৎ প্রতীকার চাহিয়াছেন, ভাল—। আচ্ছা কাল দেখা যাবে।" পরদিন জমিদার পরিবারকে (তাহারা শিশিরবাবুর বাড়ীর সংলগ্নে থাকেন) লক্ষ্য করিয়া এরূপ অভিনয় করিলেন যে তাহারা বাধ্য হইয়া শিশিরবাবুকে ধরিলেন—যাহাতে ব্যাপারটা মিট্‌মাট্‌ হয়। শিশিরবাবু বজ্রকণ্ঠে বলিলেন—"যতক্ষণ তোমরা ব্রাহ্মণের পায় হাত দিয়া নাকে 'খৎ' প্রকাশ্য রাজপথে না দিবে, ততক্ষণ মিটমাট অসম্ভব—তোমাদের এতদূর আস্পর্দ্ধা যে ব্রাহ্মণকে এ ভাবে অপমান করবে! তোমাদের ভাগ্যি ভাল—আমি বাড়ী ছিলাম না—তা হলে—আমি তোমাদের এ স্পর্দ্ধার উচিৎ পুরস্কার দিতাম।" বলা বাহুল্য, শিশিরবাবুর আদেশ মত তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নে বি. টি. রোডের উপর—প্রকাশ্য রাজপথে আমার পায়ে হাত দিয়া ও নাকে খৎ দিয়া তাহারা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল।

নাট্যাচার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার এবং আলাপ করবার সুযোগ আমার খুবই হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় মধুর ভাষী, সদালাপী, বিনয়ী, সরল, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও অহঙ্কারহীন ব্যক্তি খুবই বিরল।

—শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট (খ)

শিশিরকুমারের কয়েকটি রচনা

॥ এক ॥

THE DAYS GONE BY

By

Prof. SISIR KUMAR BHADURI, M.A.

The Institute is now quartered in a stately edifice of its own and has left behind the little shanty where it was sheltered and nursed for more than two decades. Those who sit in the furnished rooms of the New Institute hardly remember the days when members sat on unpolished benches and discussed the day's news under old fashioned and ugly gas lamps. Still less do they remember the times when the Anti-Circular Society, (a very curious name to choose) in all its pride, had been exercising a nasty influence on its role of members. Only a few choice and loyal hearts amongst the junior members remained. In those days it was difficult to find an aspirant for under-secretaryship. The Honorary Secretary had to coax men into accepting these much coveted posts of today.

But in one way they were stirring times. It was a time of hard and successful work. The Institute did not attract the idle pleasure seekers then. But all those who wanted to keep the Institution going, those who thought of all the good work that it had done in an yet earlier stage of its growth and all that was still possible to achieve in future, those who knew of the idle life of a Mofussil student stranded in Calcutta did not give up the Institute. And of all men who had seen the possibility of this Institute, of all

men who had given their undoubted best to the Institute, Benoyendra Nath Sen easily comes to the front.

Some men wonder what good is served by the Institute. They are at a loss to understand why the government should spend as much as three lacs and thirty one thousand rupees for what they suppose to be a place where students go and waste their time in idle talk and play. A weekly journal, which we regularly subscribe, called this Institution a glorified "Adda"—not altogether a compliment. Let such people try to realise the lot of a student from Mofussil left alone in Calcutta who does not live in a modern College Hostel. There are nearly 12 thousand College students in Calcutta and only about a paltry thousand live in College Hostels where there are amenities of social life. The student who finds himself housed in a wretched tenement with little or no opportunity for innocent recreations is at last driven to visiting disreputable theatres and low places of amusement and eventually loses himself in a round of low pleasures which leave their stain on his character as he leaves his college to go out into the larger world. This is a very real danger though often ignored. The colleges themselves, most unwieldy bodies as they are, have little influence on a student's life; and the student outside the four walls of the class room is no part of the care of college authorities. They dose him with lectures and notes which will help to usher him into the Elysium fields of the B. A. degree.

Now this is a state of things which requires remedy. The Institute with its bracing and active influential atmosphere contributes to a larger culture and incidentally it keeps him from harm.

But the Institute was primarily instituted to exert a direct moral influence on the Calcutta student. And with men like Sir Gooroodas Bannerjee, Rev. P. C. Majumdar,

and Babu Benoyendra Nath Sen in the role of its active members this object was certainly to a great extent achieved.

Speaking of Benoyendra Nath Sen it must be said he succeeded in bringing about an atmosphere in the Institute which we painfully confess, has to some extent been vitiated since after his death. The spirit of service and sacrifice—this is what he tried to instil in those who came in contact with him.

He succeeded in making the junior members feel that they were co-workers with him in a common cause. He won their hearts and they obeyed him willingly. During the whole period of his stewardship there was not one petition from junior members to the Executive Committee. It is not that there never was any difference; there was occasion when he differed with junior members, but he knew how to smooth such dlfficulties and breaches were healed up in a manner that no trace remained.

He was apparently a man too good for this world. But in his management of the Institute office and in the control he exercised over junior members, as the Secretary of the Executive Committee and Vice-President of the Representative Committee, he showed an amount of business ability and rare tact which has hardly been equalled.

His impressive personality was the outcome of a life entirely devoted to an ideal. He followed the gleam. It is surprising to think what an open mind he had. He was always ready to listen and pliable to cogent reasons. He had no mistaken sense of prestige and was never ashamed to confess that he was in the wrong.

It is three years since Benoyendra Nath Sen is no more. In three years much has changed and the Institute has grown in more ways than one. The new building which stands as the visible symbol of the energy which he spent

on the Institute work does not come to us as an unmixed boon. The comforts and luxuries possible in the present building, though they add to the attractions of the Institute, may also seem as pitfalls in the way of the Institute's progress.

It is time to see that we do not lose sight of the main thing. Let us not forget that the Institute exists not merely to afford to the sorely wearied student that most needed mental and physical relaxation, but it exists to make an honest effort to make its student members physically, intellectually and morally better men, It exists to help in the building up of a virile, manly and sound character in the student. It exists to teach him the value of unselfish work and unostentatious service.

The spirit of Benoyendra Nath Sen is looking beningly on us. Let us work.*

* First published in Calcutta University Magazine, July, 1916.

॥ দুই ॥

একটি চিঠি

From : Sisir Kumar Bhaduri,
278, Barrackpore Trunk Road,
Calcutta-36

To : Sri B. N. Jha,
Home Secretary, Government of India,
New Delhi.

Sir,

I gather from the newspapers that a decoration of. "PADMA-BHUSAN" has been awarded to me.

It is unfortunate that I was not sounded about it before

this, for though the appreciation for whatever merits I have is no doubt gratifying, I find it impossible to accept it on principle. Had I been consulted, it would have saved much embarrassment.

I am opposed to the granting of honour in any shape or form by the State. For they have the effect of demoralising the people and creating a race of toadies hankering after Government honour.

I recognise that some people of the greatest distinction have been decorated, but there is no guarantee that, for all time only men worthy of the highest honour will be so decorated.

I have a personal reason, besides the one of principle, for not wishing to be conferred the honour. By its acceptance I shall mislead the lovers of the theatre into believing that the Government are aware of the importance of drama in the life of the nation.

I received a congratulatory telegram from the Home Secretary addressed to "Srirangam", my theatre, which has been taken away from me by an order of the Court over three years ago for failure to pay rents. There are men in the Government and in the Akadamy, who are aware of the fact that the theatre has been my life's work, and they know that I have today no stage of my own to act on. They also know that there is no public-owned non-commercial stage, even in Calcutta, devoted to the cause of the advancement of the theatre as an integral part of our life as a nation, and the Government have no plans to build one.

If the Government really wished to honour me and through myself, the cause I have served for nearly forty years, a more befitting tribute would have been the gift of a public stage to the city of Calcutta. For it is too late to retrieve the theatre I have lost.

I cannot accept the honour, and would request you to find out the means to relieve me of the burden of receiving it.

Yours etc.,

Calcutta, *Sd. Sisir Kumar Bhaduri*

Dated 2nd February, 1959.

(অনুবাদ)

শ্রীবি. এন. ঝা,
স্বরাষ্ট্র সচিব, ভারত গভর্ণমেণ্ট,
নয়াদিল্লী।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে দেখলাম আমাকে 'পদ্মভূষণ' খেতাবে অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ সম্পর্কে আমাকে আগে থেকে কিছু জানানো হয় নি। কারণ, যদিও আমার প্রতিভার সামান্য স্বীকৃতিও আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে, তথাপি আমি মনে করি যে, নীতির দিক দিয়ে আমি এ সম্মান গ্রহণ করতে পারি না আগেই আমার পরামর্শ নেওয়া হোলে, এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত।

কোনোরূপেই হোক, রাষ্ট্র কর্তৃক খেতাব দেওয়ার আমি বিপক্ষে। কারণ এর ফলে জনসাধারণের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর হয় এবং এর দ্বারা সরকারী খেতাবের কাঙালী একদল মোসাহেবের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তিকে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাতে কোনো নিশ্চয়তা নেই যে চিরকাল শুধু শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই খেতাব দেওয়া হবে।

নীতির দিক দিয়ে ছাড়াও, এই খেতাব গ্রহণে আমার একটি ব্যক্তিগত আপত্তির কারণ রয়েছে। খেতাব গ্রহণ করলে নাট্যামোদিদের এই ধারণায় বিভ্রান্ত করা হবে যে, জাতির জীবনে নাটকের মূল্য সম্পর্কে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন।

বাড়িভাড়া বাকী পরবার ফলে আদালতের নির্দেশে আমার নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ 'শ্রীরঙ্গম' যে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই রঙ্গমঞ্চের ঠিকানায় স্বরাষ্ট্রসচিব আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এবং আকাদমিতে এমন সব লোক আছেন যাঁরা জানেন যে, রঙ্গমঞ্চই আমার জীবনের বেদী। অভিনয় করতে পারি এমন কোনো নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ আমার আজ নেই, এ কথাও তাঁরা জানেন। তাঁরা এটাও জানেন যে কলকাতায়ও জনগণের মালিকানায় ব্যবসায়ী-স্বার্থবিহীন কোনো রঙ্গালয় নেই, যা কি না জাতির জীবনে একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নাট্যকলার প্রসারকল্পে নিয়োজিত থাকতে পারে। অনুরূপ একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারের কোনো পরিকল্পনাও নেই।

যে আদর্শকে আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অনুসরণ করে আসছি, সরকার যদি আমার মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সত্যই উৎসুক হোতেন, তা'হলে কলকাতা মহানগরীতে একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন করলেই উপযুক্ত কাজ হোত। যে রঙ্গালয় আমি হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করা আমার পক্ষে এখন দুঃসাধ্য।

আমি এই খেতাব গ্রহণ করতে পারি না। আপনাকে তাই অনুরোধ করছি, এমন উপায় করুন যাতে আমি এই খেতাব গ্রহণের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।—ইতি*

২৭৮, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড — স্বাঃ শিশিরকুমার ভাদুড়ী
কলিকাতা-৩৬
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

* অনুবাদ করেছেন : নির্মলকুমার ঘোষ।

॥ তিন ॥

নাট্যচার্যের ত্রিশ বৎসরের কৈফিয়ৎ

বন্দেমাতরম্ !

আজ ১৯৫১, ১০ই ডিসেম্বর। সাধারণ মঞ্চে আমার জীবনের ত্রিশ বছর পূর্ণ হোল। ত্রিশ বছর আগে এমনি দিনে আলমগীর নাটকেই পেশাদার মঞ্চে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এই ত্রিশ বছর ধরে আমি তাই এই নাটকখানির অভিনয় করে আসছি; আজো আলমগীর নাটকাভিনয় দ্বারা আপনাদের আমি আপ্যায়িত করব। তবে তার আগে আপনাদের কাছে আমি মঞ্চে আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলব। এটা আমার বিবৃতি নয়, কৈফিয়ৎ।

আমি জীবনে যা কিছু করেছি, দেশমাতৃকার সেবার জন্যই করেছি। দুর্বৃত্ত-দলিত দেশের বেদনায় আমি মর্মাহত হয়েছি, তাই আমি চেয়েছি নাটকের মাধ্যমে, মঞ্চের মাধ্যমে, দেশের সেবা করতে, দশের মুখে হাসি ফোটাতে। আমি যা চেয়েছিলাম তা পারি নি, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামেরই কিঞ্চিৎ ইতিহাস আমি তুলে ধরতে চাই।

যে পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাঁদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি ছিল। তাই আমি নাট্যপরিবেশের মধ্যেই পরিবর্ধিত হয়েছি। তারপর ছাত্রজীবনে আমি অনুপ্রেরণা পাই স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য মন্মথমোহন বসু ও সেই সময়কার আর দু'একজন শিক্ষাব্রতীর কাছে। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনও আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। স্যার গুরুদাস ছেলেদের দ্বারা নাট্যাভিনয় খুব ভালবাসতেন; তবে স্ত্রী-পুরুষ মিলে একত্র অভিনয় করলে তাঁর নীতিবোধে আটকাতো। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে সে সময় যেসব নাট্যাভিনয় হোত তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হতাম এবং পরে সেখানে আমি অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি।

তারপর ডাক আসে মদন (ম্যাডান) কোম্পানির কাছ থেকে অভিনয়ের জন্য। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে মদন কোম্পানি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার

প্রস্তাব করে। কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি বুঝতে পারলাম যে, সমস্ত থিয়েটার বাড়ি হাত করে থিয়েটারের একচেটে ব্যবসা চালানোই মদন কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য। আমি তখন অপরেশ বাবুকে (অপরেশ মুখোপাধ্যায়) এই বিষয়ে সাবধান করে দিই। মদন কোম্পানি এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নামে। নাটক নির্বাচিত হোল 'অপরাধী কে ?' সে এক অদ্ভুত নাটক, স্থূল রুচির আবর্জনা স্তূপ বললেও চলে—বোম্বাই-মার্কা ডিটেকটিভধর্মী নাটক। আমি তাতে ভূমিকা গ্রহণ করতে অসম্মত হলাম। তারপর মদন কোম্পানির উদ্যোগে যখন আলমগীর অভিনয়ের ব্যবস্থা হোল, তখন রূপনগরের দৃশ্যপট নিয়ে ঘটলো এক হাস্যকর ব্যাপার। রাজপুতনার ছোট এক ভূঞার বাড়ি যেমন সাধারণ হওয়া উচিত, আমি শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে তেমনি আঁকালাম এক দৃশ্যপট। কোম্পানির মালিক রুস্তমজী দেখে বললেন, "এ কি। আমি এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে যে থিয়েটার চালাতে যাচ্ছি তার দৃশ্যপট হবে এ রকম! এ হবে না, হবে না, সোনে লাগাও"। অর্থাৎ সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। আমি তখনই বুঝেছিলাম এঁদের হাতে বাংলা থিয়েটারের ভার থাকলে তার পরিণতি কি হবে।

১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে আমি মদন কোম্পানির থিয়েটার ছেড়ে যোগ দিলাম এক ফিল্ম কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করবার সময় ঘটল এক মোটর দুর্ঘটনা। তাতে আমি আহত হয়ে কিছুদিন ভুগলাম। তারপর ওল্ড ক্লাবের একদল বন্ধুবান্ধব আমাকে ধরলেন ইডেন গার্ডের প্রদর্শনীতে অভিনয় করবার জন্য। আমি সম্মত হলাম। সেখানে অভিনয় করে সাত হাজার টাকা বাঁচলো। এরপর এলাম ম্যালক্রেড থিয়েটারে। তার বাড়ি ভাড়া আটাশ শো টাকা। সেখান থেকে গেলাম মনোমোহন থিয়েটারে। তার বাড়ি ভাড়া চড়তে চড়তে গিয়ে ঠেকলো ৩৬৮৫৲ টাকাতে। এত বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে থিয়েটার চালানো অসম্ভব আমি এটা ভালো ভাবেই উপলব্ধি করলাম। এই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার থিয়েটার নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। দেশবন্ধু প্রায়ই আমার থিয়েটার দেখতে আসতেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, নিজস্ব বাড়িতে থিয়েটার করতে যে পাঁচ-সাত লাখ টাকা

লাগবে তা তিনি যোগাড় করে দেবেন এবং দার্জিলিং থেকে ঘুরে এসেই তিনি সকল ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দার্জিলিং থেকে তিনি আর জীবিত ফিরে এলেন না—এলো তাঁর মৃত নশ্বর দেহ।

এরপর আমি এলাম কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে। এখানে এসে বাড়িঘর মেরামত এবং দৃশ্য সজ্জাদি বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হোল। এত টাকা খরচ হোল যে থিয়েটারে, কিছুদিন বাদে মালিক তা সিনেমা হাউসে পরিণত করলেন। তারপর এলো আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণ। ১৯৩০ সালে সদলবলে আমি আমেরিকা গেলাম। দুখানা জাহাজ শুধু আমাদেরই জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে হোল আমার নতুন অভিজ্ঞতা। গিয়ে দেখি, আমি যাবার দু' মাস আগে থেকেই সেখানে প্রচার করা হয়েছে ভারতের লোক অসভ্য, অশিক্ষিত. সেখানে শিল্প সাহিত্য বলে কিছু নেই, মেয়েদের সে দেশে তালাচাবি বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা হয়—একদল নাচওয়ালি নিয়ে শিশির ভাদুড়ী এখানে নাচতে আসছেন—তিনি রাজপুত মেয়ে বিয়ে করেছেন—নাটক হবে রাজা সাড়শী (ষোড়শী) ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এ ধরণের প্রচারের প্রতিবাদ করলাম। আমন্ত্রণকারীরা ত্রুটি স্বীকার করে বললেন যে তাঁরা এরপর ঠিকভাবে প্রচারকার্য চালাবেন। কিন্তু কোম্পানির প্রচার সচিব কিছুদিন ভারতে ছিলেন, তিনি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বলতে পারতেন। তিনি আমাকে 'তুম্' 'তুম্' বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। তাতে আপত্তি করায় তাঁর সঙ্গে আমার বচসা হয়ে যায় এবং কোম্পানি বেঁকে বসে বলেন যে, তাঁরা আর কোনো দায়িত্ব নেবেন না। চুক্তিভঙ্গের দায়ে মামলা করা যায় কি না আমি ভাবলাম। শ্রীসতু সেন তখন আমেরিকায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম।

সতুবাবু বললেন, "মামলা করলে তিন বছরের আগে শুনানী শেষ হবে না। কোম্পানি বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দেবে, টাকাও অনেক লাগবে; বিদেশে থেকে এসব করা সম্ভব হবে কি?" আমি তখন হাল ছেড়ে দিলাম। এই সময়ে একজন ইহুদী এগিয়ে এলেন আমাকে সাহায্য করতে। তাঁর সহায়তায় আমি আমার নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করতে পারলাম।

আমেরিকার *The Sun* পত্রিকায় আমার সম্প্রদায়ের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল। সে কাগজে বলা হোল, মস্কোর আর্ট থিয়েটার ছাড়া এত ভাল অভিনয় আর কোনো সম্প্রদায় করতে পারে বলে তাদের জানা ছিল না। প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় অভিনয় বেশি দিন চালানো সম্ভব হোল না। কাগজে বিজ্ঞাপনের খরচ সেখানে এত বেশি যে তা এ দেশে থেকে কল্পনাও করা যায় না। আহারাদি বাবদ ব্যয়ও অত্যধিক। এইসব কারণে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই দেশে চলে আসতে বাধ্য হলাম। আসবার সময় আমার সম্প্রদায়ের লোকদের খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে হয়েছিল বলে যেসব অপপ্রচার হয়ে থাকে সেসব মিথ্যা কথা। প্রচুর অর্থ নিয়ে আসা সম্ভব না হলেও পাথেয় হিসাবে যা প্রয়োজন তার অভাব আমাদের ছিল না। ভারতে এসে পৌঁছবার তিন-চার দিন আগে পর্যন্তও আমরা জাহাজে প্রচুর খেয়েছি।

তারপর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমি আমার সম্প্রদায় নিয়ে দিল্লী যাই। সেখানে ব্যাবস্থা পরিষদের সদস্য তখন ছিলেন ধীরেন্দ্রকুমার লাহিড়ী-চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। প্রথমে বড়লাটের পরিষদ আমাকে আমলই দেন নি, তারপর *The Sun* পত্রিকার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা দেখে তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। দিল্লীতে ভাইসরিগাল হাউসের নিজস্ব মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হয় এবং বড়লাট সেই অভিনয় দেখে খুশি হন। তিনি আমাকে ইংলণ্ড যাবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলাম তাতে ইংলণ্ড যাবার উৎসাহ আর আমার হয় নি। পরে মনে হয়েছে বড়লাটের এই আমন্ত্রণের পেছনে একটা অভিসন্ধি ছিল। তখন বিলেতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হচ্ছিল। আমি যদি ইংলাণ্ড গিয়ে কোন কারণে failure হতাম তবে রয়টারের মারফৎ সারা বিশ্বে সেই খবর ছড়িয়ে দিয়ে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করা চলতো। আমি মনে করি, আমাকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ করার আসল উদ্দেশ্য ছিল এই।

বাংলাদেশে ফিরে এসে দেখি যে, যে থিয়েটার আমি রেখে গিয়েছিলাম

সে থিয়েটার ভেঙে গেছে। তারপর আবার নতুন করে আমাকে সব গড়ে নিতে হোল। বাঙালি জাতি মরে নি, মরবে না, মরতে পারে না, যে জাতির culture আছে, সে বাঁচবেই। আমাদের নাটকের ভেতর দিয়ে জাতীয় ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। মুঘল-পাঠানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী উপস্থিত করে বাংলার নাট্যকারগণ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতির মনে যে অসন্তোষ জমে উঠেছিল তাকেই রূপ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না—স্বদেশপ্রেমই তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

থিয়েটার চালাতে গেলে টাকা চাই, নিজস্ব বাড়ী চাই। কেবল ছাত্র-বেতন দিয়ে যেমন বিদ্যালয় ভালোভাবে চলে না, তেমনি টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়েও থিয়েটার ভালোভাবে চলতে পারে না। থিয়েটার সমস্ত চারুশিল্পের মিলনকেন্দ্র—জাতির সাংস্কৃতিক দর্পণ, সুতরাং থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে জাতিরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায়ই গড়ে উঠেছে—কিন্তু এদেশের সরকার থিয়েটার সম্বন্ধে উদাসীন। আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রামে বিশ্বাসী নায়ক নিয়ে লেখা নতুন নাটক। যোগেশের মতন একটুতেই ভেঙে পড়ে, দুর্দিনে জমিদার সরকারে দেড়শত টাকা মাইনে পেয়েও পিতা কন্যার মৃত্যু কামনা করে, এমন সংগ্রামবিমুখ নৈরাশ্যবাদী নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকেই এ যুগে নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করতে হবে।

যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠতো তবে আজ তার রূপ হোত অন্য রকম; তা সত্যি হয়ত আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে। যাই হোক, যা গড়ে উঠেছে তাকে ফেরাবার উপায় হয়তো নেই। আমি চেয়েছিলাম জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে, কিন্তু তা পারি নি। আমার পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, এ যুগের লোক তা সম্ভব করে তুলুক, এই আমার একান্ত অভিলাষ।*

---

*এই ভাষণটির নোট নিয়েছিলেন নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়; এটি তাঁরই সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং তাঁর 'নাট্যলোক' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

॥ চার

ললিতমোহন লাহিড়ী

ললিতমোহনের মৃত্যুতে আমার যে ব্যথা তা প্রকাশ করবার স্থান খবরের কাগজে নয়; তবে একটি বিশেষ কারণে তাঁর সম্বন্ধে দু-একটা কথা সাধারণে বলা আমার কর্তব্য মনে করি। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে এখনও যথার্থ অভিনয় সমালোচন করতে শেখেনি; নটের দোষগুণ বিচার করবার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুব অল্প লোকেরই আছে। ফলে সাধারণতঃ নটের প্রশংসা বা নিন্দা অধিক সময় নির্ভর করে, যে শ্রেণীর চরিত্র তিনি অভিনয় করেন তার উপর। ললিতবাবু যে একজন খুব উঁচুদরের অভিনেতা ছিলেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য নট হিসাবে যতখানি যশ তাঁর প্রাপ্য নাট্যমন্দিরে ললিতবাবুর তার কিছুই লাভ হয় নি; আমারই অনুরোধে এবং বিশেষ আগ্রহে ও আমার হিতাকাঙ্ক্ষায় তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কতকটা আমারই অত্যাচারে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেন—এ কথা চিরকালই আমার অন্তরকে পীড়া দেবে। তিনি সর্বপ্রথম বশিষ্ঠের ভূমিকায় ('সীতা' নাটকে) সাধারণ দর্শকের নিকট পরিচিত হন। এই চরিত্রের বিশিষ্টতা এই ছিল যে, নাট্যকার বশিষ্ঠকে সাধারণ দর্শকের সহানুভূতি থেকে একেবারে বঞ্চিত করে এঁকেছেন। বশিষ্ঠের চরিত্রে অভিনেতা যতখানি বেশি বশিষ্ঠ হোতে পেরেছিলেন ততখানি বেশি তিনি দর্শকের কৃপা থেকে সরে গিয়েছিলেন। অভিনয়ে self-effacement যে কতখানি করা যেতে পারে তা ললিতবাবু এই অংশের অভিনয়ে তা দেখিয়েছিলেন। তাঁর কোমল অন্তরের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় ছিল তিনিই ললিতবাবুর অভিনয়ে একটু চেষ্টা করে দেখলেই এটা উপলব্ধি করতে পারতেন। আর একটা জিনিস ললিতবাবুর ছিল—তিনি অনেকখানি dignity তাঁর অভিনীত অংশের মধ্যে বিস্তার করে দিতে পারতেন। চলায়-ফেরায়, কথায়-বার্তায় তাঁর বশিষ্ঠ সূর্যবংশের গুরুর এতটুকু মর্যাদা কখনও লঙ্ঘন করে নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই unsympathetic অংশটুকু অভিনয় করবার জন্যই তিনি অনেক

দর্শকের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়েন। যে বিরাগ প্রাপ্য অভিনীত অংশের, সেই বিরাগ গিয়ে পড়লো দুর্ভাগ্য অভিনেতার স্কন্ধে। আমাদের দেশে অভিনয় সমালোচকদের মধ্যেও এমন কাউকে দেখলাম না যিনি এই সামান্য সত্যটুকু আবিষ্কার করতে পারলেন। এত শীঘ্র ললিতবাবুর মৃত্যু না ঘটলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল চরিত্রের সহায়তায় বাংলার দর্শককে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করতো। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ছাড়া সখের থিয়েটারে ললিতবাবুর সঙ্গে আমি কিছুদিন অভিনয় করেছি এবং তাঁর মধ্যে অনেক জায়গায় এমন বড় কিছু দেখেছি যাতে আমার নিজের ললিতবাবুকে খুব বড় নট বলেই চিরকাল ধারণা থাকবে।*

* নাচঘর ১৩৩২

॥ পাঁচ ॥

রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের যাত্রা ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস। দেশের লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে নাড়া দিয়েছিল যাত্রার গীতাভিনয়। ঠিক যেভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার, ঠিক সেইভাবে দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে কি না সেটা ভেবে দেখবার জিনিস। ভালই হোক, মন্দই হোক আমাদের দেশে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছে এবং দেশের সংস্কৃতি, দেশের জীবনধারা তার ভেতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। দেশের যাঁরা মনস্বী, যাঁরা কর্মী—তাঁরা এবং দেশের আপামর সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে অস্বীকার করতে পারে না, অবহেলাও করতে পারে না। সমগ্র বাংলা দেশ এবং বাংলার বাইরে যেখানে বাঙালী আছে, আজ সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ে ভরে গেছে। আমাদের রসবোধ ও রসানুভূতি রসাভিনয়কে বাহন করে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত এবং উদ্গ্রীব। এরূপ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চকে অনাদর করলে বা তাকে অপাঙক্তেয়

করে রাখলে জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট ক্ষতি হবে, এই কথাটা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলে যাই।

পূর্বকালে অর্থাৎ যাত্রার যুগে যখন মঞ্চ ছিল না, তখন হোত গীতাভিনয়, সাধারণ লোকে বলত 'পালা'। বড় বড় নামজাদা কবিরা গান বাঁধতেন আর সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা বা শক্তিশালী অধিকারীরা (বর্তমান যুগের প্রয়োগকর্তা বা producer) পালা লিখতেন। কিন্তু যখন আসর ঘুচিয়ে ইংরেজি এলিজাবেথীয় যুগের পদ্ধতির অনুকরণে বাংলা দেশে ইংরেজি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হোল, তখন প্রয়োজন হোল পঞ্চাঙ্ক নাটকের। এই আসরকে মঞ্চে গড়ে তুলতে, গীতাভিনয়কে নাটকে পরিণত করতে, এক কথায় বাংলার ব্যবসাদারী থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করতে যে কয়জন শক্তিশালী পুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল। বাগবাজারের নবীন বসু বা বেলগাছিয়ার রাজাদের সৌখীন প্রচেষ্টা থেকে যখন সাধারণ রঙ্গালয় জন্মগ্রহণ করলো, তার নাম হলো 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারা নাট্যকার হিসেবে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন দীনবন্ধু ও মাইকেলের কাছে। নাট্যবস্তও আহরণ করবার জন্য বঙ্কিমের উপন্যাসকেও বাদ দেওয়া হয় নি। নাটক নইলে রঙ্গমঞ্চ চলে না, অথচ নাট্যকারের বিশেষ অভাব। এই অভাববোধ থেকেই জন্ম হোল গিরিশচন্দ্রের বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার। পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁদের নিয়ে পেশাদারী থিয়েটার জমে উঠলো। স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা সাহিত্যে নাট্যবিভাগে অনেকখানি স্থান এঁরা অধিকার করে আছেন।

বাংলা দেশে শক্তিশালী নটের কখনো অভাব হয় নি, কিন্তু প্রতিভাবান সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকারের অভাব হয়েছে। যাঁরা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে, সোফোক্লিস, শেক্সপিয়র থেকে শুরু করে আজকালকার দিনে নোয়েল কাওয়ার্ড পর্যন্ত সমস্ত নাট্যকারেরই রঙ্গমঞ্চের ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভেতর দিককার জ্ঞান আছে। এরা অনেকেই নট, কেউ বা প্রয়োগকর্তা অথবা মঞ্চব্যবসায়ী। বাংলাদেশে একমাত্র

গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ছাড়া রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই, সেইজন্য তাঁদের নাটক অভিনয় করতে গেলে কাটতে ছাঁটতে হয় এবং অভিনয়ের রসসৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা ঘটে যায়।

এতখানি ভূমিকা করছি এই কথা বোঝাবার জন্য যে, বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে, যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে, এমন কি শেক্সপিয়রের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ারহোল ও রাইনাহার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে। যে অপূর্ব প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত আপনার আলোকে উজ্জ্বল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলাসাহিত্যের হয়ে সমান আসন দাবী করা সম্ভব করে তুললেন, সেই নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তাঁর শক্তির এবং প্রাচুর্যের অতি অল্প অংশই ব্যয় করলেন। যেভাবে শেক্সপিয়র, ইবসেন বা হাউটম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সফল করে তুলবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও

নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠতো, তা'হলে আজকে বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্নপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।

লোকশিক্ষার জন্য যত রকম আয়োজন সকল জাতির মধ্যে আছে, তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, রোমক সভ্যতা, জগতের সকল সভ্যতার যুগে, এমন কি বর্তমানের কম্যুনিষ্ট রাশিয়াতে পর্যন্ত অবিসম্বাদীভাবে স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের বলে দিতে হবে না যে, ফাইন আর্টের আরম্ভ স্থাপত্য, দেবায়তন, চার্চ ও মসজিদ নির্মাণ কৌশল থেকে এবং এর পূর্ণ পরিণতি নাটকে। নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিকরা বলেন, নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি যিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে। "No playwright has come halves with the actor more than Shakespeare"—এই যে শেক্সপিরীয়ান অন্তর্দৃষ্টি, নাটক লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। তাঁর 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' এইসব যাঁরা অভিনয় করেছেন বা অভিনয় দেখেছেন, এ বিষয়ে তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সম্বন্ধ সেটা সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হতে পারতো।

কিন্তু হায়, এত কিছু হবার পূর্বেই—

> রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
> রিক্ত হলো সভাতল, আঁধারের মসী অবলেপে
> স্বপ্নচ্ছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হলো
> চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে।*

---

* শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮। প্রবন্ধটি নাট্যাচার্য আমার তাগিদেই লিখেছিলেন।

॥ ছয় ॥

বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র

বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও সার্থক প্রয়াসের একটা বিস্তারিত বিবরণ আজও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। যতদিন আমাদের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় নাট্যশালার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে না পারবেন ততদিন এ সম্বন্ধে কোনও সজ্ঞান ও সশ্রদ্ধ চেষ্টাও হবে না। আমাদের নাট্যশালার আদিযুগে শক্তিশালী লোকের অভাব ছিল না। অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যকার হিসাবে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অগ্রণী। তাঁর প্রথম নাটক "হীরকচূর্ণ" গিরীশবাবুর নাটক লিখবার প্রায় দুটি বৎসর আগে লেখা। অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য হয়েছিলেন। এক বিনোদিনী ও তিনকড়ি ছাড়া গিরিশচন্দ্রের নামজাদা শিষ্য বা শিষ্যা কেউ ছিল না। অর্দ্ধেন্দুর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন এমন নট ও নটী বাংলার রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য। স্বয়ং অমৃতলাল বসু অর্দ্ধেন্দুকে তাঁর নাট্যগুরু বলে স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশে স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ভুবনমোহন নিয়োগী, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত করতে এঁদের গিরিশ ঘোষকে ডাকতে হয়েছিলো। যে সকল গুণ থাকলে একটা নাট্য-প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে দাঁড় করান যায় সে সকল গুণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজে খুব বড় অভিনেতা না হোলে, অভিনয় সম্বন্ধে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে (theoretical knowledge), কেহই একটা অভিনেতৃমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র অভিনয় কলার theory ও practice দুই বিষয়েই তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষতম। অনেকের ধারণা উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। লেখাপড়া ও পঠিত বিদ্যা নটের বিশেষ প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের বিদ্যার

পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে বহুবিস্তৃত ইংরাজি সাহিত্য তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় সামান্য ছিল না। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্যসমালোচনার প্রায় সকল বিভাগেই তিনি লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসও তাঁর অজানা ছিল না। বহু প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তাঁর অধিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করে। তবে জ্ঞানমার্গের থেকে ভক্তিমার্গে তাঁর ছিল আন্তরিক প্রবণতা। সব চেয়ে বড় কথা এই যে কলাবিদেরা সচরাচর যে রকম বেহিসেবী হ'ন তিনি তা মোটেই ছিলেন না। তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করার আগে ছিলেন বুককিপার বা হিসাব পরীক্ষক। এই কাজে তাঁর দক্ষতার সুনাম ছিল, এবং এতে তাঁর যা উপার্জন ছিল সেটা তাঁর কালের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে ধরে নিতে পারা যায়। যখন অবৈতনিক হিসাবে কিছুদিন মঞ্চের সেবা করে তিনি বুঝলেন দেশে থিয়েটার ব্যবসা হিসাবে স্থায়ী হবার কোন প্রতিবন্ধক নেই তখনই তিনি তাঁর সমস্ত প্রাণমন নাট্যশালা গড়ে তুলবার দিকে নিযুক্ত করলেন। তাঁর জীবিতকালে কোন নটেরই এই ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল না, এবং এই ব্যবসায় বুদ্ধির বলেই তিনি বাংলার থিয়েটারকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যা অর্দ্ধেন্দু বা অমৃতলাল পারেন নি।

গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার প্রথম ইতিহাস একটু গোলমেলে। দল বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে দলাদলি শুরু হয়। এক সময়ে গিরিশবাবু তাঁর ভূতপূর্ব বন্ধুদের ব্যঙ্গ করে খবরের কাগজে বেনামী চিঠিও লেখেন। "লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার" বলে ছড়াও কাটেন। বস্তুতঃ এ সময় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস একটা দলাদলি ঝগড়ার ইতিহাস। টাকাপয়সা সাজসরঞ্জামের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হল। দলটি দুভাগে বিভক্ত হল। এই দুদলের একদলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। অন্য দলে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বেলবাবু প্রভৃতি। Stage manager হিসাবে ধর্ম্মদাসবাবুর হেফাজতে Stage ও Scene, Scenery ছিল। তিনি যখন তাই নিয়ে গিরিশবাবুর আশ্রয় নিলেন, ব্যবসা-

বুদ্ধিসম্পন্ন গিরিশবাবু National Theatre নিজেদের নামে রেজেষ্ট্রী করে নিলেন। পূর্বে গিরিশচন্দ্র National Theatreএর প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। National Theatreএর অভিনয়নৈপুণ্য ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি অথচ এই থিয়েটার যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন সেই গিরিশচন্দ্র কৌশলে উহা অধিকৃত করিলেন। এটা তাঁর দল ছাড়া আর সকলের কাছেই অশোভন ঠেকিল। অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের দলে ছিলেন না। তাঁরা এই রেজেষ্ট্রী ব্যাপারটা একেবারেই ভাল চোখে দেখেন নি। আজও পর্যন্ত অনেকে মনে করেন এটা গিরিশ-চন্দ্রেরই অগৌরবের কথা। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। গিরিশের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী কর্মীপুরুষ সহজেই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে এই নবজাত সম্প্রদায় যদি এক কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত না হয় এর অকালমৃত্যু অবধারিত। নাট্যশালা গঠনের শক্তি যে একমাত্র তাঁরই ছিল এ সম্বন্ধেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। এইজন্যই আইনসঙ্গত উপায়ে নিজের নেতৃত্ব তিনি পাকা করে নিলেন। অভিনয়ের সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমেত একটি নাট্যসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা না হতে পারলে তিনি কোনরকমেই বাংলা থিয়েটারকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে পারতেন না। অমৃতলাল বা অর্দ্ধেন্দু জীবনের শেষ পর্যন্ত কখনও কোন নাট্যসম্প্রদায়ে সফল নেতৃত্ব করতে পারেন নি। বৃদ্ধ বয়সে অমৃতলালকে ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনার ভার বাধ্য হয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, এটা প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস। আরো স্মরণ রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র কেবল নেতৃত্বই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার দীর্ঘ ৩৮ বৎসরের নটজীবনে কখন নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকারী করবার প্রয়াস পান নি। নিজের শিষ্যদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে লাভবান করেন নি। অমৃতলাল ষ্টার থিয়েটারের চার আনা স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় নেতা বা গুরু হিসাবে তাঁকে বরণ করেনি। এর পর থেকেই National Theatre অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগলো। গিরিশচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থিয়েটার চালাতে পারে প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন লোক পাওয়া যায় নি। অদ্ভুতকর্মা অমরেন্দ্রনাথ দত্তই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গৌরব

অর্জন করেন। কিন্তু থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথ বেশীদিন চালাতে পারেন নি।

যখম প্রথম থিয়েটারে যোগ দেন তখন নাট্যকার হবার কল্পনা গিরিশ-চন্দ্রের ছিল না। কিন্তু যখন দীনবন্ধু, মাইকেলের নাটক ফুরিয়ে গেল, বঙ্কিম, তারক গাঙ্গুলী প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপ আর চলে না, তখন বাধ্য হয়ে ১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক লেখার ভার লন এবং উপর্য্যুপরি রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের গৌরব বর্দ্ধন করে।

১৮৮৩ সালে National Theatre, বিডন ষ্ট্রীটে বাড়ি করে ষ্টার থিয়েটার নাম নিয়ে যখন ব্যবসা শুরু করলেন তখন গিরিশচন্দ্রের "দক্ষযজ্ঞ" নিয়েই ষ্টার থিয়েটার শুরু হয়। এতদূর পর্যন্ত নাট্যশালার যাঁরা ইতিহাস অনুসরণ করে এসেছেন তাঁদের কাছে গিরিশচন্দ্র যে বাংলা থিয়েটারের আদি নায়ক ও প্রধান পুরুষ তা বুঝিয়ে বলবার আর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান প্রবন্ধে এই কথাই আমার প্রতিপাদ্য। উপসংহারে গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারকে কতখানি ভালবাসতেন, কতখানি তার কল্যাণ কামনা করতেন সেই সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করবো।

১৮৮৭ সালে ধনকুবের গোপাললাল শীলের হঠাৎ থিয়েটারের দল বাঁধবার সখ হয়। তিনি গিরিশবাবুকে বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক ৪০০ কি ৫০০ টাকা বেতন দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চান তাঁর নির্মিয়মান এমারেল্ড থিয়েটারে গিরিশবাবু অস্বীকৃত হলে তিনি ভয় দেখান যে গুণ্ডা ও আগুনের সাহায্যে ষ্টার থিয়েটারকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। গোপাললাল শীলের পক্ষে এ কার্য মোটেই অসম্ভব ছিল না। সমসাময়িকরা তাঁর এই ধরণের নানা কীর্তির কথা অবগত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধু ও শিষ্যদের বললেন, "লোকটা অপরিমিত ধনী, গোঁয়ার ও খেয়ালী, থিয়েটারের খেয়াল তার এক বৎসরের বেশী টিকবে না, তাকে চটিয়ে থিয়েটারের ক্ষতি করার চাইতে তার মতে মত দেওয়াই ভাল।" বৎসরান্তে গোপালবাবুর থিয়েটারের নেশা কেটে গেলে তিনি আবার ফিরে আসবেন, এই বলে তিনি বোনাসের বিশ হাজার টাকা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে তাঁর স্নেহের দান হিসাবে বন্ধুদের হাতে তুলে দিলেন। গিরিশ-

চন্দ্রের ভাই অতুলবাবু এতগুলো টাকা সমস্তটা এইভাবে দিয়ে দেওয়ায় ক্ষুণ্ণ হন। তখন ষ্টার থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারীরা মাত্র চার হাজার টাকা অতুলবাবুকে প্রত্যার্পণ করেন।

আর একটি ঘটনা। এটি আমরা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখা "রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ" নামক পুস্তকে পাই।

১৯০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে হাজার টাকার এক কোবালার বলে অমরেন্দ্রনাথকে গৃহচ্যুত করতে চান। অমরেন্দ্রনাথ টাকাটা চুকিয়ে দিতে স্বীকৃত হন। মনোমোহনবাবুও আপোষে সম্মত হন। অবশ্য আইনতঃ তিনি তখনই বাড়ী দখল করতে পারতেন। এই সময় অমরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অভাবের অবস্থা। রবি, বুধ বৃহস্পতি প্রতিদিনের sale আবার পাওনাদারকে assign করা ছিল। অমরেন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই সময়ে তাঁকে বাঁচালেন গিরিশচন্দ্র। তিনি অমরেন্দ্রনাথের বিপদের কথা শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ২৫০০৲ টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত করলেন। অমরেন্দ্রনাথ সে যাত্রা পরিত্রাণ পেলেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—"রঙ্গভূমি ভালবাসি,
হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

রঙ্গমঞ্চের উপর ভালবাসা ও রঙ্গভূমি ছিল গিরিশচন্দ্রের নেশা ও পেশা।*

* গল্পভারতী, ভাদ্র, ১৩৬৫

॥ সাত ॥

নাট্যশালা প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে বহু শতাব্দী থেকে নাট্য ছিল কিন্তু নাট্যশালা ছিল না। ইংরাজের দেখাদেখি এই যে ফ্রেমে-আঁটা রঙ্গমঞ্চ, এর বয়স শতাব্দী পার

হতে এখনও দেরী আছে। অথচ চৈতন্যদেবের জন্মেরও পূর্ব হতে প্রতি বৎসর বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালারা তাদের দল, নট, গাইয়ে, বাজিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধনীদের অঙ্গনে, মেলায় ও বারোয়ারীর মণ্ডপে কৃষ্ণলীলা ও দেবীমাহাত্ম্যের পালা গেয়ে বেড়াত। তাদের সকল পালায় বলা হত পুরাণের কথা, গাওয়া হত ভক্তিরসের গান। সকল পালারই মর্মের সুর ছিল আত্মনিবেদন। ভক্তের জন্য ভগবান অসাধ্য সাধন করেন, ভক্তের পরীক্ষাও সময় সময় কম দুষ্কর হতো না। ট্র্যাজেডির স্থান যাত্রার পালায় ছিল না। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় গল্পের পরিণামে সুস্পষ্টভাবে দেখান হতো। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ এই সবের কাহিনী থেকেই নেওয়া হতো পালার গল্পাংশ। যাত্রার অভিনয়ের ধরণ ছিল বাঁধা। একটা সুর দিয়ে খুব আবেগের সঙ্গে কথা বলা ছিল নিয়ম। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সাধক বা ভক্ত ও সাধারণ লোক সকলেরি কথা শুনলে বোঝা যেত তিনি কে? অভিনয়ের দিকে খুব জোর লক্ষ্য কারো থাকতো না। গানই ছিল যাত্রার প্রাণ। গানের সুর বিচিত্র ও ভাবের আবেদনের উপর পালার ভাল-মন্দ বিচার হতো। এই ছিল নাট্য।

নাটুকে দলগুলি নিয়ন্ত্রিত হতো একজন অধিকারীর দ্বারা। এই অধিকারীই ছিলেন একাধারে মালিক ও নাট্যাচার্য। তাঁর ছিল বিশেষ খাতির। সমাজে তাঁর স্থান ছিল উচ্চ। সময়ে সময়ে তাঁদের অনেকে ভূমিসম্পত্তি অর্জন করে ছোটখাট জমিদারও হয়ে বসতেন; কিন্তু সাধারণ নট, যাঁদের নিয়ে দল, তাঁদের বিশেষ সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল না। তাঁরা ছিলেন জনপ্রিয় কিন্তু সমাজে কলকে পেতেন না। মাঝে মাঝে মেয়ে-যাত্রা (মেয়েদের নিয়ে যাত্রার দল—যেমন বৌ-মাষ্টারের দল) দেখা যেত। যাত্রার দলে স্ত্রী অভিনেত্রী মোটেই থাকতো না। কিশোর বালকদের দিয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি অভিনয় করানো হতো। এই সকল যাত্রার দলের লোক ও যাত্রার দলের ছেলেদের সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অশ্রদ্ধাই ছিল। এই সাধারণের অশ্রদ্ধার মধ্যে আমাদের থিয়েটারেরও জন্ম। সে কথা পরে হবে।

যাত্রা অনেক দিন ধরে লোকের প্রীতি আকর্ষণ করে এসেছে। আজও দেশের অধিকাংশ লোক যাত্রাকেই চেনে। থিয়েটার তাদের কাছে ব্যয়সাধ্য বিলাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাত্রার রূপ পরিবর্তিত হয়নি। সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দির প্রাঙ্গনে এবং নাট্যের বিষয় মানবজীবনে দৈবের প্রভাব। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে প্রতিভাত। আমাদের দেশে আদিম কাল থেকে নাটকের ও নাট্যলীলার উদ্দেশ্য ধর্মের মহিমা কীর্তন, পুরাণের উপাখ্যানের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও ব্যাথ্যা আমাদের নাট্যের বিষয়ীভূত হয়নি। আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ-কথাকেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মানসগোচর করা হতো। ইংরাজিতে যাকে বলে 'Secular drama, আনাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা ছিল না। অবশ্য 'বিদ্যাসুন্দর'কে 'Secular drama' ধরা হলে এ কথার ব্যতিক্রম ঘটে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশে যে সারা পড়ে সেই সময়ে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নট মুকুন্দ দাস যাত্রাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগান। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ভ। যাত্রার দুর্ভাগ্য বাংলা থিয়েটার আজকালের যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে। এইজন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি'। তবুও যাত্রাই বাংলার খাটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলে যদি কিছু থাকে সেটি হচ্ছে যাত্রা।

ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলনের ফলে আমাদের জীবনে অনেকগুলি বিলাতী 'রকম' প্রবেশ করেছে। একটা বড় 'রকম' হচ্ছে অবসর সময় কাটাবার জন্য ক্লাব। আমাদের দেশে ক্লাব ছিল গ্রামের হরিসভা, কীর্তনের আখড়া ও অব্যবসায়ী যাত্রার দল। এ সকলে চাঁদার বালাই ছিল না, গ্রামের বা পাড়ার সম্পন্ন লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ তাদের চণ্ডিমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় স্থান দিতেন। পান-তামাকের বন্দোবস্ত গৃহস্বামীই করতেন। অথচ দলের প্রত্যেক আড্ডাধারী জোরের সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন। 'ক্লাব' শব্দের কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে আমাদের দেশে

এই সকল আড্ডাই ক্রমে ক্লাবে রূপায়িত হয়। এই আড্ডাগুলিই বাঁচিয়ে রেখেছিল—সেকালের যাত্রা ও আজও বাঁচিয়ে রেখেছে আজকালের থিয়েটার। আড্ডা পরিণত হয়েছে—এমেচার ক্লাবে। এমেচার ক্লাবেরা তাদের আদর্শ নিয়েছেন—চলতি থিয়েটার থেকে। অভিনেতারা অনুকরণ করছেন জনপ্রিয় থিয়েটারের অভিনেতাদের কথা বলার ভঙ্গী, প্রবেশ ও প্রস্থানের ঢং, এমন কি mannerism; এঁরা মুখে যাই বলুন, যতই manuscripts নাটক মঞ্চস্থ করুন, ব্যবসাদারী থিয়েটার থেকেই এঁদের প্রেরণা। এঁদেরই কল্যাণে থিয়েটারের প্রচার বাড়ছে, থিয়েটার লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এঁরা অভিনয় খারাপ হলে বলেন যাত্রা হচ্ছে। যাত্রাকে এঁরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন কিন্তু যাত্রাকে এঁরা নষ্ট করতে পারেন নি। যাত্রা বেঁচে রইল; এখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে।

যাত্রা ও থিয়েটারে প্রধান পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য থিয়েটার হয় মঞ্চের উপর, যাত্রা হয় আসরে। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনে করেন তাঁরা যে চরিত্রের রূপ নিয়েছেন ঘটনার স্রোতের মধ্যে দিয়ে সেই চরিত্রের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেন, যতক্ষণ তাঁরা রঙ্গমঞ্চে আছেন দর্শকের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। লোকে দেখছে, দর্শক সামনে রয়েছে, উদ্দেশ্য দর্শকের চিত্তে আলোড়ন তোলা, সবই সত্য কিন্তু অভিনয়ের সময় তাঁদের কাছে দর্শক নেই এটাই মনকে চোখ ঠেরে বোঝাতে হয়। এটাকে সম্ভব করার জন্যই তাঁদের দর্শক থেকে আলাদা পিছনে পট সাজিয়ে আলোকোদ্ভাসিত মঞ্চের উপর স্থান দেওয়া হয়। যাত্রায় কিন্তু সে বালাই নেই। আমি রাজা সেজেছি, আমি যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণ আমি রাজা, রাজার পোষাক কিন্তু আমাকে দর্শকের সম্মুখেই তামাক খেতে বাধা দেয় না, অবশ্য সে সময় আমার বলবার কিছু নেই। এই যে দর্শকের সঙ্গে সোজা বোঝাবুঝি, 'Taking the audience into confidence', এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয় তার কারণ আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছে ঘেঁসে তাঁদের স্থান, দর্শকদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন। যাত্রার এই রূপটা তখনকার (উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগের) সাধারণের কাছে ভাল লাগল না। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচি বদলাতে আরম্ভ হল। কৃষ্ণ,

রাধা, নারদ মুনি, জটিলা, কুটিলা, আয়ান ঘোষ, রাম, সীতা এক ঘেয়ে হয়ে আসতে লাগলো। সকলেরই মনে হতে লাগল যাত্রা সেকেলে। ওটা আর চলবে না···'হেতা হতে যাও পুরাতন'। যাত্রাকে যুগের উপযোগী করে নেবার কথা তাঁদের মনে হল না। ওদিকে ধনী ও শিক্ষিতেরা যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় যাত্রার অধঃপতন হল ; কিন্তু মৃত্যু হল না। সমাজের নিম্নস্তরের প্রিয় হয়ে বেঁচে রইল। যাত্রা প্রথম থেকেই ছিল ইংরাজিতে যাকে বলে Folk art—Folk drama—এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে ইউরোপের মধ্যযুগের Commedia della arte-এর সঙ্গে। Commedia-র অভিনেতারা ছিল আমাদের যাত্রাওয়ালাদের মত অর্ধ-শিক্ষিত। নাট্যের বিষয় ছিল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন। হাস্যরস ও sentiment ছিল এর প্রাণ। এইখানে আমাদের যাত্রার সঙ্গে এদের পার্থক্য। যাত্রায় হাস্যরসের অভাব।

গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়।
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন॥

যাত্রার লোকপ্রিয়তা ছিল, প্রশংসনীয় পালার নাম হতো, কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি হতো না। সুধী সমাজে যাত্রার দলের লোক তা সে যত বড় শিল্পী হোক না কেন সমাদর পেতো না। রাজপুরুষ, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, স্থপতি প্রভৃতির সম্মান যাত্রার কোন শিল্পী কোনদিন পেল না। তার উপরে যাত্রার ভিতরে ঢুকলো সং, ঢুকলো অশ্লীলতা। সামাজিক অনাদর ও অশ্রদ্ধার মধ্যে তারা দিন কাটাতে লাগলো।

তারপর এলো থিয়েটার। ১৮৭২ সাল থেকে থিয়েটারে আরম্ভ হলো। থিয়েটারে আমরা আসর তুলে দিলাম। নটদের তুলে নিলাম মঞ্চের উপরে। সচরাচর অক্ষম চিত্রকরের আঁকা দৃশ্যপটের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে পাত্র-পাত্রী অভিনয় শুরু করে দিলেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই দেখি ধনশালী ও কৃতবিদ্য লোকেরা দেশে বিলাতি ধরণের থিয়েটার না থাকাটা খুবই লজ্জার বিষয় এই মনে করে অর্থ ব্যয় করে দল জুটিয়ে দেশের এই অগৌরব মোচন করতে লেগে গেলেন। কিন্তু বিত্তশালী লোকেরা যখন

নাট্যামোদে আকৃষ্ট হলেন তখন তাঁরা একটি পেশাদারী থিয়েটার গড়ে তুলবেন এ কল্পনা একবারের জন্মও করেন নি ; বহু অর্থ ব্যয় করে উপযুক্ত লোককে দিয়ে নাটক লিখিয়ে যথোপযুক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর অভিনয় ও নৃত্যগীতের একটা বিলাতী আদর্শ খাড়া করাই তাঁদের ইচ্ছা ছিল মনে হয়। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন জাতির মধ্যে স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের পথ সহজ করতে, দেশে সুনাট্যের প্রসার বাড়াতে। এই সময় দেশে যুবকদের মধ্যে নাটকের দলও নগরে, গ্রামে সর্বত্র গড়ে উঠেছিল। এই সকল দল একটা খুব বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিল এই ধনীদের নানাবিধ নাট্য আয়োজন থেকে। বড়লোকদের দিয়ে যত নাটকীয় অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পাইকপাড়ার বাবুদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালা বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে সহজেই অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকবে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র নিজেদের বেলগাছিয়ার বাগানে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এদের সঙ্গে দেশের তৎকালীন নাম করবার মত প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রভূত অর্থব্যয়ে দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' ও মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। সাহেব অতিথিদের নাটক বুঝাবার জন্য রাজারা 'রত্নাবলী'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ করেন মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাবু গৌরদাস বসাক এই অভিনয় ব্যাপারে একজন মাতব্বর ছিলেন। তিনিই রাজাদের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় সাধন করেন। এর ফলে মাইকেল কবি প্রসিদ্ধি লাভ করবার পূর্বেই হলেন নাট্যকার। সংস্কৃত হতে অনুদিত নাটক অভিনয় মাইকেলকে অপ্রসন্ন করল। তিনি দাবী করলেন খাঁটি বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রবর্তনা। কিন্তু নাটক লেখে কে ? মাইকেল বললেন, 'আমি লিখবো'। ফল বেলগাছিয়ার দ্বিতীয় অভিনয় 'শর্মিষ্ঠা'। শর্মিষ্ঠার অভিনয়ে সহরে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। চারদিকে সখের দল থিয়েটার করতে মেতে উঠল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় 'দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতে লাগিল'। ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শর্মিষ্ঠার প্রথম অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় কবে হয় জানা নেই।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন নাটক অভিনয় হয়নি। রাজাদের উপর আস্থা স্থাপন করে মধুসূদন তাঁর অপূর্ব ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লিখলেন কিন্তু অভিনয় হল না। মাইকেলও নাটক লিখবার কলম গুটিয়ে নিলেন।

১৮৬১ সালে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু বেলগাছিয়ার নাট্যশালা যে অভিনয় ও নাট্য-প্রয়োগের আদর্শ স্থাপন করল তার স্মৃতি অমর হয়ে রইল। পাইকপাড়ার দুই রাজভ্রাতার কাছে বাংলার নাট্যশালা অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। মধুসূদনের এই কথা সত্য—"যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয় তবে ভবিষ্যত যুগের লোকেরা এই দুই উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না, ইহারাই আমাদের উদীয়মান জাতির নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা"। (ব্রজেন্দ্রবাবুর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)। বেলগাছিয়া নাট্যশালার ন্যায় সহরে নানা স্থানে উচ্চশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে থিয়েটার স্থাপনার চেষ্টা হয়; কিন্তু কোথাও নাট্যশালা দানা বাঁধলো না। ১৮৭২ সালে বাগবাজারের কয়েকটি মধ্যবিত্ত যুবক নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে শেষে সত্য সত্যই বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করলেন। সেই নাট্যশালা আজও পর্যন্ত বর্তমান। গিরিশচন্দ্র ঘোষকেই আমরা নাট্যশালার জনক বলি। এই যে নাটশালা স্থাপিত হয়েছে তা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। দেশে ভাবের বন্যা এনেছে নিঃসন্দেহে। বহুকালব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাটশালার দান কম নয়। কিন্তু এই নাট্যশালা আজও সমাজের অঙ্গ বলে স্বীকৃত নয়। দেশের গণ্যমান্য লোকেরা বিনা নিমন্ত্রণে থিয়েটার দেখেন না। থিয়েটারের নট একটা সম্মানের পদবী নয়। এখনও আমাদের দেশে নট ও নাট্যের আদর হয়নি। যাত্রার বেলায় যেমন, থিয়েটারের বেলায়ও তেমনি সত্বাধিকারীর সম্মান আছে পয়সার সম্মানে—কিন্তু সাধারণ নাট্য-ব্যবসায়ীর খাতির নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নটের ব্যবসা অবলম্বন করতে কারো মন চায় না। নট, নটী, একটা আলাদা জাত, কিন্তু উঁচু জাত নয়। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে এ ভাবটি যত প্রবল ছিল এখন ততটা প্রবল নয় সত্য, কিন্তু অন্য পাঁচটা কাজের মত থিয়েটারের কাজটা লোকে এখনও সহজভাবে নিতে

পারে নি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ধনী জমিদারের ছেলে বর্তমান লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন—"থিয়েটারের দরকার কি? ওগুলো উঠে গেলে ক্ষতি কি?" উত্তর—"কাব্যের প্রয়োজন কি? সংগীতের প্রয়োজন কি? সকল ললিতকলাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। অপ্রয়োজনের মধ্যেই তার প্রয়োজন। নাট্যশালা উঠে গেলে বুঝতে হবে জাতির জীবনশক্তি, জাতির সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়েছে।"

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করে নি। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে; সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য—সকলেরই বিকাশ রঙ্গমঞ্চে। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।*

* গল্পভারতী, ১৩৬৫

পরিশিষ্ট (গ)

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একটি রচনা

অভিনয় ও অভিনেতা

অভিনয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, কবির ন্যায় অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষায় গঠিত হন না। কবি ও অভিনেতার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কেবল উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই কবি বা অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতার অভিনয়োপযোগী আকার স্বভাবপ্রদত্ত। অভিনেতার অঙ্গসৌষ্ঠব থাকিবে—দীর্ঘকায়, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, পীন বাহু, বিশাল বক্ষ ইত্যাদি। কণ্ঠস্বর পুরুষোচিত অথচ সুমিষ্ট হইবে, কিন্তু অভিনেতাকে উচ্চকণ্ঠ না হইলে চলিবে না। আবার শুধু ধীরকণ্ঠ হওয়া রঙ্গমঞ্চের নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ নিম্নকণ্ঠে বিরলে পরামর্শ দূর শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে হইবে, উচ্চকণ্ঠে সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত নায়িকার সহিত নায়কের মৃদু প্রেমকথা শুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন। রঙ, পরচুলা প্রভৃতির সাহায্য অভিনেতা পান বটে, কিন্তু কাঠামোটা একরকম উপযোগী না থাকিলে সুনিপুণ বহুরূপীর শিল্পেও তাঁহার নায়কত্বে অধিকার হইবে না। স্বভাব তাহাকে নট না করিয়া গড়িলে চলিবে না।

গুরুগম্ভীর ভূমিকার (serious part) উপযোগী আকারের যেরূপ আবশ্যক, হাস্যরসাত্মক ভূমিকায়ও সেইরূপ। তবে এ ভূমিকায় বেশকারীর নিপুণতার সাহায্য অনেক পাওয়া যায়। তথাপি মুখভঙ্গী প্রভৃতি, স্বভাবদত্ত হইলে উৎকৃষ্ট হয়। উচ্চদন্ত হাস্যরসে বিশেষ উপযোগী। কণ্ঠস্বর ও আকারিদগত ত্রুটী অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়। স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। নটের কার্য—To give to airy nothings a local habitation and a name: কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না—যে ভূমিকায় অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না।

নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তা কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে নট তাহা অনন্যমন হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন তথাপিও নটের চিন্তা ফুরায় না। নাটককার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে। অনেক সময় নট কর্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে (conception) নাটককারকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। 'সধবার একাদশী'র 'জীবনচন্দ্রে'র অভিনয় দর্শনে প্রতিভাবান নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তদভিনেতা অর্ধেন্দুকে "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন উহা improvement on the author" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী'র ভূমিকায় নটগুরু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আভাস পাওয়া যে মধুসূদন নিজ নাটকের রচনা উক্ত নটের নিকট যাচাই করিয়া লইতেছেন।

নটের কল্পনা যে সামান্য নয় তাহা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট, তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে তাহা দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা করাতেই অভিনেতার কার্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায় জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা স্যর হেন্‌রী আর্ভিং ফরাসী মন্ত্রী 'রিসলুর' ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা 'রিসলু'কে মার্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরই শত্রুদমনোৎসুক আর্ভিং-রিস্‌লু ভীষণ মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য লাভ অল্প অভ্যাসের কার্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাবভাব আনা নটের অতি কঠোর সাধন।

কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিকপুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি মুখে ব্যূহরচনা করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে মালা গাঁথে—এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেন অভিনয়কালে

এই সকল ভাবভঙ্গী স্বভাবপ্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায় মরুদেশের রাজদূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদের মাঝে দাঁড়াইয়া যখন ভূমিস্পর্শী পিধান দ্বারা ব্যূহ রচনা করেন তখন ভাবুক দর্শক তাঁহার সে কার্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। বেলবাবু (কাপ্তেন বেল) 'ধীবর ও দৈত্য' নামক নাটকে ধীবরের ভূমিকায় দৈত্যকে কৌশলে পিপের মধ্যে আবার প্রবেশ করাইয়া পিপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া যখন তাহার উপর বসিতেন, আর দৈত্য "আমায় খুলিয়া দাও" বলিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেল মস্তক চালিয়া বলিত—"কভি নেহি," এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত তাহার জাল ছিড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে না হইলে এরূপ অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না—দৈত্য পাছে বাহির হয় এই ভয়েই বিব্রত থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে কাশিমবাজারের 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন যোগেশ সর্বস্বান্ত হইয়াছে,—পথিকের নিকট মদের পয়সাপ্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল", তাহার পর ভগ্নহৃদয়ে ও মদে জীর্ণ 'যোগেশ' সাজিয়া যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়া চলিয়াছিাম, তখন আমর সেই চলনভঙ্গী কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য করেন। অভিনয় শেষে তিনি কাশিমবাজারের ঐরূপ দুর্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না। আমি 'না' উত্তর করায় মহারাজ বলেন—"আপনার চলন ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।" এই প্রশংসায় আমার আত্মতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা লক্ষিত হইয়াছিল।

নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যাঁহার পূর্বোল্লিখিত ধ্যানধারণা শক্তি নাই তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা

বলেন তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ করিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না। অনেক সময়ে নাটক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কাণে লাগে। যে অংশটি ঐরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ্য পড়ে। দর্শকচিত্তকে এইরূপে আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে নাটকের কোন পঙক্তিতে একটি বিশেষ ভাব আছে সেখানে সেই ভাবটি দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না। ইয়াগোর ভূমিকাভিনয় ইহার একটি দৃষ্টান্ত। সাধারণ অভিনেতারা দেখাইতেন যেন ইয়াগো বিনা কারণে, কেবলমাত্র তাহার স্বভাবদোষে ওথেলোর অনিষ্টকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাবান অভিনেতা কীনের (Kean) অভিনয়ে প্রকাশ পাইত—ইয়াগো যেন ঈর্ষাবশতঃ সমস্ত অনিষ্ট করিয়াছে। কথিত আছে, এই নট অভিনয়ের কালে *twixt* শব্দটি ভাণ করিয়া ভুলিয়া যাইতেন এবং তৎপরিবর্তে *between* উচ্চারণে ছন্দঃপতন করিয়া এই বিশেষ কথাটির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।* ইয়াগোর উল্লিখিত দুই প্রকার অভিনয় লইয়া নানা বাদানুবাদ থাকিলেও শেষোক্ত প্রথাটি প্রতিভাবান নট কর্তৃক নাটকীয় চরিত্র প্রস্ফুটনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

* I hate the Maon ;
And it is thought abroad
That twixt my sheets
He has done my office ;
I know not if't be true ;
But I for mine suspicion in that kind
Will do as if for surety.

—*Othello, Act 1*, Sc. 3

অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনো অবহেলার সহিত অভিনয় করিবেন না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা উচিত। রঙ্গালয়ে শুনা যায় অমুক ব্যক্তি এই ভূমিকা (part) "জ্বালাইয়া দিয়াছে"—অর্থাৎ সে ভূমিকাটি ঐ ব্যক্তির দ্বারা এত উৎকৃষ্ট অভিনীত হইয়াছে যে তাহা অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তুলনায় তাঁহাকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইহা নটের যোগ্য কথা নহে। যে কোন ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন সে ভূমিকা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়া শ্রেয়ঃ। ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা নটের নিতান্ত কর্তব্য। দাবা খেলোয়াড়েরা বলিয়া থাকেন—ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমরা নট, আমাদের কার্যও সেইরূপ—ভাবিলেই চাল বাহির হয়। মিস্ সিডন্স্ (Miss Siddons)-এর 'লেডি ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় জগদ্বিখ্যাত। হ্যাজেলিটের মমতাহীন লেখনীতেও সে অভিনয়ের সুখ্যাতি ধরে না। কুমারী সিডন্স্ দীর্ঘকায়া ছিলেন—লেডি ম্যাক্‌বেথের কঠিন ভূমিকা অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়াই যেন তাঁহার সে গঠন। তিনি এই ভূমিকা যেভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে দর্শক বুঝিলেন যে লেডি ম্যাক্‌বেথ অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র। তাঁহার সে অভিনয় দর্শনে বহুদিন ধরিয়া লোকের এই ধারণা ছিল যে সে চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে আর কেহই দাঁড়াইতে পারিবেন না। মিস্ সিডন্স্-এর পর সারা বার্ণার (Sara Barnhardt—যাঁহাকে লোকে Divine Sara বলিত) লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সারার 'লেডি ম্যাক্‌বেথ' দর্শনে লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্র দর্শকের মনে ভিন্ন রূপে অঙ্কিত হইল। দর্শক দেখিল—যেন স্বামী অনুরাগিণী স্বামীর উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষিনী প্রেমিকা রমণী রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন। সে স্বার্থত্যাগিনী, স্বামীর স্বার্থই স্বার্থ। স্বামীর যে উচ্চকামনা ছিল তাহা সে জানিত; পতির আজীবনের বাসনা পূর্ণ হউক—এই উদ্দেশ্যেই সে পতিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং অনুতাপ-মগ্ন স্বামীকে অনুতাপিনী স্বপ্নাবস্থাতেও স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়াছে। যে দৃশ্যে লেডি ম্যাক্‌বেথ বলিতেছে,—'Come, come, come, come, give me

your hand, what's done cannot be undone. To bed, to bed, to bed'—সেই দৃশ্যে সারার অঙ্গভঙ্গিতে দর্শক দেখিত যেন প্রেমিকা অতি যত্নে ভয়কম্পিত পতির হস্ত ধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইতেছে। টীকা হইতে বুঝা যায় যে লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার কল্পনা এই দ্বিতীয় প্রকার উচ্চ কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং নূতনত্ব কেবলমাত্র নটের চিন্তাশক্তি কল্পপ্রসূত এবং ইহারই ফলে যে কোন বহু অভিনীত ভূমিকার দর্শকজন-মনোহারী নূতন অভিনয় হইতে পারে। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ার' (*King Lear*) নাটকে লিয়ারের ভূমিকায় গ্যারিকের অভিনয় প্রসিদ্ধ। তাঁহারই শিক্ষায় সুশিক্ষিত নট ব্যারীও এই ভূমিকাটির অভিনয় করেন। তথাপি গ্যারিকের নিকট ব্যারী পরাজিত হইয়াছিলেন। লোকে গ্যারিকের ও ব্যারীর পার্থক্য লিয়ারের অভিনয়ে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিতে লাগিল—'For Barrie we have laughter, for Garrick only tears'. অভিনয়ের পার্থক্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। *King Lear* নাটকের একটি দৃশ্যে কৃতঘ্না কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া লিয়ার এই অভিসম্পাত দিতেছেন—"That she may feel how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child." গ্যারিক 'That she may feel' ইত্যাদি বাক্যটি একবার খাদে বলিয়া ঐ পঙক্তিটি পুনর্বার অতি তীব্র স্বরে উচ্চারণ করিতেন।

উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে পারে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয় হইতেও দেওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহের অভিনয়ে "মানসিংহ মানসিংহ মানসিংহ—এখনি তাহাকে বধ করিব" এই অংশে মানসিংহ পদটি একই স্বরে উচ্চারিত হইত। পরবর্তী অভিনেতা কর্তৃক এ অংশের অভিনয় এইরূপে পরিবর্তিত হইল—প্রথম মানসিংহ এরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল যেন নামটি ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইল, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পাইয়াছে—যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট দাঁড়াইল; এই শেষের মানসিংহ দেখিবামাত্র

অসি মোচনপূর্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। এই ভীমসিংহের ভূমিকায় আর এক স্থলে রাজা ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতেছেন—"কে ও? মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ?" এই অংশ প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনীত হইত; পরিবর্তিত অভিনয়ে কান্না ছিল না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গিয়াছে,—রাজা প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন, এইরূপ ভাবেই অভিনীত হয়। পরিবর্তিত অভিনয় পূর্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'সীতার বনবাস' নাটকে মহেন্দ্রলাল বসু লক্ষ্মণের ভূমিকার অভিনয় করিতেন। পরে ষ্টার থিয়েটারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইলে অমৃতলাল লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলেও অমৃতলালের অভিনয়ে একটু পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ আসিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন —"সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস—" তখন অমৃতলাল-লক্ষ্মণ অমনি বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার অভিনয়ে এই নূতনত্ব দর্শকের বড়ই মর্মভেদী হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে যখন 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় হইত, তখন রামের ভূমিকা মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকার প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল।

একই ভূমিকা যে বহুভাবে অভিনীত হইতে পারে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত বিলাতের রঙ্গমঞ্চে যেমন আছে, আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চেও তেমনি উহা বিরল নহে। সিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা করিয়া তাঁহার শোকসভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটক হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—"তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!" পূর্বে একজন অভিনেতা এই "অতি সুন্দর" ছত্রটি উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্ধেন্দু কর্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্ধেন্দু কর্তৃক এই পরিবর্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই মতের সহিত

আমার অনৈক্য আছে। আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের উচিত। বিল্বমঙ্গল "অতি সুন্দর" বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না—বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত। এখানে বিল্বমঙ্গলের রূপপূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশে অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্নস্বরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। যেমন 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের স্বগত উক্তি—'To be or not be that is the question'—ইত্যাদি অংশ ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় করিবার পরিবর্তে চিন্তামগ্ন হইয়া ধীরভাবে অভিনয় করাই সঙ্গত। হ্যামলেট-চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই। মার্জিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থকতা ইহার স্বগত উক্তিতে। এখানে বীররসের স্থান কোথায়?

নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইয়াছে কি না—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না—প্রতিযোগী অভিনেতা (Co-actor) ঠিক চলিতেছে কি না—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কি না? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত গৌণ। তন্ময় অংশই মুখ্য। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখনো কখনো সাক্ষী অংশ মুখ্য হইয়া উঠে। অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশি থাকিত।

নটের আর একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্তব্য। কোনরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করিলে নাটকের যে ক্ষতি হয় তাহা কাহাকেও বোধ হয়

বুঝাইতে হইবে না। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায় তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া নটের একটি প্রধান কর্তব্য। অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে আহারাদির কথা একপ্রকার [illegible] যাইতেন। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ হইবে যে আহারান্তে জলপান কালে বিদ্যাদিগ্‌গজের গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন 'গজপতি' সত্যই জলপান করিতেছেন।

অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন—যে ধ্যান মুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাট্যকারকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। এই জন্যই বিলাতী নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় বা acting-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ইহাকে বলা হইয়া থাকে re-creation অর্থাৎ নাট্যকারের সৃষ্টির পর আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি। ভূমিকা (part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। অভিনয়ে রূপসজ্জার (Make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হইবে। যুবক রূপসজ্জা ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থায় অভিনেতাকে রূপসজ্জার সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। এই জন্যই অভিনয়কে বলা হয় বহুরূপী বিদ্যা। নাট্যকারের ধারণায়

উপর রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না। কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা অভিনেতার কার্য। সেই কার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—রূপসজ্জা। অভিনয়ে রূপসজ্জার স্থান সামান্য নয়।*

* নাট্যমন্দির, ১৩১৭-১৮।

পরিশিষ্ট (ঘ)

শিশিরকুমারের থিয়েটারের তিনটি প্রোগ্রাম

॥ এক ॥

নাট্যমন্দির লিমিটেড

বড়দিনের বড় আসর (১৯২৭)

শনিবার, ২৪শে ডিসেম্বর

প্রথম অভিনয় বেলা ২টায়

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি ৮॥টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

রবিবার, ২৫শে ডিসেম্বর

প্রথম অভিনয় বেলা ২টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি ৮॥টায়

ভ্রমর

গোবিন্দলাল—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

সোমবার, ২৬শে ডিসেম্বর, বৈকাল ৪॥টায়

বিশেষ অনুরোধে মাত্র একরাত্রির জন্য

১। আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

২। শেষরক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

মঙ্গলবার, ২৭শে ডিসেম্বর, বৈকাল ৪॥টায়

মাত্র একরাত্রির জন্য

১। চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

২। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

ব্রাহ্মণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

বুধবার, ২৮শে ডিসেম্বর, রাত্রি ৭টায়

সাজাহান

সাজাহান—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

বৃহস্পতিবার, ২৯শে ডিসেম্বর, রাত্রি ৭টায়

মাত্র একরাত্রির জন্য

১। প্রফুল্ল

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমাব ভাদুড়ি

২। রাধাকৃষ্ণ

শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর, রাত্রি ৭টায়

১। দ্বিজেন্দ্রলালের

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

২। সধবার একাদশী

নিমচাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

শনিবার, ৩১শে ডিসেম্বর

প্রথম অভিনয় বেলা ২টায়

সাজাহান

ঔরংজেব—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি ৮টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

রবিবার, ১লা জানুয়ারী, ১৯২৮

প্রথম অভিনয় বেলা ২টায়

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি ৮৷৷টায়

ভ্রমর

গোবিন্দলাল—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

সোমবার ২রা জানুয়ারী ৪৷৷টায়

১। রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

২। জনা

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

॥ দুই ॥

নাট্যমন্দির লিমিটেড

(১৩৩৪)

---

১৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, টেলিফোন ৩০৪০ বড়বাজার

শনিবার, ১৪ই শ্রাবণ, (৩০শে জুলাই), রাত্রি ৭৷৷টায়

প্রথমেই নাট্যগুরু দীনবন্ধুর সামাজিক নাটক

১। সধবার একাদশী

নিমচাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

কাঞ্চন—শ্রীমতী চারুশীলা

তৎপরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক

২। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(মাত্র একরাত্রির জন্য)

কীচক—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

ভীম—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

দ্রৌপদী—শ্রীমতী প্রভা

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫টায়

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

প্রফুল্ল (মহাসমারোহে দশম অভিনয় রজনী)

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

প্রফুল্ল—শ্রীমতী প্রভা

॥ তিন ॥

শ্রীরঙ্গম

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবিবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৬, সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

মিসরকুমারী

আবন—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

সামন্দেশ—শ্রীছবি বিশ্বাস

সোমবার, ২৩শে জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

নেতাজী জন্মতিথি

১। উদ্বোধন সঙ্গীত—'বন্দে মাতরম্'—শ্রীহেমচন্দ্র সেন

২। শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

৩। চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

মঙ্গলবার, বিশেষ অভিনয় সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

প্রফুল্ল

ভূমিকায়ঃ শিশিরকুমার, ছবি বিশ্বাস, নিভাননী, রাণীবালা, রেবা, শেফালিকা প্রভৃতি।

বিঃ দ্রঃ—এই কয়দিন অভিনয়ের পর, কিছুকালের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকিবে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

শিশিরকুমার অভিনীত নাটক ও ভূমিকা

ছাত্রজীবনে — কলেজ মঞ্চে

Hamlet — King & Ghost

Julius Ceaser — Brutus

Merchant of Venice—Antonio

[illegible] ও অধ্যাপকজীবনে — ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে

জনা — প্রবীর

কুরুক্ষেত্র — অভিমন্যু

বুদ্ধদেব — বুদ্ধদেব

চন্দ্রগুপ্ত — চাণক্য

অশোক — অশোক

ভীষ্ম — পরশুরাম

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস— ভীম, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

রঘুবীর — রঘুবীর

বৈকুণ্ঠের খাতা — অবিনাশ, কেদার ও তিনকড়ি

অবৈতনিক নাট্যসমাজে

রাণা প্রতাপ — আকবর

ল-কলেজ মঞ্চে

পুনর্জন্ম — সৌদামিনী, অশ্বিনী

ম্যাডান থিয়েটারে

আলমগীর — আলমগীর

রঘুবীর — রঘুবীর

চন্দ্রগুপ্ত — চাণক্য

ইডেন গার্ডেন মঞ্চে

সীতা (দ্বিজেন্দ্রলাল)— রাম

নিজস্ব মঞ্চ—নাট্যমন্দির, নব নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গমে

সীতা (যোগেশ চৌধুরী) রাম
পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক
জনা — প্রবীর, নীলধ্বজ, বিদূষক
ভীষ্ম — ভীষ্ম
পাষাণী — গৌতম, ইন্দ্র
বিসর্জন — রঘুপতি, জয়সিংহ
শঙ্খধ্বনি — কেতনলাল
সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র) সিরাজ
প্রফুল্ল — যোগেশ, রমেশ
বলিদান — করুণাময়, দুলালচাঁদ
হাস্-নু-হানা — ঘাতক
বৈকুণ্ঠের খাতা — কেদার
শেষরক্ষা — চন্দ্র
তপতী — রাজা বিক্রমদেব
যোগাযোগ — মধুসূদন
ষোড়শী — জীবানন্দ
বিন্দুর ছেলে — যাদব
রমা (পল্লীসমাজ) — রমেশ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী
বিরাজ বৌ — নীলাম্বর
অচলা (গৃহদাহ) — কেদার ও সুরেশ
বিজয়া (দত্তা) — রাসবিহারী, নরেন
বিপ্রদাস — বিপ্রদাস (মূল ভূমিকা—বিশ্বনাথ ভাদুড়ি)
প্রতাপাদিত্য — প্রতাপ, রডা
দিগ্বিজয়ী — নাদির শাহ
সাজাহান — সাজাহান, ঔরংজেব
রীতিমত নাটক — দিগম্বর
মায়া — জ্যাঠামহাশয়

শ্যামা	—	চন্দনক ও উত্তীয়
সুষমা	—	রাবণ
মাইকেল	—	মাইকেল
জীবনরঙ্গ	—	অমরেশ
দেশবন্ধু	—	কহ্লন
তথৎ-ই-তাউস	—	জাহান্দর শাহ
বিল্বমঙ্গল	—	বিল্বমঙ্গল
পাণ্ডবগৌরব	—	ভীম ও ভীষ্ম
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	—	ভীম, ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ
উড়োচিঠি	—	ব্যারিস্টার সুনীল
চিরকুমার সভা	—	রসিক, চন্দ্র
খাসদখল	—	নিতাই, মোহিত
বিবাহ-বিভ্রাট	—	মিঃ সিং
রিজিয়া	—	বক্তিয়ার, ঘাতক
নর-নারায়ণ	—	কর্ণ, অর্জুন
সধবার একাদশী	—	নিমচাঁদ
ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল)		গোবিন্দলাল
মুক্তার মুক্তি	—	রতনচাঁদ
দশের দাবী	—	জমিদার
পরিচয়	—	শশাঙ্ক চাটুজ্যে
প্রশ্ন	—	নীতীন

আর্ট থিয়েটার মঞ্চে

কর্ণার্জুন	—	কর্ণ
চিরকুমার সভা	—	চন্দ্র
মন্ত্রশক্তি	—	মৃগাঙ্ক, রমাবল্লভ

নাট্যনিকেতন মঞ্চে

গৈরিক পতাকা	—	শিবাজী

দক্ষযজ্ঞ	—	দক্ষ
মহাপ্রস্থান	—	শ্রীকৃষ্ণ

রঙমহল মঞ্চে

বিষ্ণুপ্রিয়া	—	নিমাই
মিশরকুমারী	—	আবন

শিশিরকুমার প্রযোজিত ও পরিচালিত নাটক :— জয়দেব, তুলসীদাস, কুঞ্জ-দরজী, চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে, ফুলের আয়না, আলিবাবা, অভিমানিনী, পুনর্জন্ম, বিন্দুর ছেলে, বসন্তলীলা, বিপ্রদাস, রাধাকৃষ্ণ, বন্দনার বিয়ে, শিবরাত্রি, তাইতো, আগমনী, দুঃখীর ইমান, আবুহোসেন।

শিশিরকুমারের সর্বশেষ অভিনয়

মহাজাতি সদন মঞ্চে

১৯৫৯, ৮ই মে ও ১০ই মে

রীতিমত নাটক	—	দিগম্বর
আলমগীর	—	আলমগীর

॥ পুনশ্চ ॥

এই বইয়ের ছাপার কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন শিশির-কুমার সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্য আমি জানতে পারলাম। সেটি এই। নাট্যমন্দিরে 'সীতা' ও অন্যান্য নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিশিরকুমারকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রখানি তিনি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। এ হোল শিশিরকুমারের আমেরিকা যাওয়ার কিছু আগের ঘটনা। কথিত আছে, সেই চিঠিতে শাস্ত্রীমহাশয় শিশির-কুমারের অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে একটি চমৎকার আলোচনা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, শিশিরকুমারের জীবিতকালে সেই চিঠিখানি তাঁর হস্তগত হয় নি ; অনেক টাকার বিনিময়েও তিনি নলিনী পণ্ডিতের কাছ থেকে চিঠিখানি উদ্ধার করতে সক্ষম হন নি। যে কারণে নলিনীবাবু এই চিঠিখানি শিশিরকুমারকে দেন নি, তার জন্য শিশিরকুমার আদৌ দায়ী ছিলেন না। যাই হোক, আজ শাস্ত্রীমহাশয়' নলিনীপণ্ডিত ও শিশির-কুমার-এঁরা সকলেই পরলোকে। নলিনীবাবুর পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত এখনো জীবিত। তাঁর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন চিঠিখানি অবিলম্বে প্রকাশ করার এবং সাহিত্যপরিষদে দেবার ব্যবস্থা করেন, অবশ্য যদি তাঁর পিতৃদেব এটি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নষ্ট না করে থাকেন। সংবাদটি আমি নাট্যামোদী বাঙালি ও শিশিরপ্রতিভার অনুরাগীদের জানিয়ে রাখলাম।

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

১। নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর — গিরিশচন্দ্র ঘোষ
২। গিরিশচন্দ্র — দেবেন্দ্রনাথ বসু
৩। গিরিশচন্দ্র — অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৪। গিরিশচন্দ্র — কুমুদবন্ধু সেন
৫। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু
৬। স্মৃতিকথা — অমৃতলাল বসু
৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— ব্যোমকেশ মুস্তফী
৯। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর — অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১০। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ — রমাপতি দত্ত
১১। বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়
১২। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার কথা—শচীন সেনগুপ্ত
১৩। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত — অজিতকুমার ঘোষ
১৪। *David Garrick* — Carola Oman
১৫। *Henry Irving* — Edward Gordon Craig
১৬। *Henry Irving* — William Archer
১৭। *Granvile Barker* — C. B. Purdom
১৮। *Plays and Players* — Bernard Shaw

পত্র-পত্রিকা : নাট্যমন্দির, নাট্যভারতী, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয়, নাচঘর এবং শারদীয়সংখ্যা (১৩৬৬) যুগান্তর, রূপমঞ্চ, বিচিত্রা, পরিচয়, গল্পভারতী, সমকালীন প্রভৃতি।